বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

ফুটন্ত গোলাপ

কাসেম বিন আবুবাকার

লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

ফুটন্ত গোলাপ

কাসেম বিন আবুবাকার

নূর-কাসেম পাবলিশার্স

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ■ ডিসেম্বর-১৯৮৬ খৃঃ

প্রথম নূর কাসেম পাবলিশার্স সংস্করণ

জানুয়ারি-১৯৯৭ খৃঃ

ত্রিশতম প্রকাশ ■ মার্চ-২০১১ খৃঃ

প্রচ্ছদ ■ সমর মজুমদার

গ্রন্থস্বত্ব ■ লেখক

নূর-কাসেম পাবলিশার্স, ৩৮/৪, বাংলাবাজার (২য় তলা),
ঢাকা-১১০০, থেকে মোঃ সায়ফুল্লাহ্ খাঁন কর্তৃক
প্রকাশিত এবং সালমানী মুদ্রণ সংস্থা, ৩০/৫,
নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
বর্ণ বিন্যাস ■ বাঁধন কম্পিউটার্স
৪৭/১, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০

মূল্য ■ ১২০·০০ টাকা মাত্র।

FUTONTO GOLAP
By-KASEM BIN BAUBAKAR
Published by : Noor-Kasem Publishers
38/4 Banglabazar (1st Floor), Dhaka-1100, Phone : 7125331,
Composed By : Badhon Computers & Graphics,
38/4 Banglabazar (1st Floor) Dhaka-1100,
30 Edition March-2011
Price : U.S.$ 3 00 Only

ISBN 984-763-001-1

যুক্তরাজ্য পরিবেশক ■ সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
Phone : 020 72475954 Fax: 02072475941
ওয়েব সাইট : www.ancbooks.com. www.boi-mela.com

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

উৎসর্গ

যাদের মারফত আল্লাহপাক আমাকে
দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, সেই পুণ্যবান ও
পুণ্যবতী আব্বা-আম্মার মোবারক কদমে।

ফুটন্ত গোলাপ

কাসেম বিন আবুবাকার

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

(১) "হে ঈমানদারগণ তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর। এবং শয়তানের অনুসারী হয়ো না। বাস্তবিকই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

আল-ক্বোরআন, সূরা-বাক্বারা, আয়াত-২০৮, পারা-২।

(২) "পাঁচ ব্যক্তির সংসর্গ হইতে সর্বদা দূরে থাকিও (ক) মিথ্যুক (খ) আহাম্মক (গ) কৃপণ (ঘ) কাপুরুষ (ঙ) ফাসেক।"

ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)

লেখকের রচিত বই ঃ-

ফুটন্ত গোলাপ
বিদেশী মেম
ক্রন্দসী প্রিয়া
প্রেমের পরশ
বিলম্বিত বাসর
প্রেম বেহেস্তের ফল
একটি ভ্রমর পাঁচটি ফুল
পাহাড়ী ললনা
শরীফা
শ্রেয়সী
বিদায় বেলায়
অসম প্রেম
অবশেষে মিলন
প্রেম
ভালবাসি তোমাকেই
চেনা মেয়ে
অবাঞ্ছিত উইল
কাঙ্খিত জীবন
সংসার
বালিকার অভিমান
বাসর রাত
অলৌকিক প্রেম
মানুষ অমানুষ
প্রতীক্ষা
কি পেলাম
তোমার প্রত্যাশায় (যন্তস্থ)

আমি তোমার
প্রেমের ফসল (ছোট গল্প)
কেউ ভোলে কেউ ভোলেনা
ধনীর দুলালী
হঠাৎ দেখা
প্রেম যেন এক সোনার হরিণ
আধুনিকা
প্রতিবেশিনী
বিয়ের খোঁপা (ছোট গল্প)
কালো মেয়ে
কামিনী কাঞ্চন
পলাতকা
বিকেলে ভোরের ফুল
পল্লীবালা
স্বর্ণ তুমি
বহুরূপিনী
বধূয়া
হৃদয় যমুনা
শেষ উপহার
অনন্ত প্রেম
বিয়ে বিভ্রাট
তুমি সুন্দর
বড়-আপা (যন্ত্রস্থ)
ভাঙ্গাগড়া
হৃদয়ে আঁকা ছবি
প্রেম ও স্বপ্ন

ভূমিকা

বর্তমান সমাজের চরম অবনতি উপলব্ধি করে এই কাহিনী লেখার প্রেরণা পেয়েছি। আমার মনে হয়েছে এভাবে যদি দিন দিন আমরা প্রগতি ও নারী স্বাধীনতার নাম দিয়ে চলতে থাকি, তা হলে ইসলাম থেকে সমাজের মানুষ বহুদূরে চলে যাবে। শুধু মুখে, কেতাবে ও মুষ্টিমেয় লোকের কাছে ছাড়া অন্য কোথাও ইসলামের নাম গন্ধ থাকবে না।

বিদেশী শিক্ষাকে আমি খারাপ বলছি না। পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি। কিন্তু বিদেশী শিক্ষার সংগে সংগে তাদের ভালো দিকটা বাদ দিয়ে খারাপ দিকটাই অনুকরণ করে আমরা যেন "কাকের ময়ূর হওয়ার মত" মেতে উঠেছি।

অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ক্বোরআন পাকে বলিয়াছেন-"তোমরা (মুসলমানরা) উত্তম সম্প্রদায়, যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হইয়াছে মানবমণ্ডলীর জন্য। তোমরা নেক কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।" (সূরা-আল ইমরান, ১১০ নং আয়াত, পারা-৪।)

আর এখন আল্লাহপাকের কথিত সেই মুসলমানেরা ক্বোরআন ও হাদিসের আদর্শ ত্যাগ করে দুনিয়ার মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাই তারা পৃথিবীর সকল দেশেই উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত।

আমরা যদি আল্লাহর ও রাসূলের (দঃ) বাণীকে অনুকরণ ও অনুস্মরণ করে চলি, তা হলে নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের রহমতে আবার আমরা আমাদের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস তৈরি করতে পারব।

যদি এই বাস্তবধর্মী উপন্যাসটি পড়ে বর্তমান যুব সমাজ সামান্যতমও জ্ঞান লাভ করে সেইমতো চলার প্রেরণা পায়, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

আমার এই প্রাণ প্রিয় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৮৬ইং সালে এবং প্রথম সংস্করণেই বাংলাদেশ ও ভারতের পাঠক সমাজে আশাতীতভাবে সমাদৃত হয়। এ জন্য আমি আল্লাহপাকের দরবারে শতকোটি শুকরিয়া আদায় করছি এবং সেই সংগে আমার প্রিয় পাঠকবর্গের কাছে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছি।

ওয়াস সালাম

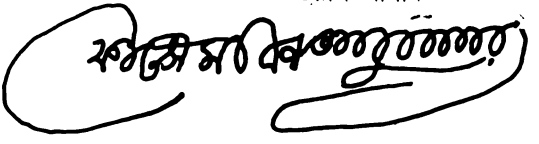

২০ই পৌষ- ১৪০৩ বাংলা
২৩শে শাবান- ১৪১৭ হিজরী
৩রা জানুয়ারী- ১৯৯৭ ইং

রিষ্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে লাইলী চমকে উঠল। তারপর বই খাতা নিয়ে ইতিহাসের ক্লাস করার জন্য পা বাড়াল। সে লাইব্রেরীতে বসে একটা নোট লিখছিল। তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে উঠার সময় সেলিমের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তার হাত থেকে বই-খাতাগুলো নিচে ছড়িয়ে পড়ল।

ইয়া আল্লাহ একি হল বলে লাইলী কি করবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে সেলিমের দীর্ঘ বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য ও পৌরষদীপ্ত চেহারার দিকে লজ্জামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সব কিছু ভুলে গেল।

আর সেলিমও তার দিকে চেয়ে খুব অবাক হল। এতরূপ যে কোনো মেয়ের থাকতে পারে, সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। লাইলীর টকটকে ফর্সা গোলগাল মুখটা শুধু দেখা যাচ্ছে। কারণ সে বোরখা পরে রয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর লাইলী নিজেকে সামলে নিয়ে বই-খাতা কুড়াতে লাগল।

এতক্ষণে সেলিমের খেয়াল হল, তারও তো অন্যায় হয়েছে। সে তখন তাড়াতাড়ি করে দু-একটা বই তুলে তার হাতে দিতে গেলে আবার চোখা-চোখি হয়ে গেল, আর দু'জনের অজান্তে হাতে হাত ঠেকে গেল।

লাইলী চমকে উঠে 'হায় আল্লাহ' বলে বইসহ নিজের হাতটা টেনে নিল।

সেলিম মৃদুকণ্ঠে বলল, অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য মাফ চাইছি।

লাইলী তার দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে সিঁড়িতে উঠতে আরম্ভ করল।

সেলিম বলল, শুনুন।

লাইলী যেতে যেতে ঘুরে শুধু একবার তাকিয়ে দ্রুত চলে গেল।

সেলিম তার চলে যাওয়া দেখল। তারপর চিন্তিত মনে লাইব্রেরীতে ঢুকে চেয়ারে বসে ভাবল, সে এতদিন ভার্সিটিতে পড়ছে, কই এই মেয়েটিকে তো এর আগে কোনোদিন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না ? অবশ্য সে বোরখাপরা মেয়েদের মোটেই পছন্দ করে না। সেইজন্য হয়তো ওকে দেখেনি। ওদের সোসাইটিতে কত সুন্দরী মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে এই মেয়ের কোনো তুলনা হয় না। এত নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে এই প্রথম সে দেখল। সেলিমের মনে হল, মেয়েটি যেন একটা ফুটন্ত গোলাপ। তার লম্বা পটলচেরা চোখের উপর মিশমিশে কালো ভ্রু-দু'টো ঠিক একজোড়া ভ্রমর, আর কম্পিত পাপড়িগুলো তাদের ডানা। ওর মায়াবী চোখের কথা মনে করে সেলিম নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলল। কতক্ষণ কেটে গেছে তার খেয়াল নেই। বন্ধু রেজাউল এসে যখন বলল, কিরে একটা বই আনতে এত দেরি হয় বুঝি ? তারপর তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে আবার বলল, তুই বসে বসে এত গভীরভাবে কি ভাবছিস বলতো

সেলিম নিজেকে ফিরে পেয়ে বলল, একটা এ্যাকসিডেন্ট করে ফেলেছি।

এ্যাকসিডেন্ট করেছিস ? কই দেখি কোথায় লেগেছে ? কি করে করলি ?

ইচ্ছা করে করিনি, হঠাৎ হয়ে গেছে। তবে শরীরের কোনো জায়গায় ব্যথা পাইনি, পেয়েছি এখানে বলে নিজের বুকে হাত রাখল।

রেজাউল কিছু বুঝতে না পেরে বলল, হেঁয়ালি রেখে আসল কথা বল।

বলব দোস্ত বলব, তবে এখন নয়। আগে ব্যথাটা সামলাতে দে, তারপর বুঝলি ?

ঠিক আছে তাই বলিস। এখন যে বইটার জন্য এসেছিলি সেটা নিয়ে চল. ওরা সবাই অপেক্ষা করছে।

সেলিম আলমারী থেকে স্ট্যাটিসটিকস এর একটা বই নিয়ে দু'জনে ক্লাসে রওয়ানা দিল। সেদিন লেকচারার এ্যাবসেন্ট থাকায় ওরা কয়েকজন ক্লাসে বসে গল্প করছিল। কবির নামে সেলিমের আর এক বন্ধু কাছে এসে বলল. এই অঙ্কের উত্তরটা মিলছে না কেন বলতে পারিস ?

তার প্রশ্ন শুনে আরও কয়েকজন ছেলে এসে অঙ্কটা দেখে বলল. আমরাও পারিনি।

সেলিম ততক্ষণ অঙ্কটা কষতে আরম্ভ করে দিয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে অঙ্কটা শেষ করে উত্তর মিলিয়ে দিল।

সকলে দেখে বলল. তুই গোঁজামিল দিয়ে করেছিস। ঐ ফরমূলা আমরা কোথাও পাইনি।

সেলিম বলল. অমুক বইতে ফরমুলাটা আছে। দাঁড়া. বইটা লাইব্রেরী থেকে নিয়ে আসি। বইটা তাড়াতাড়ি করে আনার জন্য তিনতলা থেকে নামার সময় নিচের তলার সিঁড়ির শেষ ধাপে লাইলীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে। রেজাউলের সঙ্গে বইটা নিয়ে এসে ক্লাসের সবাইকে ফরমূলাটা দেখল।

সেলিম স্ট্যাটিসটিকস-এ অনার্স পড়ে। এটা তার ফাইন্যাল ইয়ার। ক্লাসের মধ্যে সেরা ছাত্র। বিরাট বড়লোকের ছেলে। গুলশানে নিজেদের বাড়ি। তাদের কয়েকটা বীজনেস। তারা দুই ভাই এক বোন। সেলিমই বড়। দুবছরের ছোট আরিফ। বোন রুবীনা সকলের ছোট। সে ক্লাস টেনে পড়ে। ওদের ফ্যামিলী খুব আল্টামডার্ণ। শুধু নামে মুসলমান। ধর্মের আইন-কানুন মেনে চলা তো দূরের কথা. ধর্ম কি জিনিষ তাই হয়তো জানে না। পিতা হাসেম সাহেব গত বছর থম্বোসীসে মারা গেছেন। তিনি বীজনেস মেনেজমেন্টে বিদেশ থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসে প্রথমে একটা কটন মিলের ম্যানেজার ছিলেন। হাসেম সাহেব একজন সুদর্শন পুরুষ। কর্মদক্ষতায় মালিকের প্রিয়পাত্র হয়ে তার একমাত্র কনাকে বিয়ে করে ভাগ্যের পরিবর্তন করেন। পরে নিজের চেষ্টায় আরও দু-তিন রকমের ব্যবসা করে উন্নতির চরম শিখরে উঠেন। বন্ধু বান্ধবদের তিনি বলতেন. ধর্ম মেনে চললে আর্থিক উন্নতি করা যায় না। জীবনে আর্থিক উন্নতি করতে হলে ধর্ম ও মৃত্যু চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। অর্থাৎ ভুলে যেতে হবে। আর আল্লাহকে পেতে হলে মৃত্যুকে সামনে রেখে ধর্মের আইন মেনে চলতে হবে। তিনি আরও বলতেন. যৌবনে অর্থ উপার্জন কর এবং ভোগ কর। তারপর বার্ধক্যে ধর্মের কাজ কর। তার এই মতবাদ যে ভুল, তিনি নিজেই তার প্রমাণ। প্রথমটায় কৃতকার্য হলেও অকালে মৃত্যু হওয়ায় দ্বিতীয়টায় ফেল করেন।

সেলিমের যখন ইন্টারমিডিয়েটের সেকেণ্ড ইয়ার তখন আরিফ ম্যাট্রিকে সব বিষয়ে লেটার পেয়ে পাশ করল। পরীক্ষার পর কিছুদিন তবলীগ জামাতের সঙ্গে ঘুরে নিয়মিত নামায পড়তে লাগল। এইসব দেখে পিতা হাসেম সাহেব মাঝে মাঝে রাগারাগী করতেন।

কিন্তু পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হওয়ার পর যখন সে জানাল. মাদ্রাসায় ভর্তি হবে তখন তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। ভীষণ বকাবকি করার পর বললেন. ঐ ফকিরি বিদ্যা পড়ে ভবিষ্যতে পেটে ভাত জুটবে না। সব সময় পরের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। ওসব খেয়াল ছেড়ে দাও. আর এখন তোমাকে নামায-রোজাও করতে হবে না। ঐ সব বুড়ো বয়সের ব্যাপার। মা সোহানা বেগমও অনেক করে বোঝালেন। কিন্তু কারুর কথায় কিছু হল না। একদিন সকালে আরিফকে

দেখতে না পেয়ে সবাই অবাক হল। কারণ সে প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে নামায পড়ে। আজ যখন বেলা আটটা বেজে যেতেও নাস্তার টেবিলে এল না তখন সোহানা বেগম বললেন, দেখতো রুবীনা, তোর ছোটদা উঠেছে কিনা।

রুবীনা আরিফের ঘরে ঢুকে তাকে দেখতে পেল না। পড়ার টেবিলের উপর পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া একটা কাগজের উপর দৃষ্টি পড়তে তাড়াতাড়ি করে কাগজটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল–

মা ও বাবা, তোমাদের দু'জনের পবিত্র কদমে রইল হাজার হাজার সালাম। আমার মন আল্লাহ্, রাসূল ও ধর্ম সম্বন্ধে জানার জন্য বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। তোমরা আমাদেরকে সেই অমৃতের সন্ধান দাওনি। আল্লাহ পাকের রহমতে আমি সেই পথের সন্ধান পেয়েছি। তাই তোমাদের অজান্তে সেই অমৃত পাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। তোমাদের কথামত চলার অনেক চেষ্টা করলাম; কিন্তু মনকে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে না পেরে চলে যেতে বাধ্য হলাম। তোমরা দোয়া কর–আল্লাহপাক যেন আমার মনের বাসনা পূরণ করেন। তোমরা আমার খোঁজ করবে না। কারণ তাতে কোনো ফল পাবে না।

ইতি
তোমাদের অবাধ্য সন্তান
আরিফ

পড়া শেষ করে রুবীনা ছুটে এসে কাগজটা বাবার হাতে দিয়ে বলল, ছোটদা চলে গেছে।

হাসেম সাহেব পড়ে রাগে কথা বলতে পারলেন না। কাগজটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসে থেকে উঠে ফোনের কাছে গিয়ে কয়েক জায়গায় ফোন করলেন। পরপর কয়েকদিন কাগজে আরিফের ফটো ছাপিয়ে সহৃদয় ব্যক্তিদের অনুসন্ধান জানাবার অনুরোধ করে বিজ্ঞাপন দিলেন। তারপর বেশ কিছুদিন খোঁজাখুঁজি করলেন। শেষে কোনো সংবাদ না পেয়ে হাল ছেড়ে দেন। এই ঘটনার দুবছর পর হাসেম সাহেব মারা গেলেন।

স্ত্রী সোহানা বেগম ব্যবসার সব কিছু বাড়িতে বসে দেখাশুনা করতে লাগলেন। তিনি গ্র্যাজুয়েট। সাতজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়ে একটা বোর্ড গঠন করে তাদের দ্বারা ব্যবসা চালাতে লাগলেন। প্রত্যেক দিন ম্যানেজার বাড়িতে এসে খাতা-পত্র দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যান। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সেলিমকে সবকিছু দেখাশোনা করতে বলেছিলেন। সে রাজি হয় নি। ভীষণ জেদী ছেলে। বাপের মত এক রোখা। বলল, আগে পড়াশুনা শেষ করি, তারপর।

সেলিম একজন খুব ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। জুডো, কারাত ও বক্সিং-এ পারদর্শি। নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে। তাদের দু'টো গাড়ি। অন্যটির জন্য একজন শিক্ষিত ড্রাইভার আছে। বন্ধু-বান্ধবী অনেক। আত্মীয়, অনাত্মীয় ও ভার্সিটির কত মেয়ে তার পেছনে জোঁকের মত লেগে থাকে। সে সকলের সঙ্গে প্রায় সমান ব্যবহার করে। ফলে তারা সকলেই মনে করে, সেলিম তাকেই ভালবাসে। আসলে তাদের কাউকেই সে পছন্দ করে না। মনে কষ্ট পাবে বলে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। তাদের মধ্যে অনেকে গায়ে পড়ে ভাব করতে আসে। তারা তার চেয়ে তার ঐশ্বর্য্যকে বেশি ভালবাসে। তাই তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও মনে মনে সবাইকে ঘৃণা করে। তাদের মধ্যে তার মামাত বোন রেহানা একটু অন্য টাইপের মেয়ে। দেখতে বেশ সুন্দরী আর খুব আল্টামডার্ণ। এ বছর বাংলায় অনার্স নিয়ে ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। নিজেদের গাড়িতে করে প্রায় সেলিমদের বাড়িতে এসে তার

সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলে। সেলিমকে হারাতে না পারলেও সেও বেশ ভালই খেলে। তাকে অন্য সব মেয়েরা হিংসা করে।

সোহানা বেগমের ইচ্ছা ভাইঝিকে পুত্রবধূ করার। তাই একদিন খাবার টেবিলে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, তোর বান্ধবীদের মধ্যে কাউকে পছন্দ হয় নাকি ?

সেলিম খাওয়া বন্ধ করে কয়েক সেকেণ্ড মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করছ কেন সে আশায় গুড়ে বালি, আমি এখন পাঁচ বছর বিয়ে করব না।

সোহানা বেগম বললেন, তা না হয় নাই করলি, আমি বলছিলাম, রেহানাকে তোর কি রকম মনে হয় ?

সেলিম বলল, ভালোকে তো আর খারাপ বলতে পারব না, তবে ও খুব অহংকারী। মেয়েদের অহংকার থাকা ভালো না। এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না, তা না হলে ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করব।

ছেলের কথা শুনে সোহানা বেগম আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। কারণ তিনি জানেন, একবার বিগড়ে গেলে সত্যি সত্যিই ঘর ছেড়ে চলে যাবে। এরপর থেকে তিনি আর ছেলেকে বিয়ের ব্যাপারে কোনো কথা বলেন নি।

এদিকে আরিফ ঘর থেকে আসার সময় নিজের হাত খরচের জমান হাজার দেড়েক টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল। আগেই সে একজন আলেমের কাছে শুনেছিল, বর্তমানে বাংলাদেশ ও পাক-ভারত উপমহাদেশের মধ্যে উত্তর ভারতে দেউবন্দ ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। তাই সে মনে করল, যেমন করে হোক সেখানেই যাবে। সেখানে কিভাবে যাবে, তার খোঁজ খবর আগেই জেনে নিয়েছিল। ঘর থেকে আসার সময় একটা চিঠি লিখে রেখে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র একটা ব্যাগে নিয়ে কোচে করে খুলনায় এসে হোটেলে উঠল। হোটেলের একজন খাদেমকে বিনা পাসপোর্টে ভারতে যাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে সে দালাল ঠিক করে দিল। যশোরে ও খুলনায় এরকম অনেক লোক আছে, যারা বিনা পাসপোর্টধারীকে টাকার বদলে গোপনে বর্ডার পার করে দেয়। এইভাবে তারা বেশ টাকা রোজগার করে। আরিফ ধর্মশিক্ষা করিতে যাবে শুনে সে টাকা না নিয়েই তাকে বর্ডার পার করে দিল। আরিফ টাকা দিতে গেলে লোকটা বলল, বাবা, সারাজীবন এই অন্যায় কাজ করে অনেক রোজগার করেছি। আজ একজন ধর্মশিক্ষার্থীর কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না, নিলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে না।

আরিফ ঐদিন কলিকাতায় পৌঁছে রাত্রের ট্রেনে চেপে বসল। সকাল সাতটায় মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ি অনেকক্ষণ লেট করল যাত্রীদের ব্রেকফাষ্ট করার জন্য। গাড়ি ছাড়ার কয়েক সেকেন্ড আগে একজন মৌলবী ধরণের লোক উঠলেন। খুব ভীড়। অনেক লোক ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐ লোকটা হাতের ব্যাগটা কোনো রকমে ব্যংকারের উপর রেখে অনেক কষ্টের সঙ্গে দাঁড়ালেন। আরিফ সামনেই বসেছিল। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে তাকে বসার জন্য অনুরোধ করল।

লোকটি বলল, না-না, আপনিই বসুন। শেষে আরিফের জেদাজেদিতে বসলেন। তারপর কিছুক্ষণ আরিফকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় থেকে আসছেন ? কোথায় যাবেন ?

আরিফ বলল, দেখুন, আমি আপনার ছেলের বয়সি, আমাকে আপনি করে না বলে তুমি করে বলুন। তারপর বলল, আমি বাংলাদেশ থেকে দেওবন্দের মাদ্রাসায় দ্বীনি এলেম হাসিল করার জন্য যাচ্ছি।

লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এই প্রথম যাচ্ছ না কি ?

জ্বি।

তুমি এতদিন কি পড়াশোনা করেছ ?

এ বছর ম্যাট্রিক পাস করেছি।

তুমি তো দেশে থেকে মাদ্রাসায় পড়তে পারতে ? এতদূরে আসার কি দরকার ছিল? শুনেছি দেওবন্দ দ্বিনী শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ।

ঠিকই শুনেছ বাবা, কিন্তু আজকাল সে সব আদর্শবান শিক্ষক নেই। আর সেরকম ছাত্র সংখ্যাও খুব কম। তবে দেশের অন্যান্য জায়গার চেয়ে এখনও ওখানে সব থেকে ভালো শিক্ষা দেওয়া হয়। ওখানে অনেক ধরণের মাদ্রাসা আছে। আমার বাড়ি ওখানে। আমি এক মাদ্রাসার শিক্ষক। ছুটিতে বড় মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। আগামীকাল মাদ্রাসা খুলবে। তাই বাড়ি ফিরছি। আমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভালই হল। তোমাকে আর নতুন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি কি উর্দু একদম জান না ? বলাবাহুল্য উভয়ে এতক্ষণ ইংরেজীতে কথা বলছিল।

না, আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি, উর্দু জানি না।

তুমি যে এত দূর থেকে চলে এলে, তোমার মা-বাবা কিছু বললেন না ?

তারা অন্য সমাজের মানুষ, ধর্মের কথা পছন্দ করে না। তাই একটা চিঠি লিখে সবকিছু জানিয়ে গোপনে চলে এসেছি।

তা হলে তো ওঁরা খুব চিন্তায় আছেন। এক কাজ করো, মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পর ওঁদেরকে চিঠি দিও। আর তুমিও কোনো চিন্তা করো না, আল্লাহপাকের যা মর্জি তাই হবে। আমি যতটা পারি সব দিক থেকে তোমাকে সাহায্য করব।

লোকটির নাম মৌলবী আজহার উদ্দিন। উনি ঐ এলাকার খুব নামী লোক। অবস্থাও খুব ভাল। নিজেদের একটা মাদ্রাসা আছে। এখানে ছেলেরা প্রথমে শুধু হাফেজী পড়ে। তারপর বড় মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। সেখান থেকে পাশ করলে আরবীতে এম, এম এবং ইংরেজীতে বি, এ, সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তিনি আরিফকে নিজের বাড়িতে সঙ্গে করে যখন পৌঁছালেন তখন দুপুর বারটা।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর যোহরের নামায পড়ে আরিফ বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় মৌলবী সাহেব ছোট দু'টি ছেলে-মেয়ে সঙ্গে করে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদেরকে বললেন, ইনি তোমাদের মাষ্টার। আজ থেকে তোমরা ইনার কাছে পড়বে। তারপর আরিফকে বললেন, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে তুমি এখানে ছেলের মতো থেকে পড়াশোনা করতে পার। আমি তোমার পড়াশোনার সব ব্যবস্থা করে দেব।

আরিফ এতটা আশা করেনি। সে বিদেশে কোথায় কিভাবে থাকবে, কি পড়বে এতক্ষণ সেইসব চিন্তা করছিল। এত তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা হয়ে গেল দেখে মনে মনে আল্লাহপাকের দরবারে শোকরগুজারী করল। বলল, দেখুন চাচাজান, আপনার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। আপনি আমার জন্য যা করছেন, তা আমি ভাবতেও পারছি না। দোয়া করুন, আল্লাহপাক যেন আমার মনের বাসনা পুরণ করেন।

কি যে বল বাবা, আমি আর কতটুকু তোমার জন্য করেছি। নিজের জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশে ধর্মের জ্ঞানলাভ করতে এসেছ। তুমি অতি ভাগ্যবান। যারা এই রাস্তায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, আল্লাহপাক তাদের সহায় হন। আর আমি তার একজন নগণ্য বান্দা হয়ে যদি তোমাকে সাহায্য না করি, তবে তিনি নারাজ হবেন।

প্রত্যেক লোকের মানষিক উদ্দেশ্য থাকা উচিত, আল্লাহপাক কিসে সন্তুষ্ট হন। আমি তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাকে আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করছি। তুমি ঘরের ছেলের মতো থেকে পড়াশোনা কর। আর এদেরকে নিজের ভাইবোন মনে করবে। কোনো কিছু অসুবিধা হলে জানাবে। আমি যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা করব।

সেই থেকে আরিফ ওখানে থেকে পড়াশুনা করতে লাগল। সে জানাল, প্রথমে হাফেজী পড়বে। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য বড় মাদ্রাসায় ভর্তি হবে। মৌলবী সাহেব তাকে সেইমত ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানে এসে আরিফ যেন তার চিরআকাঙ্খিত ধন খুঁজে পেল। এখানকার ছেলে-মেয়েদের ও লোকজনের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সব ইসলামী ছাঁচে। এখানে যেন বিধর্মী ইহুদী, খৃষ্টানদের সভ্যতা প্রবেশ করেনি। সে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করতে লাগল। নিয়মিত নামায পড়ে আল্লাহ পাকের দরবারে মোনাজাত করতে লাগল-

'হে রাব্বুল আল-আমিন, তুমি সমগ্র মাখলুকাতের সৃষ্টিকর্তা। তুমি আলেমুল গায়েব। তোমার অগোচর কিছুই নেই। তুমি সর্বশক্তিমান। তোমার প্রশংসা করা আমার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির একজন নগণ্য বান্দা। তোমার দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া আদায় করে এই নিবেদন করছি, তুমি আমার সমস্ত অপরাধ মাফ করে দাও। আমাকে ইসলামের একজন খাদেম তৈরি করে ধন্য করো। আমি সব কাজ যেন তোমাকে খুশি করার জন্য করি। তোমার প্রিয় বান্দারা যে রাস্তায় গমন করেছেন, আমাকেও সেই পথে চালিত কর। আর আমি বাবা-মার মনে যে কষ্ট দিয়ে এসেছি, তাদের সেই কষ্ট দূর করার তওফিক আমাকে দান কর। আমার দিকে তোমার রহমতের দৃষ্টি দান কর। তোমার প্রিয় হাবিব ও রাসূল (দঃ) যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, সেপথে আমাকে দৃঢ় রেখ। সেই হাবিবের (দঃ) উপর হাজার হাজার দরূদ ও সালাম। তোমার রাসূলে পাক (দঃ)এর অসিলায় আমার দোয়া কবুল করো। আমিন।'

প্রতিদিন তাহাজ্জুদ নামাযের পরও আরিফ কেঁদে কেঁদে উক্ত দোওয়া করতে লাগল। সে জেনেছিল, বান্দা যদি চোখের পানি ফেলে আল্লাহ পাকের দরবারে কিছু ফরিয়াদ করে, তবে তা তিনি কবুল না করে থাকতে পারেন না। কারণ রাসূল (দঃ) হাদিসে বলিয়াছেন-'আল্লাহ পাকের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট ও অতি প্রিয় জিনিস হল মোমেন বান্দার চোখের পানি। সেই পানি গাল বেয়ে পড়ার আগেই তার দোয়া কবুল করে নেন। মোমেন বান্দার চোখের পানি আল্লাহ পাকের আরশকে কাঁপিয়ে দেয়। তাই তিনি বান্দার দোয়া কবুল করেন।'

লাইলী ক্লাসে ঢুকে দরজার কাছে সীট ফাঁকা পেয়ে বসে পড়ল। প্রফেসার তখন লেকচার দিচ্ছিলেন। শতচেষ্টা করেও মনোযোগ দিতে পারল না। কেবলই সেলিমের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাগুলো তার মনে ভেসে উঠতে লাগল। ক্লাস যে কখন শেষ হয়ে গেছে টের পেল না। ছেলে মেয়েরা সব বেরিয়ে গেল।

বান্ধবী সুলতানা তাকে বসে থাকতে দেখে বলল, কিরে যাবি না ? বসে আছিস কেন ? শরীর খারাপ না কি ?

চমকে উঠে সম্বিত ফিরে পেয়ে লাইলী বলল, নারে, শরীর ভালো আছে, তবে

বলে থেমে গেল।

সুলতানা বলল, তবে কিরে ? কিছু হয়েছে নাকি বল না ?

না কিছু হয়নি বলে বই নিয়ে এক সঙ্গে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল। ঘরে ফিরার সময়ও লাইলী খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। কখন বাসায় পৌঁছে গেছে জানতে পারেনি। রিকশাওয়ালার ডাকে খেয়াল হতে চিন্তিত মনে বাড়িতে ঢুকল।

লাইলীদের বাড়ি র‍্যাকিন ষ্ট্রীটে। তার আব্বার নাম আঃ রহমান। উনি সোনালী ব্যাংকের একজন সামান্য কেরানী। আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। ওঁর এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলেটা বড় ছিল। বছর দুয়েক আগে বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে ফেরার পথে গুলিস্তানের মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় লরী চাপা পড়ে মারা যায়। লাইলী তখন ক্লাস টেনে পড়ে। ভাইয়ের চেয়ে লাইলী ব্রেনী। সে প্রতি বছর ফার্স্ট হয়। একমাত্র ছেলের মৃত্যুর পর রহমান সাহেব খুব মুষড়ে পড়েন। তারপর মেয়ে যখন স্কলারসিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়তে চাইল তখন তিনি প্রথমে মোটেই রাজি হন নি। শেষে মেয়ের কান্নাকাটি সহ্য করতে না পেরে শত অভাবের মধ্যে কলেজে ভর্তি করেন। আর মাসোহারা দিয়ে একটি রিকশা ঠিক করে দিলেন লাইলীকে কলেজে নিয়ে যাবে-আসবে বলে।

স্ত্রী হামিদা বানু খুব আপত্তি করে বললেন, মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শেখালে তাদের চরিত্র ঠিক থাকে না। বড় বড় ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে লেখাপড়া করলে কটা ছেলে-মেয়ে ভালো থাকতে পারে।

মাকে রাজি করাবার জন্য লাইলী বলল, আমি মেয়েদের কলেজে ভর্তি হব। সেখানে শুধু মেয়েরা পড়ে।

বাধা দেওয়ার আর কোনো যুক্তি না পেয়ে হামিদা বানু স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না ? বেশি পড়ালে মেয়ে তখন কম শিক্ষিত ছেলেকে পছন্দ করবে না বলে দিচ্ছি। তারপর গজর গজর করতে করতে রান্না ঘরের দিকে চলে গেলেন।

আই এ-তে সব বোর্ডের সব গ্রুপের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে লাইলী ইসলামিক হিষ্ট্রীতে অনার্স নিয়ে ভার্সিটিতে ভর্তি হল। এটা তার সেকেণ্ড ইয়ার।

রহমান সাহেবরা দুই ভাই। বাবা মারা যাওয়ার পর আট কামরা বাড়ির চার কামরা করে প্রত্যেক ভাই ভাগে পেয়েছেন। ছোট ভাই মজিদ সাহেবের রেশন দোকান আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্ল্যাক মার্কেটিং করে অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। রহমান সাহেব ছোট ভাইকে এরূপ অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করায় তার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ির মাঝখান থেকে পাঁচিল দিয়ে আলাদা হয়ে যান এবং নিজের বাড়িটাকে চারতলা করেছেন।

রহমান সাহেব চার কামরার উপরের দুই কামরায় নিজেরা থাকেন। আর নিচের দুই কামরা ভাড়া দিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসার জলিল সাহেব, আজ তিন বছর ধরে তাদের ভাড়াটিয়া। ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী দুজনেই খুব পরহেজগার। এত কম বয়সের পরহেজগার স্বামী-স্ত্রী খুব কম দেখা যায়। লাইলী জলিল সাহেবকে ভাইয়া এবং স্ত্রী রহিমাকে ভাবি বলে ডাকে। কোনো লোক বাড়িতে এলে ওদের সবাইকে একই ফ্যামিলির লোক বলে ভাবে। জলিল সাহেবের এক ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে সাদেক। সে কে, জি তে ক্লাস ফোরে পড়ে। এই বয়স থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। প্রতিদিন সকালে মা-বাবার সঙ্গে কোরআন তেলাওয়াত করে। ছোট মেয়ে ফিরোজা, তার বয়স তিন বছর।

লাইলী রোজ সন্ধ্যায় সাদেককে একঘণ্টা করে পড়ায়। জলিল সাহেব সেজন্য

তাকে মাসিক তিনশো টাকা দেন। প্রথমে লাইলী টাকা নিয়ে পড়াতে রাজি হয় নি। বলেছিল, আমি সময় মতো সাদেককে এমনি পড়াব। রহিমা বলেছিল, তা হয় না বোন, অন্য একজন মাষ্টার রাখলে তাকে তো অনেক টাকা দিতে হতো। তুমি একটা ফিকস্ট টাইমে ওকে পড়াও, আমরা তোমাকে অল্প কিছু হলেও দেব। শেষে তার জেদাজেদিতে পড়াতে রাজি হয়।

সেদিন লাইলী ভার্সিটি থেকে ফিরে সন্ধ্যায় সাদেককে পড়াতে গিয়ে মোটেই পড়াতে পারল না। কেবলই এ্যাকসিডেন্টের ঘটনাটা মনে পড়তে লাগল। শতচেষ্টা করেও মন থেকে তা দূর করতে পারল না। শেষে সাদেককে পড়তে বলে ফিরোজাকে কোলে জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে দোল খেতে খেতে তন্ময় হয়ে সেলিমের কথা চিন্তা করতে লাগল।

রহিমা চা খাবার জন্য রান্নাঘর থেকে দু'তিনবার ডেকেও যখন সাড়া পেল না তখন দু' কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে লাইলীর অবস্থা দেখে প্রথমে হেসে উঠল। পরমুহূর্তে তার মনে হল, সে যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। নিজের অনুমানটা পরখ করার জন্য আস্তে আস্তে চায়ের কাপ দুটো রেখে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, চোখ বন্ধ করে কোন ভাগ্যবানের ধ্যান করা হচ্ছে ?

লাইলী চমকে উঠে চোখ খুলে রহিমাকে দেখতে পেয়ে লজ্জা পেয়ে বলল, তুমি কি বলছ ভাবি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রহিমা তার লজ্জা রাঙা মুখের দিকে চেয়ে বলল, থাক তোমার আর বোঝার দরকার নেই, এখন চা খেয়ে নাও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, বলবে, না চেপে যাবে ?

লাইলী ততক্ষণ নিজেকে সামলে নিয়েছে। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, আচ্ছা ভাবি, তুমি আজ হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করলে কেন ?

এই সেরেছে রে, উদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে চাপান হচ্ছে ? নিজে দোষ করে আমাকে আসামী বানাচ্ছ ? আমি কিন্তু অতশত বুঝি না, পরিষ্কার আকাশে মেঘের ঘনাঘটা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছি। ইচ্ছে হয় বলবে, না হয় বলবে না।

আম্মা আমিও চা খাব বলে ফিরোজা মাকে জড়িয়ে ধরল।

মেয়েকে কোলে নিয়ে রহিমা বলল, তোমরা এখন ভাত খাবে, চা খাওয়া চলবে না।

লাইলী বলল, ভাবি, আজ পড়াতে ভালো লাগছে না, যাই। তুমি ওদের খেতে দাও। তারপর নিজের ঘরে এসে বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। পাশের রুমে মা-বাবা থাকে। আর বারান্দা ঘিরে সেখানে রান্না ও খাওয়া-দাওয়া হয়। এক সময় লাইলী ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে বড় মধুময় স্বপ্ন দেখল। ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে অন্যমনস্কবশতঃ ভুল করে একটা অন্য রিকশায় উঠে বসল। কতক্ষণ রিকশায় চেপেছে তার খেয়াল ছিল না। যখন খেয়াল হল তখন দেখল, একটা বিরাট বাড়ির গেটে রিকশা ঢুকছে আর দারোয়ানটা অবাক হয়ে রিকশাওয়ালাকে সালাম দিচ্ছে। লাইলী খুব আশ্চর্য হয়ে একটু রাগের সঙ্গে বলল, এই রিকশাওয়ালা, তুমি কাদের বাড়িতে নিয়ে এলে ? আরে এ যে আমাকে অচেনা জায়গায় এনে ফেললে ?

রিকশাওয়ালা যেন কথাগুলো শুনতে পায়নি, সে একেবারে গাড়ি বারান্দায় রিকশা থামিয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, নামুন মেম সাহেব, এসে গেছি।

মুখের নেকাব সরিয়ে খুব রাগের সঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে ভার্সিটির সেই ছেলেটাকে দেখে লাইলী চমকে উঠল। কিছুক্ষণ দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইল। প্রথমে লাইলী বলে উঠল, আপনি ?

কেন বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি বলে রিকশাওয়ালা সেলিম মিটিমিটি হাসতে লাগল। ঠিক এই সময় লাইলীর মা এসে ভাত খাওয়ার জন্যে ডেকে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে তাকে উঠে বসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে শরীর খারাপ নাকি ? এত শিগ্রী ঘুমালি কেন ? এশার নামায পড়েছিস ?

লাইলী বলল, না মা, আমার শরীর ঠিক আছে। তুমি যাও আমি নামায পড়ে আসছি।

মাস কয়েক পরের ঘটনা। সেদিন ভার্সিটিতে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মাহফিলের ব্যবস্থা হয়েছে। এ রকম ধর্মীয় সভায় সেলিম কখনও যায়নি। কারণ সেও বাপের মত ধর্মকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু আজ সে এসেছে। তার মনে হয়েছে মেয়েটা যখন বোরখা পরে তখন নিশ্চয় সেও থাকবে। তাই সে কর্মীদের একজন হয়ে কাজ-কর্মও দেখাশোনা করছে। সভা শেষে গজল ও স্বরচিত কবিতা গাওয়ার প্রোগ্রাম করা হয়েছে। সেলিমকে সবাই ধরে বসল, তোকেও একটা স্বরচিত কবিতা আবৃতি করতে হবে। প্রথমে অমত করলেও সে এটাই কামনা করছিল। সেই জন্য একটা কবিতাও লিখে পকেটে করে এনেছে। সকলের শেষে সেলিম মাইকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, অনেক মেয়ের মধ্যে দশ-বারোজন বোরখাপরা মেয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকের মুখ নেকাব দিয়ে ঢাকা। তাদের দিকে চেয়ে নিরাশ হয়ে কবিতাটি আবৃতি করল-

প্রিয়তমা, ও আমার ভালবাসার সৌগন্ধময় প্রিয়তমা,
বড় আশা নিয়ে এসেছি এখানে, তুমি আছ কিনা জানি না।
তবু আজ আমি শোনাব তোমায় আমার মর্মবেদনা,
ও বাতাস পৌঁছে দিও তার কানে আমার কামনা ও বাসনা।
ভুলিতে পারিনি কভু কিছুতেই সেই দুর্লভ মূহুর্তের কথা,
যে ক্ষণে হয়েছিল তোমার রূপের মিলন আর আমার ভালবাসা।
মনে আছে আমার জীবনের সেই প্রথম প্রহর বেলায়,
তোমার চোখের মদিরা পান করেছিলাম আমার শিরা উপশিরায়।
এক ধরনের পুলকে পুলকিত হয়েছিল তখন আমার মন,
তোমার কমল হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠেছিলাম যখন।
তোমার ভ্রমর কালো নয়ন দুটির মায়াবি দৃষ্টিতে,
পাগল করে রেখেছে আমার তণু ও মনেতে।
সেদিনের সেই দৈব ঘটনায় কিছু কি হয়নি তোমার ?
এদিকে বসরার গোলাপের গন্ধে ভরে গেছে হৃদয় আমার।
খুঁজেছি তোমায় পথে-প্রান্তরে, অগণিত অলকার অলিন্দে ও বারান্দায়,
প্রত্যেক অবগুণ্ঠিতা নারীর পানে চেয়ে দেখেছি তৃষ্ণার্ত চাতকের ন্যায়।
অবশেষে ক্লান্ত চরণে শেষ আশা নিয়ে দাঁড়িয়েছি আজ এইখানে,
আল্লাহগো তুমি দেখা করে দিও আমার প্রেয়সির সনে।
ওগো প্রিয়তমা, সত্যিই যদি এসে থাক এই শুভ মাহফিলে,
তা হলে পিপাসা আমার মিটিয়ে দিও সব শেষে দেখা দিয়ে।

সভা শেষ হওয়ার পর সেলিম সকলের অলক্ষ্যে মনে অনেক আশা নিয়ে মেয়েটিকে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল।

লাইলী ওর কবিতা শুনে শত চেষ্টা করেও নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, ধীরে ধীরে বারান্দার একটা থামের আড়ালে এসে দাঁড়াল।

সেলিম একটা বোরখা পরা মেয়েকে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার কাছে এসে বলল, যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

লাইলী মাথা কাত করে সম্মতি জানাল।

সেলিম বলল, আপনি যদি আমার কবিতা শুনে এখানে এসে থাকেন, তা হলে বুঝবো আমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে আপনি। মেয়েটিকে চুপ করে থাকতে দেখে সেলিম আবার বলল, আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তা হলে দয়া করে মুখের নেকাবটা সরিয়ে আমার মনস্কামনা পূরণ করুন। আশা করি, আমাকে বিমুখ করবেন না।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে লাইলী মুখের নেকাব উঠিয়ে সেলিমের মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে নিল ?

ঠিক সেই সময় সেলিমের বন্ধু রেজাউল তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, কিরে, এখানে কি করছিস ? এদিকে আমি তোকে খুঁজে খুঁজে পেরেশান। আজকে আমাদের বাড়িতে ব্যাটমিন্টন খেলতে যাবি বলেছিলি না ?

রেজাউলকে দেখে লাইলী নেকাবটা মুখের উপর ঢেকে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে গিয়ে গেটে অপেক্ষারত রিকশায় উঠে বসল।

লাইলীর চলে যাওয়ার দিকে সেলিমকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রেজাউল বলল, ওর দিকে চেয়ে আছিস কেন ? কেরে মেয়েটা ? আমাকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি করে চলে গেল।

সেলিম বলল, দিলি তো সব মাটি করে। এইতো সেই মেয়ে, যার সঙ্গে সেদিন এ্যাকসিডেন্ট করে ঘায়েল হয়ে আছি।

তাই বল, তাইতো তোর কবিতা শুনে মনে যেন কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তা মেয়েটার নাম কি রে, কিসে পড়ে ? বাড়ি কোথায় ?

থাম থাম, অত প্রশ্ন করার দরকার নেই, ঐ সবের কিছুই জানি না। ওর সঙ্গে দেখা হতে না হতেই তুই এসে পড়লি, আর ও পালিয়ে গেল। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভাগ্যচক্রে যদিও আজ দেখা পেলাম, কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, পেয়েও আবার হারিয়ে ফেললাম।

রেজাউল বলল, তুই মেয়েটার মধ্যে কি এমন দেখেছিস ? যার জন্য এত পাগলপনা হয়ে গেলি। ওর থেকে সুন্দরী কত মেয়ে তোর পিছু ঘুরঘুর করে, সে কথা আমি আর তোকে কি বলব, তুই নিজেই তো জানিস। আর দেখে নিস, ঐ মেয়েটাও কয়েকদিন পর তোর পিছু পিছু ঘুরবে একটু ভালবাসার পেসাদ পাওয়ার জন্য। তা ছাড়া ওর পোশাক দেখে মনে হল গরীব ঘরের মেয়ে। এখন আমাদের বাড়ি চলতো।

সেলিম বলল, হতে পারে ও গরিব ঘরের মেয়ে; কিন্তু সুন্দরী মেয়েতো জীবনে কত দেখলাম বন্ধু, সুন্দর তা দিয়ে মেয়েদের বিচার করা বোকামী। ওকে যদি তুই দেখতিস, তা হলে এসব কথা বলতিস না। এরকম মেয়েরা কোনোদিন ছেলেদের পিছনে ঘুরঘুর করে না বরং ছেলেরাই ওদের পিছনে ঘুরঘুর করে। আজ তুই যা, আমি অন্য একদিন তোদের বাড়ি যাব বলে সেলিম গেটের কাছে এসে একটা রিকশায় উঠে বলল, একটু আগে বোরখা পরা একটা মেয়েকে নিয়ে যে রিকশাটা গেল তাকে ফলো কর। ততক্ষণে লাইলীর রিকশা অনেক দূরে চলে গেছে। সেলিম রিকশায় করে ঘন্টাখানেক ধরে খুঁজাখুঁজি করেও তাকে পেল না। শেষে ভার্সিটিতে ফিরে এসে নিজের গাড়িতে করে বাড়ি ফিরল। এরপর থেকে বোরখা পরা মেয়ে দেখলে সেলিমের মন খারাপ হয়ে যায়। তখন বোরখার উপর তার ভীষণ রাগ হয়।

ইচ্ছা করে বোরখাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে। এটার জন্যে সে তার প্রিয় মানষীকে খুঁজে পাচ্ছে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বের করবে।

মাস খানেক পরের ঘটনা, সেদিন সকাল থেকে সারা আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। রহমান সাহেব অফিসে যাওয়ার সময় মেয়েকে আজ ভার্সিটি যেতে নিষেধ করে গেলেন। কিন্তু লাইলী বাপের কথা শুনেনি। বেলা বারটার পর থেকে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল। বেলা চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন বৃষ্টি থামল না তখন লাইলী ভিজে ভিজে গেটে এসে নিজের রিকশা দেখতে না পেয়ে অন্য একটা রিকশায় উঠে বসল। বৃষ্টির ঝপটায় তার সব কাপড় ভিজে যাচ্ছে। রিকশা যখন ব্রিটিস কাউন্সিলের সামনে এসেছে তখন একটা জীপ পিছনের দিক থেকে সামনে এসে রাস্তা জাম করে দাঁড়াল। তারপর লাইলী কিছু বুঝে উঠার আগেই চারজন যুবক জীপ থেকে নেমে একজন রিকশাওয়ালার কলার ধরে বলল, চুপ করে থাকবি, নচেৎ ঘুঁসী মেরে তোর নাক-মুখের চেহারা পাল্টে দেব। আর একজন চারদিক লক্ষ্য রাখতে লাগল। বাকি দুজন লাইলীকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে এনে জিপে তোলার চেষ্টা করল।

বেলা চারটেতেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। সমানভাবে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। লাইলী প্রাণপণ শক্তিতে তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল, আর চীৎকার করতে লাগল, কে আছ আমাকে বাঁচাও, ইয়া আল্লাহ তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। কিন্তু ঝড়- বৃষ্টি ও মেঘের গর্জনে তার গলার শব্দ বেশি দূর গেল না। সবাই মিলে তাকে গাড়িতে তুলে ফেলল। রিকশা থেকে আনার সময় লাইলীর বোরখা টান দিয়ে খুলে ফেলে দিয়েছে। বৃষ্টিতে জামা কাপড় ভিজে গিয়ে শীতে ও ভয়ে সে থরথর করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু চিৎকার বন্ধ করল না। দুজনে ওকে দুপাস থেকে ধরে রইল। আর একজন চীৎকার বন্ধ করার জন্যে মুখের ভিতর রুমাল ঢুকাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়েছে। এমন সময় একটা প্রাইভেট কার পাশ থেকে যাওয়ার সময় মেয়েলী কণ্ঠে বাঁচাও শব্দ শুনতে পেয়ে গাড়ি ব্রেক করে পিছিয়ে আসতে লাগল। একটা গাড়িকে ব্যাক গীয়ারে পিছিয়ে আসতে দেখে জীপের ড্রাইভার জোরে গাড়ি ছেড়ে দিল।

যে গাড়িটা লাইলীর বাঁচাও শব্দ শুনে পিছিয়ে আসছিল, তাতে সেলিম তার মাকে নিয়ে মেডিকেলে এক আত্মীয়কে দেখে বাড়ি ফিরছিল। সে মাকে বলল, মনে হয় গুন্ডারা একটা মেয়েকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাচ্ছে ? মেয়েটাকে বাঁচান দরকার।

সোহানা বেগম তাড়াতাড়ি বললেন, তুই একা কী ওদের সঙ্গে পারবি ?

তুমি দেখ না মা, আমি কি করি বলে সেলিম গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে তীরবেগে পলায়ন পর জীপের উদ্দেশ্যে ছুটল।

জীপটা কিন্তু বেশি দূর যেতে পারেনি। কিছুদূর গিয়ে ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। ড্রাইভার নেমে গাড়ির হুড খুলে ইঞ্জিনের দোষ খুঁজতে লাগল।

সেলিম ওদের গাড়ির সামনে গিয়ে ব্রেক করে গাড়ি থামিয়ে তড়াক করে নেমে এল। ড্রাইভার একটা গাড়িকে ওদের সামনে থামতে দেখে ঘুরে দাঁড়াতেই সেলিম ছুটে এসে তার পাঁজরে জোড়া লাথি মারল। ড্রাইভার ডিগবাজী খেয়ে কয়েক হাত দূরে পড়ে গিয়ে মাথায় ইটের আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারাল।

ড্রাইভারের অবস্থা দেখে লাইলীকে ছেড়ে দিয়ে বাকি তিনজন বেরিয়ে এসে

একসঙ্গে তিন দিক থেকে আক্রমণ করল। সেলিম আগের থেকে তৈরী ছিল। ওরা বুঝে উঠবার আগেই একজনের কাছে ছুটে গিয়ে তার আক্রমণ ব্যর্থ করে কয়েকটা ক্যারাতের চাপ গর্দানে বসিয়ে দিল। লোকটা জ্ঞান হারাবার আগেই তার হাত দুটো ধরে বনবন করে ঘুরাতে লাগল। ফলে অন্য দুজন তার কাছে এগোতে পারল না। এক সময় সেলিম আহত গুন্ডাটাকে একজনের গায়ে ফিকে দিল। তারপর অন্য জনকে ধরে খুব উত্তম মধ্যম দিয়ে বলল, আর কখন এমন জঘন্য কাজ করবে না ? আজকের মত ছেড়ে দিলাম। দেখে তো মনে হচ্ছে, তোমরা ইউনির্ভাসিটির ছেলে। লজ্জা হওয়া উচিত তোমাদের। ওদিকে অন্য ছেলেটা ধাক্কা সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়ে তার পায়ের হাড় মচকে গেছে। সে কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ি মরি করে ছুটে পালাল। বাকি দু'জন তাকে অনুস্বরণ করল। আর একজন অজ্ঞান অবস্থায় সেখানে পড়ে রইল।

এতক্ষণ ছেলের কার্যকলাপ দেখে সোহানা বেগম শুধু অবাকই হলেন না, সঙ্গে সঙ্গে গর্বে তার বুকটাও ভরে উঠল। গাড়ি থেকে নেমে জীপের কাছে গিয়ে দরজা খুলে লাইলীকে দেখে চমকে উঠলেন। মেয়েটিকে মানবী বলে বিশ্বাস করতে পারলেন না। কোনো মেয়ে যে এত রূপসী হতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতেন না।

মাকে বৃষ্টির মধ্যে জীপের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেলিম বলল, মেয়েটাকে আমাদের গাড়িতে নিয়ে এস না মা, তুমি যে একদম ভিজে যাচ্ছ।

সোহানা বেগম লাইলীর হাত ধরে বুঝতে পারলেন, অজ্ঞান হয়ে গেছে। বললেন, ওকে নামাব কি করে ? ওরতো জ্ঞান নেই।

সেলিম তাড়াতাড়ি মাকে সরিয়ে দিয়ে গাড়ির মধ্যে লাইলীকে দেখে একেবারে থ হয়ে গেল। তার গায়ে বোরখা নেই। এত কাছ থেকে বোরখা ছাড়া লাইলীকে এর আগে দেখেনি। ও যে এত সুন্দরী, সেলিম ভাবতেই পারছে না। সে একদৃষ্টে তার মানসীকে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল।

সোহানা বেগম মনে করলেন, ছেলেও মেয়েটার রূপ দেখে অবাক হয়ে গেছে।

বললেন, তুই ওকে তুলে নিয়ে আয়।

সেলিম দুহাতে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে নিজেদের গাড়ির পিছনের সীটে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিল।

সোহানা বেগম তাকে ধরে রেখে বললেন, চল, একে মেডিকেলে দিয়ে আসি।

সেলিম বলল, না। মেয়েটি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, এক্ষুণী জ্ঞান ফিরে আসবে। ওর জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে। আমি একে চিনি মা, ভার্সিটিতে পড়ে। এখন আমাদের বাড়িতে বরং নিয়ে যাই, জ্ঞান ফিরলে ওদের বাড়িতে না হয় পৌছে দেব।

সোহানা বেগম বললেন, বেশ তাই চল।

সেলিম বাড়িতে এসে লাইলীকে মায়ের বিছানায় শুইয়ে ডাক্তারকে ফোন করে আসতে বলল। তারপর নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়িতে ঘটনাটা জানিয়ে লোকেশনটা বলে দিল।

ডাক্তার আসার আগেই লাইলীর জ্ঞান ফিরল। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দুর্ঘটনার কথা স্মরণ হতে তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গেল।

সোহানা বেগম বাধা দিয়ে বললেন, তুমি এখন নিরাপদে আছ, ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছি। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। বাড়িতে এসে তিনি আয়াকে দিয়ে লাইলীর ভিজে জামা-কাপড় খুলে নিজের জামা কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন।

লাইলী চোখ বন্ধ করে ঘটনাটা চিন্তা করতে লাগল, গাড়ি খারাপ হয়ে যেতে

দেখে ড্রাইভার যখন ইঞ্জিন সারাচ্ছিল তখন সে একটি গাড়িকে সামনে থামতে দেখে সাহায্যের আশায় বাঁচাও বাঁচাও বলে প্রাণপণে চীৎকার করে উঠেছিল। তারপর সেলিমকে ওদের সঙ্গে মারামারী করতে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তারপরের ঘটনা সে আর কিছুই জানে না। নিশ্চয় সেলিম ঐ গুন্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছে। কিন্তু সেলিম একা ওদের চার জনের কাছ থেকে কিভাবে তাকে নিয়ে এল ? এটা তা হলে ওদেরই বাড়ি। ভদ্র মহিলা নিশ্চয় ওর মা।

লাইলীর চিন্তায় বাধা পড়ল। সেলিম মা বলে ডাক্তারসহ ঘরে ঢুকল। সে তাড়াতাড়ি দেওয়ালের দিকে মুখ করে গায়ের কম্বলটা টেনে মুখ পর্যন্ত ঢেকে দিল।

ডাক্তার প্রবীণ ব্যক্তি। হাশেম সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তার মৃত্যুর পরও বন্ধুপত্নী ও তার ছেলেদের সঙ্গে খুব ভালো সম্বন্ধ রেখেছেন। এ ঘরে আসার আগে সেলিম ডাক্তারকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলেছে। এতেই ডাক্তার অনেক কিছু বুঝে নিয়েছেন। লাইলীকে মুখে কম্বল ঢাকা দিতে দেখে বললেন, তোমার জ্ঞান ফিরেছে দেখে খুব খুশি হয়েছি মা। তা এই বুড়ো ছেলেকে দেখে কেউ লজ্জা করে বুঝি ? তারপর সেলিমের দিকে চেয়ে হেসে উঠে বললেন, ঠিক আছে, তোমার ডান হাতটা একটু এদিকে বাড়াও তো মা। লাইলী আস্তে আস্তে হাতটা বের করে ডাক্তারের দিকে বাড়াল। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন, অল ক্লীয়ার, ঔষধ পত্র লাগবে না। একটু গরম দুধ খেতে দাও। তারপর ডাক্তার বিদায় নিয়ে সেলিমের সঙ্গে নিচে এসে গাড়িতে উঠার সময় বললেন, উইস ইওর গুড লাক মাই চাইল্ড। দেওয়াল ঘড়িতে ঢং করে শব্দ হতে লাইলী সেদিকে চেয়ে দেখল, সাড়ে পাঁচটা। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বলল, আমি অযু করে আসরের নামায পড়ব।

সোহানা বেগম ভার্সিটিতে পড়ুয়া মেয়ের মুখে নামাযের কথা শুনে একটু অবাক হলেন। তারপর রুবানীকে ডেকে আলমারী থেকে নামাযের মসাল্লাটা বার করে দিতে বললেন। বিয়ের পর তিনি যখন শুশুর বাড়িতে আসেন তখন তার মা এই মসল্লাটা দিয়ে বলেছিলেন, এটা দিলাম, তুমি তো নামায পড় না, যদি কখনও আল্লাহপাক তোমাকে হেদায়েৎ করেন তখন নামায পড়বে আর আমার জন্যে দোয়া করবে। এতদিন সেটা একবারের জন্যও ব্যবহার হয়নি। লাইলীর মুখে নামায পড়ার কথা শুনে মায়ের কথা মনে পড়ল। লাইলীর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়ের প্রতিচ্ছবি তার মুখে দেখতে পেলেন। বললেন, যাও মা, অযু করে এস, ঐ যে এটাচ বাথ।

লাইলী অযু করে এসে দেখল একটা ষোল সতের বছরের সুন্দরী তরুণী মসাল্লা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত থেকে মসাল্লা নিয়ে বিছিয়ে নামায পড়তে লাগল।

এদিকে সেলিম ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে ড্রইংরুমে বসে চিন্তা করতে লাগল, তার প্রেয়সীকে এ অবস্থায় পাবে তা কোনো দিন ভাবতেই পারেনি। সে যদি ঠিক সময়ে ঐরাস্তা দিয়ে না আসত, তা হলে ওর অবস্থা কি যে হত চিন্তা করে শিহরীত হল। বর্তমান সমাজের কথা চিন্তা করে সেলিমের খুব রাগ হল। ভদ্র ঘরের শিক্ষিত ছেলেরা যদি এরকম দুঃশ্চরিত্রের হয়, তা হলে দেশের অবনতি সুনিশ্চত। এর কি প্রতীকার নেই ? নিজেকে প্রশ্ন করে কোনো উত্তর বের করতে পারল না।

সোহানা বেগম চেয়ারে বসে নামাযরত লাইলীকে দেখছিলেন। তাকে দেখে যেন তার তৃপ্তি মিটছিল না। রুবীনা একগ্লাস দুধ নিয়ে এসে টিপয়ের উপর রাখল। লাইলীর নামায পড়া শেষ হতে সোহানা বেগম বললেন, এই দুধটুকু খেয়ে নাও তো মা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, চা বা কফি খাবে ?

জ্বি না বলে লাইলী দুধের গ্লাসটা দু'হাতে ধরে মুখের কাছে নিয়ে প্রথমে

বিসমিল্লা, বলে এক ঢোক খেয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলল। দ্বিতীয় বারও তাই করল এবং শেষ বারে সবটা খেয়ে নিয়ে আবার আলহামদুলিল্লাহ বলল।

সোহানা বেগম এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়েছিলেন। হঠাৎ মনে পড়ল, তার মাও যখন কিছু পান করত ঠিক এভাবেই করত। কি জানি কেন লাইলীকে ও তার কার্যকলাপ দেখে তার মায়ের মতো মনে হতে লাগল। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি মা ?"

লাইলী আরজুমান বানু, ডাক নাম লাইলী।

বাহ, খুব সুন্দর নাম তো। যিনি তোমার নাম রেখেছেন তিনি ধন্য। তুমি কিসে পড় ?

ইসলামিক হিষ্ট্রিতে অনার্স।

ভেরী গুড। তোমার বাড়ি কোথায় ?

র‍্যাংকীন ষ্ট্রীটে।

আব্বা কি করেন ?

সোনালী ব্যাংকে চাকরি করেন।

বেশ মা বেশ, সন্ধ্যে হয়ে আসছে আজ তুমি না হয় আমাদের এখানে থেকে যাও। এখনও ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। তোমাদের বাড়িতে কী ফোন আছে ? লাইলীকে মাথা নাড়তে দেখে বললেন, তা হলে ঠিকানা দাও, ড্রাইভারকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিই।

লাইলী আঁৎকে উঠে বলল, না না, আমি থাকতে পারব না। আব্বা-আম্মা ভীষণ চিন্তা করবেন। আপনি বরং ড্রাইভারকে বলুন, সে আমাকে পৌঁছে দিক।

এমন সময় সেলিম ঘরে ঢুকে লাইলীর কথা শুনে বলল, ঠিক আছে মা, আমি না হয় ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সেলিমকে দেখে লাইলী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। মাথা নিচু করে বলল, দয়া একটু তাড়াতাড়ি করুন। ওদিকে বাড়িতে সবাই ভীষণ চিন্তা করছে। কথাগুলো বলার সময় তার গলার আওয়াজ কেঁপে গেল।

সোহানা বেগম কিছু একটা যেন বুঝতে পারলেন। ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে যাবে আর তুমিও সঙ্গে থাকবে।

সেলিম বলল, তুমি বড় ভীতু মা, ড্রাইভার লাগবে না, আমি একাই পৌঁছে দিয়ে আসতে পারব।

সোহানা বেগম গম্ভীরস্বরে বললেন, যা বললাম তাই কর।

মায়ের গম্ভীর স্বর শুনে সেলিম কোনো প্রতিবাদ না করে লাইলীর দিকে চেয়ে বলল, চলুন তা হলে।

লাইলী প্রথমে সেলিমের দিকে ও পরে সোহানা বেগমের দিকে চেয়ে বলল, আমার বোরখা কোথায় ?

সোহানা বেগম অবাক হয়ে বললেন, তুমি বোরখা পর ? আর ইউ ম্যারেড ?

কথাটা শুনে লাইলীর সাদা ফর্সা মুখে শরীরের সমস্ত রক্ত উঠে এসে টকটকে লাল হয়ে গেল। কোনোরকমে না বলে লজ্জা পেয়ে মাথাটা এত নিচু করে নিল যে, চিবুকটা তার বুকে ঠেকে গেল। কয়েক সেকেন্ড কেউ কথা বলতে পারল না।

সোহানা বেগম ওকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বললেন, হ্যাঁরে সেলিম, কই গাড়িতে তো ওর গায়ে বোরখা ছিল না।

সেলিম বলল, গুন্ডারা হয়তো ফেলে দিয়েছে। তারপর লাইলীকে উদ্দেশ্য করে বলল, চলুন। রেড়িওতে বলছিল, সন্ধ্যার পর আবহাওয়া আরও খারাপ হতে পারে।

লাইলী রুবীনার দিকে চেয়ে বলল, আমাকে একটা চাদর দিতে পারেন ?

রুবীনা মায়ের দিকে তাকালে সোহানা বেগম বললেন, আলমারী থেকে গরদের চাদরটা এনে দে।

রুবীনা চাদর নিয়ে এলে লাইলী সেটা নিয়ে ভালো করে মাথাসহ সারা শরীর ঢেকে নিল। তারপর সোহানা বেগমের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলল, আপনারা আমার জন্য যা করেছেন, সে ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। আল্লাহ পাকের দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া জানিয়ে ফরিয়াদ করছি, তিনি যেন আপনাদের মঙ্গল করেন।

সোহানা বেগম এরকম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের সমাজে কেউ পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে না। এত আন্তরিকতার সাথে কথাও বলে না। মেয়েটির চেহারা, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তা দেখে শুনে তার মনে হল এদের সবকিছু আলাদা হলেও কত সুন্দর ও মার্জিত। তিনি খুশি হয়ে লাইলীকে বুকে জড়িয়ে মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, আবার এস।

লাইলী মাথা কাত করে সম্মতি জানিয়ে রুবীনার হাত ধরে বলল, চলুন।

সোহানা বেগমও তাদের সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এলেন।

ড্রাইভারের পাশে সেলিম আগেই বসেছে। বড় রাস্তায় এসে সেলিম গাড়ি থামিয়ে পিছনের সীটে লাইলীর পাশে বসে ড্রাইভারকে যেতে বলল। কয়েক সেকেন্ড পর লাইলীর দিকে তাকিয়ে বলল, দয়া করে আপনার নামটা বলবেন ?

লাইলীও তার দিকে তাকিয়ে নাম বলল।

আমার নাম জানতে ইচ্ছে করছে না ?

লাইলী মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

সেলিম নাম বলে বলল, দু'একটা প্রশ্ন করতে পারি ?

লাইলী আস্তে করে বলল, করুন।

আপনি কিসে পড়েন ?

ইসলামিক হিষ্ট্রীতে অনার্সে।

আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে ?

আমি প্রায় প্রতিদিন দু'টো থেকে তিনটে পর্যন্ত লাইব্রেরীতে থাকি। ইচ্ছা করলে দেখা করতে পারেন। তারপর বলল, আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি যদি ঠিক ঐ সময় না এসে পড়তেন, তা হলে আমার যে কি হত, তা আল্লাহপাককে মালুম। কথা শেষ করে লাইলী আঁচলে চোখ মুছল।

গাড়ির ভিতর অন্ধকার বলে সেলিম ওর চোখের পানি দেখতে পেল না, কিন্তু বুঝতে পারল কাঁদছে।

লাইলী ভিজে গলায় আবার বলল, কি করে যে আপনার ঋণ শোধ করব ভেবে পাচ্ছি না।

সেলিম লাইলীর একটা হাত ধরে বলল, দেখুন, আমি শুধু একজন বিপন্নাকে সাহায্য করেছি। এটা করা প্রত্যেক মানুষের একান্ত কর্তব্য। সেলিম লাইলীর হাত ধরতে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল।

সেলিম বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, আমাকে ভুল বুঝে ভয় পাবেন না। তারপর তার দিকে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে বলল, সেই এ্যাকসিডেন্টের দিন আপনাকে দেখে ভালবেসে ফেলেছি। তারপর পাগলের মত খুঁজেছি। ভাগ্যচক্রে ফাংসানের দিন স্বল্পক্ষণের জন্য পেয়েও হারিয়ে ফেললাম। আজ দৈবদুর্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আপনার দেখা পেলাম। জানি না, আমার কথাগুলো পাগলের প্রলাপের মতো আপনার কাছে মনে হচ্ছে কি না। যাই মনে করুন না কেন,

জেনে রাখুন, এই কথাগুলো আমার কাছে চন্দ্র সূর্যের মত সত্য। তারপর তার হাত ধরে আবার বলল, তুমি কী, সরি আপনি কী আমাকে খুব অভদ্র মনে করছেন ?

লাইলী কেঁপে উঠে হাতটা টেনে নিতে গেল; কিন্তু সেলিম তার তুলতুলে নরম হাতটা ছাড়ল না। লাইলী জোর না খাটিয়ে বলল, না-না তা মনে করব কেন ? আমাকে এত অকৃতজ্ঞ ভাবতে পারলেন কি করে ? আপনার উপকারের কথা আমার অন্তরে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শুধু উপকারের কথাটাই মনে রাখবেন ? উপকারীকে ভুলে যাবেন বুঝি

আপনাদের সমাজে বুঝি সেই রকম রেওয়াজ আছে ?

গাড়ি ততক্ষণে র‍্যাংকিন ষ্ট্রীটে এসে গেছে। ড্রাইভার বলল, কোন দিকে যাব ?

সেলিম লাইলীর হাত ছেড়ে দিল।

লাইলী রাস্তা দেখিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে গাড়ি তাদের বাড়ির গেটে এসে থামল। লাইলী গাড়ি থেকে নেমে সেলিমকে বলল, আসুন। তখন বৃষ্টি একদম থেমে গেছে। সেলিম নেমে এসে যখন লাইলীর পাশে দাঁড়াল তখন সে কলিং বেলে হাত রেখেছে।

একটু পরে সাদেক দরজা খুলে ফুপু আম্মাকে একটা অচেনা লোকের সঙ্গে দেখে ভেবাচেখা খেয়ে অনেক কথা বলতে গিয়েও পারল না।

লাইলী দরজা বন্ধ করে সাদেকের হাত ধরে সেলিমকে সঙ্গে করে আসতে লাগল।

নিচের বারান্দায় হামিদা বানু রহিমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। একজন অচেনা যুবকের সঙ্গে লাইলীকে আসতে দেখে তারা পাশের রুমে ঢুকে পড়ল। এমন সময় মসজিদ থেকে মাগরীবের আযান ভেসে এল। লাইলী সেলিমকে ড্রইংরুমে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী নামায পড়বেন ?

সেলিম লাইলীর মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল, কোনো কথা বলতে পারল না।

লাইলী বুঝতে পেরে বলল, ঠিক আছে, আপনি একটু বসুন। আমি নামায পড়ে দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। তারপর সেলিমকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যে রুমটায় সেলিমকে বসান হয়েছে, সেটা ভাড়াটিয়াদের ড্রইংরুম হলেও তারা নিজেদের রুমের মতো ব্যবহার করে। সিঁড়ির মুখে মা ও ভাবির সঙ্গে লাইলীর দেখা হল। ভাবি বলল, কি ব্যাপার ? এদিকে আমরা সকলে তোমার জন্যে চিন্তায় অস্থির। তোমার ভাইয়া ও খালুজান ঘণ্টা খানেক আগে তোমাকে খুঁজতে গেছেন। তোমার বোরখা কোথায় ? কার জামা কাপড় পরে এসেছ ?

সব তোমাদের বলব, তার আগে সবাই নামায পড়ে নিই এস। নামায শেষে লাইলী সংক্ষেপে সব ঘটনা বলার সময় কেঁদে ফেলল।

হামিদা বানু বললেন, আর তোমার লেখাপড়া করার দরকার নেই। কাল থেকে ভার্সিটিতে যাওয়া বন্ধ।

লাইলী সামলে নিয়ে চোখ মুছে বলল, সে যা হয় হবে, এখন মেহমানকে তো কিছু আপ্যায়ন করান উচিত।

রহিমা বলল, ঘরে তো সবকিছু আছে ; কিন্তু পরিবেশন করাবে কে . তুমিই করাও বলে লাইলীর হাত ধরে নিজের ঘরে এসে ফ্রীজ থেকে কয়েকটা মিষ্টি ও কয়েক পীস কেক একটা প্লেটে সাজিয়ে দিয়ে বলল, যাও সখি, তোমার উদ্ধার কর্তাকে আপাতত এই দিয়েই আপ্যায়ন করাও।

লাইলী গায়ে মাথায় ভালো করে চাদরটা জড়িয়ে নাস্তার প্লেট ও পানির গ্লাস নিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকে সেগুলো টেবিলের উপর রেখে বলল, অনেকক্ষণ বসিয়ে আপনাকে কষ্ট দিলাম, সে জন্য মাফ চাইছি।

সেলিম কোনো কথা না বলে বোবা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ সেলিমকে তার দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে লাইলী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে মাথাটা নিচু করে নিল।

এদিকে রহিমা চা নিয়ে এসে পর্দার ফাঁক দিয়ে ওদের অবস্থা দেখে অনেক কিছু বুঝে নিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন ওদেরকে বাস্তবে ফিরতে দেখল না তখন বলল, লাইলী চা নিয়ে যাও।

লাইলী ভাবির গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠে সেলিমের দিকে তাকাতে আবার চোখাচোখি হয়ে গেল। লজ্জামিশ্রিত কণ্ঠে বলল, কই নিন, নাস্তা খেয়ে নিন। আমি ততক্ষণে চা নিয়ে আসি বলে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে সে ভাবিকে চায়ের কাপ ও কেতলী হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রহিমা দুষ্টমীভরা হাসি দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, এতক্ষণ ধরে বুঝি কেউ কাউকে দেখে ? এই নাও কাপ, আমি চা গরম করে আনি। অল্প চা কি আর এতক্ষণ গরম থাকে ?

লাইলী কাপ ও কেতলী তার হাত থেকে নিয়ে আমি গরম করে আনছি বলে রান্না ঘরের উদ্দশ্যে চলে গেল। চা গরম করে একটু পরে ফিরে এসে দেখল, সেলিম নাস্তার প্লেটের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। বলল, আপনি এখনও কিছু মুখে দেন নি ?

সেলিম এতক্ষণ যেন বাস্তবে ছিল না। লাইলীর গলার শব্দ পেয়ে নড়ে চড়ে বসে বলল, আপনি কী যেন বলছিলেন ?

বলছিলাম, এখনও নাস্তা খাননি কেন ?

একটা মিষ্টি হাতে নিয়ে সেলিম বলল, আপনি মনে হয় আমার সঙ্গে খাবেন না।

লাইলী বলল, কিছু প্রশ্নের উত্তর অনেক সময় দেওয়া যায় না। সেলিমকে চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়াতে দেখে বলল, সে কি ? আপনি যে কিছুই খেলেন না ?

সেলিম বলল, এবার আমিও আপনার ভাষার বলি, খেতে পারলেও অনেক সময় বেশি খাওয়া যায় না।

তার কথা শুনে লাইলী ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, ঐসব কথা শুনব না, আপনাকে সব খেতে হবে।

সেলিম তার হাসিমাখা মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আপনাকে দেখলে আমার ভুখ পিয়াস থাকে না। অভুক্ত অবস্থায় কী কিছু খাওয়া যায় ? আপনিই বলুন ?

উত্তরটাও এখন দিতে পারলাম না, দুঃখিত। যদি কোনোদিন সময় আসে তখন বলব। তারপর চায়ের কাপটা তার হাতে দিয়ে বলল, একটা কথা বলব, রাখবেন ?

বলুন, রাখবার হলে নিশ্চয় রাখব।

আব্বা ও ভাইয়া বাড়িতে নেই, যদি অনুগ্রহ করে সামনের ছুটির দিনে সকালের দিকে আসেন, তা হলে ওঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতাম।

আসবার চেষ্টা করব, কিন্তু ভুলে গেলে মাফ করে দিতে হবে। ছুটির দিন আসতে এখনও পাঁচদিন বাকি। তবে, আপনি যদি ভার্সিটিতে আগের দিন মনে করিয়ে দেন, তা হলে পাকা কথা বলতে পারি। আপনার বাবা আর ভাইয়া বুঝি আপনাকে খুঁজতে গেছেন ?

হ্যি।

এখন তা হলে আসি ? আপনার মা কী আমার সামনে আসবেন না ?

একটু বসুন, এক্ষুণি আসছি বলে লাইলী চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে একটা কাগজে সোহানা বেগমের জামা-কাপড় মুড়ে এনে টেবিল রেখে বলল, দয়া করে

এটা নিয়ে যাবেন।

এতে কি আছে

আমি আপনাদের বাড়ি থেকে যেগুলো পরে এসেছিলাম।

আপনার মা বুঝি আসবেন না ? লাইলী কিছু বলার আগে হামিদা বানু দরজার বাইরে থেকে বলে উঠলেন, আল্লাহপাকের দরবারে আপনার জন্য দোয়া করছি বাবা, তিনি যেন আপনাকে সহিসালামতে রাখেন, সব সময় সৎপথে চালিত করেন, সুখী করেন। আপনি আমার মেয়েকে গুন্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করে তার জান ও ইজ্জৎ বাঁচিয়েছেন। সে জন্য আপনার কাছে আমরা চিরকাল ঋণী থাকব। একদিন এসে ওর আব্বার ও ভাইয়ার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। আমরা আরও খুশি হব। আজকের আবহাওয়া খারাপ। তাই বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখতে চাই না। আর একদিন আসবেন, বলে চুপ করে গেলেন।

সেলিম বলল, আপনার কথা রাখার চেষ্টা করব। তারপর লাইলীর দিকে তাকিয়ে বলল, আসি।

লাইলী অনুচ্চস্বরে সালাম দিয়ে বলল, আল্লাহ হাফেজ।

নিজের অজান্তে জীবনের এই প্রথম সেলিমের মুখ দিয়ে বেরল আল্লাহ হাফেজ।

লাইলী গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। কাপড়ের প্যাকেটটা যে টেবিলের উপর রয়ে গেল, বিদায় মূহুর্তে সেদিকে কারুর খেয়াল রইল না। সেলিম গাড়িতে উঠতে ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হতে লাইলী গেট বন্ধ করে ফিরে এল।

তাকে দেখতে পেয়ে রহিমা ঘর থেকে ডাক দিল, একটু শুনে যাও মিস লাইলী আরজুমান বানু।

রহিমা যখন তার সঙ্গে রসিকতা করার ইচ্ছা করে তখন তাকে তার পুরা নাম ধরে ডাকে। তাই ঐ নামে ডাকতেই শুনেই লাইলী ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারল। সেও কম যায় না, জবাব দিল, পরে, এখন বাথরুমে যাব বলে তাড়াতাড়ী করে উপরে উঠে গেল।

রাত্রি দশটায় নিরাশ হয়ে রহমান সাহেব ও জলিল সাহেব ফিরে এসে সবকিছু শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করে সবাই দু'রাকাত শোকরানার নামায আদায় করলেন।

পরের দিন লাইলী সারা শরীরে ব্যথা নিয়ে উঠে ফযরের নামায পড়ে ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত করল। তারপর প্রতিদিনের মতো রান্না ঘরে এসে মাকে সাহায্য করতে লাগল। আব্বা নাস্তা খেতে এলে বলল, আমার বোরখা কিনে আনবে। তা না হলে আমি ভার্সিটি যাব কেমন করে।

আজ তো হবে না মা, মাসের শেষ। হাত একদম খালি। বেতন পেয়ে কিনে দেব।

তোমার বেতন পেতে তো এখনও চার পাঁচ দিন বাকি। এতদিন ক্লাস কামাই করব ?

দেখি কারও কাছ থেকে যদি জোগাড় করতে পারি, তা হলে নিয়ে আসব।

হামিদা বানু বললেন, ওর আর পড়াশোনা করার দরকার নেই। মেয়ে কি চাকরি

করে আমাদের খাওয়াবে যে, লেখাপড়া করতেই হবে ?

লাইলী মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তাই না হয় আমি চাকরি করে তোমাদের খাওয়াব। আর অমত করবে না তো ?

হয়েছে হয়েছে, তোর ভাইয়া ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। আর তুইও একদিন পরের ঘরে চলে যাবি বলে হামিদা বানু আঁচলে চোখ মুছলেন। এবার ছাড়, নাস্তা খেয়ে নে। বড় হলি এখনও ছেলেমানুষি গেল না।

লাইলী মাকে ছেড়ে দিয়ে নাস্তা খেতে লাগল।

গত পাঁচদিন লাইলী ভার্সিটি যায়নি। কারণ তার আব্বা বোরখা কিনে দিতে পারেনি। আজ ছুটির দিন তার ধারণা হল, সেলিম আজ নিশ্চয় আসবে। সকালে রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, আজ ভার্সিটির সেই ছেলেটা আসতে পারে।

হামিদা বানু বললেন, ভালো কথা মনে করেছিস। হ্যাঁরে, ওরা খুব বড়লোক না ?

হ্যাঁ, বলে লাইলী নিজের রুমে চলে গেল।

হামিদা বানু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে স্বামীর কাছে এলেন।

উনি তখন একটা হাদিসের বই পড়ছিলেন। স্ত্রীকে কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে হাদিসটা বন্ধ করে বললেন, কিছু বলবে নাকি ?

লাইলী বলছিল, ইউনিভার্সিটির সেই ছেলেটা, যে লাইলীকে সেদিন বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিয়ে গিয়েছিল, সে আজ আসতে পারে। তোমাকেওতো সেকথা বলে ছিলাম। এখন বাজার থেকে কিছু মিষ্টি, ময়দা আর ফল নিয়ে এস। কিছু ব্যবস্থা করতে হবে তো ?

রহমান সাহেব বললেন, খুব ভালো কথা মনে করেছ। আমি তো একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি করে বাজারে গেলেন। মুরগী, মাছ ও নাস্তার সবকিছু এনে বললেন, ছেলেটাকে দুপুরে খেয়ে যেতে বলা যাবে। যদি রাজি হয়, তাই মুরগী ও মাছ আনলাম। তুমি ভালো করে রান্না কর। আর বৌমাদেরও বলে দিও, তারাও আজ দুপুরে আমাদের এখানে খাবে। তারপর নিজেই নিচে এসে হাঁক দিলেন, সাদেক দাদু ঘরে আছ নাকি ?

দাদুর গলা পেয়ে সাদেক ও ফিরোজা পড়তে পড়তে বইখাতা ফেলে রেখে ছুটে এসে রহমান সাহেবকে জড়িয়ে ধরল।

সাদেক জিজ্ঞেস করল, আজকে নাকি একজন মেহমান আসবেন, আম্মা বলছিল।

রহমান সাহেব প্রতিদিন বাজার থেকে ফেরার সময় ওদের জন্য চকলেট নিয়ে আসেন। আজও এনেছেন। সেগুলো দুজনকে ভাগ করে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ ভাই, আসার তো কথা আছে। তবে সে আসুক আর নাই আসুক, তুমি মাকে গিয়ে বল, এবেলা তোমরা সবাই আমাদের ওখানে খাবে। তারপর ওদেরকে নিয়ে ড্রইংরুমে এসে বসলেন।

এক কাপ চা ও বিস্কুট নিয়ে রহিমা ঘরে ঢুকে বলল, খালুজান, আপনারা এত ঝামেলা করতে গেলেন কেন ?

ঝামেলা আর কি মা, তোমরাও তো এবাড়ির লোক। হাতের কাজ সেরে একটু উপরে যাওতো মা, তোমার খালা আম্মাকে সাহায্য করবে।

আমি এক্ষুণি যাচ্ছি বলে রহিমা খালি চায়ের কাপ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সেলিম পৌনে দশটার সময় লাইলীদের বাড়ির গেটের পাশে গাড়ি পার্ক করে কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল।

সাদেক দরজা খুলে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। সেদিন সে সেলিমকে

অল্পক্ষণের জন্য দেখেছিল, তাই চিনতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, কাকে চান ? কোথা থেকে এসেছেন ?

সেলিম এতটুকু ছেলের উকিলি জেরা শুনে একটু অবাক হয়ে বলল, আমি লাইলীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি কি বাড়িতে আছেন ?

সাদেক বলল, জ্বি আছেন, তবে তার সঙ্গে দেখা হবে না। কারণ ফুপুআম্মা কোনো বেগানা লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। যদি বলেন, তা হলে দাদুকে খবর দিতে পারি। নচেৎ এখন বিদায় হন। একজন মেহমান আসার কথা আছে। আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি।

সেলিম ছেলেটির বুদ্ধি ও কথাবার্তা শুনে আরো অবাক হয়ে বলল, যদি বলি আমিই সেই মেহমান।

এবার সাদেক অবাক দৃষ্টিতে সেলিমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বলল, সন্দেহ হচ্ছে।

কেন সন্দেহ হচ্ছে কেন ?

তিনি খুব বড় লোকের ছেলে। গাড়ি করে আসবেন। তার পোশাক পরিচ্ছদ খুব দামী।

সেলিম বড় লোকের ছেলে হয়েও পোশাকের দিকে তেমন তার খেয়াল থাকে না। সে সেদিন সাধারণ পোশাক পরে এসেছে।

লাইলী কলিংবেলের আওয়াজ শুনে হাতের কাজ সেরে বারান্দায় বেরিয়ে সাদেককে সেলিমের সঙ্গে কথা বলতে দেখে তাড়াতাড়ি নিচে এসে জলিল সাহেবকে বলল, ভাইয়া, সেই ছেলেটা এসেছে।

জলিল সাহেব গিয়ে সাদেকের শেষ কথাগুলো শুনে বললেন, সাদেক কি বেয়াদবি করছ ? বাড়িতে মেহমান এলে আগে তাকে ঘরে এনে বসাতে হয়, তারপর আপ্যায়ন শেষে আলাপ করতে হয়।

সাদেক বলল, জান আব্বু, ইনি না ফুপু আম্মাকে খোঁজ করছিলেন। তাই আমি ওনার পরিচয় জেনে নিচ্ছিলাম। তা হলে এনারই আসার কথা ছিল ? তারপর সেলিমের একটা হাত ধরে বলল, আমি তো আপনাকে চিনি না, তাই অনেক বেয়াদবি করে ফেলেছি। মাফ করে দিন।

সেলিম এতটুকু ছেলের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে আরো বেশি আশ্চর্য হয়ে বলল, না না, তুমি কোনো অন্যায় করনি। বরং আমি খুব খুশি হয়েছি।

জলিল সাহেব বললেন, ভিতরে চলুন। ওরা সবাই এসে ড্রইংরুমে বসল।

এমন সময় রহমান সাহেব ঘরে ঢুকে সালাম দিয়ে বললেন, আপনি আসায় আমরা খুব খুশি হয়েছি। সেদিন আমার মেয়েকে উদ্ধার করে যে উপকার করছেন, সে কথা আর কি বলব বাবা, আল্লাহপাকের ইচ্ছায় আমরা মেয়েকে ফিরে পেয়েছি। সেই পরম করুণাময়ের নিকট দোয়া করি, তিনি আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন।

সেলিম বলল, আমি এমন কোনো মহৎ কাজ করিনি। আপনার মেয়ে বিপদে পড়েছিলেন, আমি সাধ্যমত তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে সফল হয়েছি। এটা করা প্রত্যেক মানুষের একান্ত কর্তব্য।

জলিল সাহেব উঠে গিয়ে নাস্তা নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখলেন।

রহমান সাহেব বললেন, আপনারা নাস্তা খেয়ে নিন, আমি আসছি। কথা শেষ করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

সারা শরীর ও মাথা ঢেকে লাইলী চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন ? খালা আম্মা ভালো আছেন ?

সেলিম লাইলীর সুমিষ্ট গলার স্বরে আকৃষ্ট হয়ে সালামের জবাব না দিয়ে তার চোখে চোখ রেখে বলল, আমাদের সব ভালো। আপনি এই কয়দিন ভার্সিটি যাননি কেন ? আমি মনে করেছিলাম, বৃষ্টিতে ভিজে আপনার অসুখ করেছে।

লাইলী বলল, শরীর একটু খারাপ হয়েছিল, এখন ভালো আছি। কাল থেকে ভার্সিটি যাব। সে দুটো প্লেটে নাস্তা তৈরি করে জলিল সাহেবকে বলল, ভাইয়া আপনিও আসুন।

নাস্তা শেষে তারা যখন চা খাচ্ছিল তখন রহমান সাহেব এসে চেয়ারে বসলেন।

লাইলী আব্বাকে চা দিল।

চা খেতে খেতে তিনি বললেন, আপনাকে একটা অনুরোধ করবো রাখবেন ?

সেলিম বলল, দেখুন, আমি আপনার ছেলের মতো, আমাকে আপনি করে বলছেন কেন ? তুমি করেই বলুন।

সেলিমের কথা শুনে তার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। সেটা গোপন করার জন্য কোনো কিছু না বলে উঠে চলে গেলেন।

সেলিম কিছু বুঝতে না পেরে লাইলীর দিকে তাকিয়ে রইল।

জলিল সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, ওঁর একটা ছেলে ছিল। বি. এ. পাশের রেজাল্ট নিয়ে ফেরার সময় গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়। সেই থেকে কেউ ছেলের মতো ব্যবহার করলে সামলাতে পারেন না। ওঁর ব্যবহারে আপনি কিছু মনে নেবেন না।

লাইলীর চোখেও পানি দেখে সেলিম কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় রহমান সাহেব ফিরে এসে বসলেন। মুখটা থমথমে।

সেলিম বলল, আমি না জেনে আপনাদের মনে দুঃখ দিলাম। আমাকে মাফ করে দিন।

রহমান সাহেব ধরা গলায় বললেন, না বাবা তুমি কোনো অন্যায় করনি। শুধু শুধু মাফ চাইছ কেন ? আমি তখন যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, তুমি যদি দুপুরে একমুঠো ভাত খেয়ে যাও, তা হলে আমরা খুব খুশি হতাম।

সেলিম কারও বাড়িতে কখনো ভাত খায় না। যত বড় বন্ধু-বান্ধবী হোক না কেন, চা থেকে বড় জোর নাস্তা পর্যন্ত। কে মনে কষ্ট করল না করল, তা কোনোদিন ভাবেনি। কিন্তু আজ সে প্রতিবাদ করতে পারল না। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, আবার কষ্ট করতে যাবেন কেন ? এইতো কত কিছু খেলাম।

জলিল সাহেব বললেন, আপনার যদি কোনো অসুবিধা না থাকে, তা হলে আর আপত্তি করবেন না।

সেলিম এক পলক লাইলীর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, কত মিনতিভরা দৃষ্টিতে সে তার দিকে চেয়ে আছে। বলল, আমি এখন এক জায়গায় যাব। বেলা দুটোর মধ্যে ফিরে আসব।

রহমান সাহেব বললেন, শুনে খুশি হলাম। বেশ তাই এসো। তারপর উনি আর জলিল সাহেব চলে গেলেন।

লাইলী নাস্তার প্লেট ও চায়ের কাপ নিয়ে যেতে উদ্যত হলে সেলিম বলল, শুনুন।

লাইলী তার দিকে ঘুরে বলল, এগুলো রেখে এক্ষুণি আসছি। কথা শেষ করে চলে গেল। দু'তিন মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বলল, বলুন কি বলবেন।

আপনার ভাইয়াকে আপনি বলে সম্বোধন করছিলেন কেন ? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে ? আচ্ছা, উনি আপনার কি রকম ভাই ?

লাইলী বলল, আপনার সন্দেহ ঠিক। উনি আমাদের বাড়িতে অনেকদিন থেকে

ভাড়া আছেন। আমরা সবাই একসঙ্গে মিশে গেছি। উনি ও উনার স্ত্রী, আব্বা আম্মাকে নিজের বাবা-মার মতো দেখেন। তাদেরকে খালুজান ও খালাম্মা বলে ডাকেন। তাই আমি ওঁকে ভাইয়া আর ওঁর স্ত্রীকে ভাবি বলে ডাকি।

সেলিম বলল, সত্যি, এরকম সচরাচর দেখা যায় না। তারপর দুজনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দু'জন দু'জনকে দেখতে লাগল। ফলে বারবার চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে। এক সময় সেলিম বলল, কথা বলছেন না কেন ?

লাইলী লজ্জা পেয়ে আঙ্গুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে বলল, চুপ করে থেকেও তো অনেক কিছু বলা যায়।

তা যায়। তবে তারা হল গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত। কিন্তু আমরা তো মানুষ, কথা বলার জন্য আমাদের মুখ আছে। যাই হোক, আমাকে এখন একটু উঠতে হবে বলে সেলিম দাঁড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় সাদেক ছুটে এসে বলল, ফুপু আম্মা, আপনাকে আম্মা ডাকছেন। তারপর সেলিমের দিকে তাকিয়ে বলল, তা হলে আপনিই সেদিন ফুপু আম্মাকে গুন্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন।

হ্যাঁ বলে সেলিম সাদেকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তোমার ফুপু আম্মা কিন্তু আমাকে অনেক দিন আগে হামলা করে ঘায়েল করে রেখেছেন।

সাদেক অবাক হয়ে লাইলীর দিকে চেয়ে বলল, তুমিও তা হলে মারামারী করতে পার ?

সেলিমের কথা শুনে লাইলী চমকে উঠল। তারপর সাদেককে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তুমিই বলত বাপি, আমাকে কখন কুস্তি বা মারামারী করতে দেখেছ ?

কই নাতো ? তারপর সেলিমের দিকে চেয়ে বলল, আপনি তা হলে একথা বললেন কেন ?

সেলিম ওর গালটা আলতো করে টিপে দিয়ে বলল, সে তুমি এখন বুঝবে না, বড় হলে বুঝবে। এখন আসি দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে সেলিম চলে গেল।

ঠিক আড়াইটায় সেলিম ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে চারটের সময় ঘরে ফিরল।

পরের দিন সেলিম লাইব্রেরীতে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

দুটো দশ মিনিটে লাইলী এসে দেখল, সেলিম চেয়ারে বসে একটা বই দেখছে। সেখানে আর কেউ নেই। শুধু লাইব্রেরীয়ান এককোণে তার সীটে বসে কি যেন লিখছে। লাইলী সেলিমের সামনে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন ?

সেলিম শুধু তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সালামের উত্তর বা কোনো কথা বলল না।

লাইলী তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সেও বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর লজ্জা পেয়ে মাথাটা নিচু করে নিয়ে কম্পিত স্বরে বলল, আমি কাছে এলেই আপনি আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকেন কেন ? আমার লজ্জা করে না বুঝি ? এই কথা বলার পর ও যখন সে কথা বলল না তখন লাইলী আবার বলল, কী চুপ করে আছেন কেন ? কথা বলুন !

এবার সেলিম একটু নড়েচড়ে বসে বলল, কথা বলতে বলছেন ? বললে শুনবেন তো ?

লাইলী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, শুনবার হলে নিশ্চয় শুনবো।

তা হলে আসুন আমার সঙ্গে বলে সেলিম চেয়ার ছেড়ে এগোল।

লাইলী মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে তার পিছু নিল।

সেলিম একেবারে গাড়ির কাছে এসে ড্রাইভিং সীটে বসে পাশের দরজা খুলে

দিয়ে বলল, উঠে আসুন।

গাড়িতে উঠবে কিনা লাইলী চিন্তা করতে লাগল।

সেলিম বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? উঠে আসুন। তাকে ইতস্তত: করতে দেখে আবার বলল, আমাকে কী আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না ?

এরপর লাইলী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, ধীরে ধীরে গাড়িতে উঠে দরজার কাছ ঘেঁসে বসল।

সেলিম সিগারেটের প্যাকেট বার করে বলল, আমি সিগারেট খেলে আপনার অসুবিধা হবে না তো ?

লাইলী শুধু মাথা নাড়াল।

সিগারেট ধরিয়ে সেলিম গাড়ি ছেড়ে দিল। একেবারে হোটেল ইন্টারকনের গেটে গাড়ি পার্ক করে নেমে লাইলীর দিকের দরজা খুলে দিয়ে নামতে বলল। নামার পর তাকে নিয়ে একটা কেবিনে ঢুকে মুখোমুখি বসে বলল, কি খাবেন ? তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, অন্তত এখানে যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ মুখের নেকাবটা সরিয়ে মুখটা খোলা রাখুন।

লাইলী কিন্তু একটা কথাও বলল না, আর মুখের নেকাবও সরাল না, মাথা নিচু করে বসে রইল।

বেয়ারা বাইরে সাড়া দিলে সেলিম তাকে ডেকে দই মিষ্টির অর্ডার দিল। বেয়ারা চলে যেতে উঠে এসে লাইলীর মুখের নেকাব সরিয়ে দিয়ে অবাক হয়ে দেখল, তার আপেলের মতো নিটোল গোলাপী গাল বেয়ে অশ্রুবিন্দুগুলো মুক্তার ন্যায় গড়াচ্ছে। ভ্যাবাচাখা খেয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি, মানে আপনি কাঁদছেন ?

বেয়ারা আসার শব্দ পেয়ে লাইলী মাথাটা আরও নিচু করে নিল।

সেলিম বেয়ারাকে বলল, আমি না ডাকা পর্যন্ত তোমার আসার দরকার নেই। বেয়ারা নাস্তার প্লেট রেখে ফিরে যেতে, সেলিম তার চিবুক ধরে তুলে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল।

লাইলী চোখ বন্ধ করে মুক্তাবিন্দু ঝরাতে লাগল।

তার শরীরের কাঁপনি অনুভব করে সেলিম চিবুক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, জ্ঞানমতে আমি কোনো অন্যায় করিনি। তবু যদি অজান্তে করে থাকি, তবে মাফ করে দিন। প্লীজ আর চুপ করে থাকবেন না। তারপর হাঁটুগেড়ে বসে হাত জোড় করে বলল, চোখ খুলে দেখুন, আপনার সেলিম হাত জোড় করে আপনার কাছে মাফ চাইছে।

লাইলী অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে রুমালে চোখ মুছে সেলিমকে ঐ অবস্থায় দেখে দাঁড়িয়ে জোড় করা হাত ধরে বলল, ছি ছি, আপনি একি করছেন ? উঠুন। সেলিম চেয়ায়ে বসার পর লাইলী আবার বলল, আপনি কোনো অন্যায় করেন নি, করেছি আমি।

সেলিম বলল, আমার তো মনে হচ্ছে আমরা কেউ-ই করিনি। ঠিক আছে, আগে নাস্তা খেয়ে নিই আসুন, তারপর বিচার করব, কে অন্যায় করেছে।

নাস্তা খাওয়ার পর লাইলী বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

করুন !

ঐ দিন আমাকে আপনাদের গাড়িতে কে এনেছিল ?

প্রথমে মা আপনাকে নিয়ে আসার জন্য গিয়ে দেখে আপনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তখন আমি দু'হাতে তুলে আপনাকে নিয়ে আসি।

লাইলী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে বলল, আমি আর একটা কথা জিজ্ঞেস

করতে চাই।

আপনি অত সংকোচ করছেন কেন ? যতকিছু জিজ্ঞেস করুন না কেন, উত্তর দিতে আমি দ্বিধা বোধ করব না। আমি সবকিছু খোলাখুলি পছন্দ করি। কারুর মতো মনে এক আর বাইরে এক, এটা আউট অফ মাই প্রিন্সিপাল।

আপনারা তো খুব বড় লোক ?

সেলিম ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

আমি যতদূর জানি, যারা খুব বড়লোক, তারা ধর্মকে খুব এড়িয়ে চলে। আপনাদের বেলায়ও কি কথাটা প্রযোজ্য

দেখুন, ধর্ম কি জিনিস জানি না। তবে মানব ধর্ম আমি মেনে চলি। যা কিছু ন্যায় তাকে ধর্ম জ্ঞান করি। আর যা কিছু অন্যায় তাকে অধর্ম মনে করি।

আপনি ঠিক বলেছেন। তবে কি জানেন, মানুষ নিজের জ্ঞানের দ্বারা ন্যায় অন্যায় বিচার করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ভুল করে ফেলে। ফলে একটা জিনিস তার কাছে ন্যায় হলেও অন্যের কাছে অন্যায় বলে মনে হয়। কথায় বলে, যত মত তত পথ। তাই আমাদের তথা বিশ্বের সমস্ত মানুষের উচিত, সারা মখলুকাতের যিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁর আইন কানুন মেনে চলা। কারণ একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন তার সৃষ্টিজীবের জন্য কি কি আইন কানুন দরকার হতে পারে। সেই জন্য তিনি কোরআন পাকে এবং তার প্রেরিত রাছুল হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর মারফত হাদিসে সব আইন-কানুন বাতলে দিয়েছেন। সারা বিশ্ববাসী যদি কোরআন ও হাদিস মোতাবেক রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মেনে চলত, তা হলে পৃথিবীতে এত অশান্তির বহ্নিশিখা জ্বলে উঠত না। আর কোটি কোটি টাকা খরচ করে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করে মানুষ মারার ষড়যন্ত্র করত না। ক্লাস এইটের ইংরেজী বই-এ পড়েছিলাম, "ম্যান ইজ দি ওয়ারস এনিমি অফ ম্যান"। মানুষই মানুষের সব থেকে বড় শত্রু। আপনার নাম যখন মুসলমান তখন নিশ্চয় আপনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আপনি আমার থেকে বেশি জ্ঞানী। তবু আপনাকে অনুরোধ করব, ইসলাম সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী ভাষায় অনেক ধরণের বই আছে সেগুলো পড়তে। তা হলে নিজের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতি জানতে পারবেন। আজকাল স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়ে এবং অনেক উচ্চ ডিগ্রীধারী নর-নারী বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিকে দেখে শুনে সেগুলোকে ভালো মনে করে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় কি জানেন ? তারাই আবার মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কোরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন না করে আল্লাহর আইন-কানুনকে বিদ্রূপ করে। যাই হোক, আমি তো অনেকক্ষণ বক বক করলাম, মনে কিছু করেননি তো ?

সেলিম বলল, না বরং আপনার কাছে আমি অনেক নতুন জিনিস জানতে পারলাম।

লাইলী বলল, আপনি ভুল বললেন। আমি নতুন কিছু বলিনি। জানেন নি বলে পুরান কথাগুলো নতুন বলে মনে হয়েছে।

তা না হয় হল। আপনি কাঁদছিলেন কেন বলবেন না ?

লাইলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সত্য কথা অনেক সময় অপ্রিয় হয়। উত্তরটা সেই রকম হয়ে যাবে যে ?

যতই অপ্রিয় হোক, তুমি-মানে আপনি বলুন।

আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন।

তুমিও তা হলে তাই বলবে বল ?

দেখুন মেয়েরা সাধারণতঃ ছেলেদের চেয়ে একটু ব্যাকওয়ার্ড হয়। তাই আপনি এ্যাডভান্স হন, আমিও আপনার পিছু নেবার চেষ্টা করব। সেলিমকে চুপ করে থাকতে

দেখে লাইলী বলতে শুরু করল, আমি গোড়ার কথায় ফিরে যাচ্ছি। প্রথমে আপনি স্বীকার করেছেন, আপনারা খুব বড়লোক। সে কথা আপনাদের বাড়িতে জ্ঞান হওয়ার পর বুঝতে পারি এবং তখন থেকেই খুব ভয় পেয়েছি।

সেলিম তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ভয় পেলে কেন ?

লাইলী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, আজ থাক আর একদিন বলব। এখন ক্লাশে যেতে হবে চলুন।

রীষ্টওয়াচের দিকে চেয়ে সেলিম বলল, তুমি আগে আমার দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর ক্লাশ করার কথা চিন্তা করব। আমার প্রশ্নগুলো তুমি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ কেন ?

লাইলী বলল, আপনার দু'টি প্রশ্নের উত্তরে মনের মধ্যে অনেক কথা এসে ভীড় করছে। কিন্তু যখন মনে পড়ছে আপনি বিপদ থেকে বাঁচিয়ে আমাকে তথা নারী জাতিকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তখন আর কোনো কথা বলতে পারছি না। তা ছাড়া কথাগুলো শুনে আপনি আমাকে ভালো মন্দ দুটোই ভাবতে পারেন এবং মনে কষ্টও পাবেন।

তুমি জান না লাইলী, তোমাকে আমি কতটা ভালবেসে ফেলেছি। তোমার কোনো কিছুই আমাকে এতটুকু কষ্ট দেবে না। তুমি নির্ভয়ে বল।

প্রথম কারণ হল, ইসলামের আইন অনুযায়ী যুবক যুবতীদের নির্জনে দেখা করা হারাম। দ্বিতীয় কারণ হল সেই প্রথম ঘটনার দিন থেকে আমিও আপনাকে মনে প্রাণে ভালবেসে ফেলেছি। তখন কিন্তু জানতাম না, আপনি বড় লোকের ছেলে। যখন জানতে পারলাম তখন থেকে আপনাকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছি। কিন্তু সফল হতে পারিনি। সব সময় আপনার কথা মনে পড়ে। সামনে পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, সেকথাও ভুলে যাই। বড় লোকদের আভিজাত্যের অহংকারের ও তাদের ছেলেদের চরিত্রহীনতার কথা বাস্তবে দেখে এবং বই-পত্রে পড়ে তাদেরকে আমি বড় ভয় ও ঘৃণা করি। কিন্তু এমনি ভাগ্যের খেলা যে, হঠাৎ আপনার সাথে কি হতে কি হয়ে গেল। আপনাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে করে আমি ভয় পেয়ে কেঁদেছি।

আমার কি এমন জেনেছ যার ফলে ভয় পেয়েছ। আমাকে দেখে কি অহংকারী ও চরিত্রহীন বলে মনে হয় ?

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে লাইলী বলল, তা হলে তো বেঁচে যেতাম। ঐ সব ভেবে মন থেকে আপনার স্মৃতি আস্তাকুড়ে ফেলে দিতাম। আপনাকে ব্যক্তিক্রম দেখে তা পারছি না। যত চেষ্টা করছি ততই আপনি চোরাবালির মত আমার অন্তরে গেড়ে বসে যাচ্ছেন। তার শেষের দিকে কথাগুলো কান্নার মত শোনাল। তারপর কয়েক সেকেন্ডচুপ করে থেকে আবার বলল, আপনারা বিরাট বড়লোক। আমরা গরিব। আপনার সঙ্গে এভাবে মেলামেশা কি ঠিক হচ্ছে ? একটা নগণ্য মেয়ের জন্য আপনি আপনাদের আভিজাত্যে পদাঘাত করতে পারবেন কি ? আপনার অভিভাবকরা কি আমাকে মেনে নিতে পারবেন ? সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, তার চেয়ে এক কাজ করুন, আমার স্বপ্ন আমার অন্তরেই থাক। আপনি দয়া করে আমাকে ভুলে যান। আমি সাধারণ ঘরের মেয়ে। আপনাদের সোসাইটিতে আমার চেয়ে বড়লোকের অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে। তাদের দিকে একটু নজর দিলে আশা করি আমার কথা আর মনে থাকবে না। আপনাকে না পেলে যে দুঃখ পাব, আমাকে জড়িয়ে আপনার কোনো ক্ষতি হলে তার চেয়ে লক্ষ্যগুণ বেশি পাব। আমি কেঁদে কেঁদে শেষ হয়ে গিয়েও

যদি আপনাকে সুখী দেখি, তা হলে আমার জীবন সার্থক মনে করব। আশা করি আমার কাঁদার কারণ বুঝতে পেরেছেন।

সেলিম এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। লাইলীর কান্না দেখে তার চোখেও পানি এসে গেল। চোখ মুছে বলল, হ্যাঁ বুঝেছি। তুমি অকপটে তোমার মনের কথা আমাকে বলতে পেরেছ বলে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ পর্যন্ত আমাদের সোসাইটিতে যত মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তারা শুধু ঐশ্বর্যকে ভালবাসে, আমাকে নয়। আমি তোমার সৎসাহস দেখে শুধু অবাক হয়নি, খুব আনন্দ বোধও করছি। আমার মন বলছে অপাত্রে প্রেম নিবেদন করিনি। তুমি আমাকে যে সমস্ত কারণে ভালবেসে ফেলেছ, আমিও সেইসব কারণে তোমার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। সেখান থেকে আর ফিরতে পারব না। প্রেম ধনী-গরিব বিচার করে না। আমাদের প্রেম যদি সত্যিকার প্রেম হয়, তা হলে ঐশ্বর্যের ব্যবধান আর বংশ মর্যাদা বাধা হতে পারবে না। শোন লাইলী, তুমি আমার স্বপ্ন, আমার মানষী। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না। তুমি যদি ইচ্ছা করে সরে যাও, তা হলে আমার জীবনের ঝুঁকি তোমারই উপর বর্তাবে।

লাইলী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কিন্তু আমি যে সমাজে, যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি সেটা আপনাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি যে কোনো কাজ করি, সেটাকে ধর্মের কষ্টিপাথরে যাঁচাই করে করি। সে সমস্ত আপনি যদি অপছন্দ করেন, তা হলে আমাদের দাম্পত্ত জীবনে খুব তাড়াতাড়ি ফাটল ধরবে। তখন দুজনেরই জীবন খুব দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

সেলিম বলল, আমি তো জানি মেয়েদের প্রধান ধর্ম হল, স্বামীকে সব বিষয়ে অনুসরণ করা এবং তার প্রত্যেক কথায় ও কাজে সম্মতি দিয়ে সেই মতো করা।

আপনি ঠিকই জানেন। তবে অর্ধেকটা। বাকি অর্ধেকটা হল, স্বামী যদি স্ত্রীকে আল্লাহ ও রাসূলের (দঃ) আইনের বাইরে কোনো কাজ করতে বলে, তা হলে সে স্বামীর আদেশ অমান্য করে আল্লাহ ও রাসূলের (দঃ) আদেশ মানবে। তাতে যদি বিচ্ছেদ ঘটে তবুও। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার উপরও ঐ একই আদেশ। মোট কথা পিতা মাতা হোক আর স্বামী-স্ত্রী হোক, যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের (দঃ) হুকুমের বাইরে আদেশ করলে সেক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের (দঃ) হুকুম অগ্রগণ্য। এমন কি জেহাদের ময়দানে ছেলে পিতা মাতার বিরুদ্ধে এবং স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে এবং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ছেলে পিতা মাতাকে এবং স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করতে পারে। ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ আছে।

সেলিম বলল, তুমি আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী। তোমার সঙ্গে যুক্তিতে পারব না। কিন্তু মনে রেখ, যুক্তি দিয়ে তুমি আমার প্রেমের আগুন নেভাতে পারবে না। তুমি আউট বই অনেক পড়েছ। আমিও যদি পড়তাম, তা হলে তোমার যুক্তিকে খণ্ডন করে তোমাকে হারিয়ে দিতাম।

লাইলী বলল, আমি জ্ঞানী না ছাই। জ্ঞানীদের পায়ের ধূলিকণাও নই। তবে আমি অহঙ্কার করছি না, আল্লাহপাকের শোকর গুজার করে বলছি, তিনি আমাকে ইসলামের অনেক বই পড়ার তওফিক এনায়েৎ করেছেন। আমাকে হারাতে হলে আপনাকে আউট বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বইও পড়তে হবে বলে লাইলী মৃদু হাসল।

তাই পড়ব বলে সেলিম তার দিকে চেয়ে রইল। লাইলীর মৃদু হাসি তার অন্তরকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, সত্যি, আল্লাহ তোমাকে

এত সুন্দরী করে সৃষ্টি করেছেন যে, যতই দেখছি ততই দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু দেখার পিয়াস আর মিটছে না।

লাইলী নিজের প্রশংসা শুনে ভীষণ লজ্জা পেল। বলল, দেখুন, কটা বেজেছে খেয়াল আছে ?

সেলিম বেয়ারাকে ডেকে দুটো কো-কের অর্ডার দিয়ে বলল, আর কিছু খাবে ?

না বলে লাইলী চুপ করে রইল।

বেয়ারা কোক দিয়ে ফিরে গেলে সেলিম বলিল, ক্লাস কামাই করে দিলাম, আমার উপর খুব রাগ হচ্ছে, না ?

লাইলী মৃদু হেসে বলল, আপনারও তো ক্লাস কামাই হল, তার জন্য আমার উপর রাগ হচ্ছে না ?

সেলিমও মৃদু হেসে বলল, এটা বুঝি আমার উত্তর হল ? তোমার উপর রাগ হবে কেন ? বরং তোমার কাছ থেকে অনেক জ্ঞান তো পেলামই আর কি পেলাম জান ?

লাইলী মাথা নাড়াল।

আর পেলাম আমার প্রিয়তমার মনের খবর। যা আমার কাছে সারাজীবনের পরম পাওয়া। যা না পেলে আমার জীবন বৃথা হয়ে যেত। আমারটা তো শুনলে, এবার তোমারটা শুনাও।

আমারটা শুনতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি ? তা হলে শুনুন, আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার মত দীনহীনা মেয়ে আপনার অন্তরে বাসা বেঁধেছে। আল্লাহ পাককেই মালুম আমি কতদিন সেই বাসায় বাস করতে পারব।

সেলিম তৎক্ষণাৎ বলল, আমার জীবন যদি সত্য হয়, তবে চিরকালই সেই সত্যের সঙ্গে তুমি আমার অন্তরে বাস করবে।

লাইলী লজ্জা পেয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, এবার চলুন। নচেৎ রিকশাওয়ালা ফিরে যাবে।

যাক না ফিরে ভালইতো। আমি গাড়ি করে তোমাকে পৌঁছে দেব। বিল মিটিয়ে দিয়ে দুজনে গাড়িতে উঠল। সেলিম জিজ্ঞেস করল, ভার্সিটির গেটে রিকশার খোঁজ করবে, না আমার সঙ্গে যাবে ?

প্রত্যেক দিন লাইলী ভার্সিটিতে পৌঁছে ফেরার টাইমটা রিকশাওয়ালা করিমকে বলে দেয়। আজ চারটের সময় আসতে বলে দিয়েছিল। সে সাড়ে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে অন্য প্যাসেঞ্জার নিয়ে চলে গেছে। সেলিম ভার্সিটির গেটে গিয়ে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, তোমার রিক্শা নেই, এই হতভাগা তার প্রিয়তমাকে পৌঁছে দিক ?

আপনি হতভাগ্য হতে যাবেন কেন ? বরং এই হতভাগীর জন্য এত কষ্ট করবেন ? তার চেয়ে আমি একটা রিকশা করে চলে যেতে পারব। আমার মত সাধারণ একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরলে আপনার গার্লফ্রেন্ডরা আপনাকে কিছু বলুক তা আমি চাই না। তা ছাড়া আপনাদের সমাজে ইজ্জৎ আবরুর কোনো মূল্য নেই। কিন্তু গরীবদের টাকা না থাকলেও তাদের তা আছে।

সেলিম গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, তোমার বেশীর ভাগ কথা বড়লোকের প্রতি হুল ফুটান। আর অনেক বোঝাও যায় না।

লাইলী বলল, আগেই তো বলেছি, সত্য বেশির ভাগ সময় অপ্রিয় হয়। আমি স্পষ্ট কথা বলতে ভালবাসি। আমার কথা না বোঝার তো কোনো কারণ নেই। যেমন ধরুন, বড়লোকের ছেলে কোনো গুরুতর অন্যায় করলে, টাকার জোরে তা

চেপে দেওয়া হয়। আর কোনো গরিব ছেলে সেই অপরাধ করলে, বিচার করে চাবুক মেরে তার গা থেকে চামড়া তুলে নেয়া হয় বা পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। বড় লোকের মেয়েরা অর্দ্ধনগ্না হয়ে বাইরে গেলে, তাদের ইজ্জৎ যায় না এবং সমাজে তাদেরকে নিয়ে কেউ সমালোচনাও করে না। কিন্তু গরিব লোকের মেয়েরা গেলে তাদের ইজ্জৎও যায় এবং সমাজে তাদের সমালোচনাও হয়। আরও শুনুন আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে বা আপনাদের বাড়িতে গেলে কেউ কিছু বলতে সাহস করবে না বা বলবে না। কারণ আপনারা বড়লোক এবং এটা আপনাদের সমাজের রীতি। কিন্তু কেউ যখন আমাদের বাড়ির সামনে আপনার গাড়ি থেকে দু'একদিন আমাকে নামতে দেখবে, তখন বড়লোক, গরীব লোক সকলের কাছে আমি সমালোচনার পাত্রী হয়ে যাব।

সেলিম গাড়ি থামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তার মানে আমাকে তোমাদের বাড়িতে যেতে নিষেধ করছ ?

নিজের কথার মর্ম যে এটাই বোঝায়, সেলিমের কথা শুনে তা বুঝতে পেরে লাইলী কি বলবে ঠিক করতে পারল না। ভীষণ লজ্জা পেয়ে চুপ করে চিন্তা করল, শেষের কথাগুলো এ সময় বলা উচিত হয় নি।

সেলিম তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, তবু যা হোক একটা কথাতেও তোমাকে হারাতে পারলাম।

লাইলী লজ্জায় কিছু বলতে পারল না।

সেলিমও আর কিছু না বলে তাদের ঘরের গেটের কাছে এসে গাড়ি থামাল। তারপর হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল, খুব পিয়াস লেগেছে, একগ্লাস পানি খাওয়াবে ?

লাইলী গাড়ি থেকে নেমে বলল, অফকোর্স, আসুন আমার সঙ্গে। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নই।

আজ নয় অন্য দিন। তারপর লাইলী কিছু বুঝে উঠবার আগে সেলিম সাঁ করে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

লাইলী তার গাড়ির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। গাড়িটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে কলিং বেলে চাপ দিল।

পরের দিন অফ পিরিয়র্ডে কমনরুমে লাইলীর প্রিয় বান্ধবী সুলতানা তাকে জিজ্ঞেস করল, সই, গতকাল শেষের দুটো ক্লাসে তোকে খুঁজে পেলাম না কেন ? বাসায় চলে গিয়েছিলি বুঝি ?

তুই আগে বল, আমাকে খোঁজ করছিলি কেন ?

বা-রে, তোকে আমি আবার কবে খোঁজ করিনি ? তবে একটা বিশেষ খবর শোনাব বলে তোকে আরও খোঁজ করছিলাম।

সুলতানার আব্বা বিরাট বড়লোক। কিন্তু ইসলামের খুব পাবন্দ। পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে ঢাকায় দু'ইটি বাড়ি পেয়েছেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত, সরকারী বড় অফিসার। গরিবদের প্রতি খুব স্নেহপরায়ন। তার কোনো পুত্র সন্তান নেই। শুধু চার মেয়ে। সুলতানাই বড়। সেও বোরখা পরে ভার্সিটি আসে। ওদের ফ্যামিলী খুব পর্দানশীন। ওর মামাতো ভাই খালেদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে দুজনের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে আছে। সে এফ, আর সি, এস, ডিগ্রী নিতে বিলেত গেছে। পাশ করে ফিরে এলেই তাদের বিয়ে হবে। এটা তার শেষ বর্ষ। তারই চিঠি এসেছে। লাইলী ও সুলতানা দুই সই। দুজন দুজনের মনের সব গোপন কথা

প্রায়ই বলাবলি করে। হবু স্বামীর চিঠি পেয়ে কিছু কথা বলবে বলে গতকাল সে লাইলীকে খোঁজ করেছিল।

সুলতানার কথা শুনে লাইলী হেসে উঠে বলল, তোর বিশেষ খবর তো খালেদ সাহেবের চিঠি ? কই বের কর, তোর জন্য কতটা উতলা হয়ে আছে দেখি।

সুলতানা বলল, সত্যি সই, ওর চিঠি পেয়ে এক এক সময় কি মনে হয় জানিস ?

কি ?

যদি আমাদের বিয়ে হয়ে যেত, তা হলে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ওর কাছে চলে যেতাম। ওকে আজ চার বছর দেখিনি। ওর কথা মনে পড়লে আমি স্থির থাকতে পারি না। তুই তো আমাদের সব কথা জানিস। তোকে তো আমি কোনো কিছু গোপন করি নি। এই নে পড়ে দেখ বলে চিঠিটা তার হাত দিয়ে রুমালে চোখ মুছল।

লাইলী তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগল।

সুলতানা, প্রেয়সী আমার,

গতকাল তোমার নরম তুলতুলে হাতের লেখা পত্র আমাকে নবজন্ম দান করেছে। তোমার নাম সার্থক। সত্যি তুমি সম্রাজ্ঞী। তবে কোনো দেশের নয়, আমার হৃদয় রাজ্যের। আমার চিঠি পাওয়ার ডেট ওভার হয়ে যেতে তুমি থাকতে না পেরে আমাকে চিঠি দিয়েছ। খুব অভিমান হয়েছে না ? হবারই কথা। কিন্তু না দেওয়ার কারণটা জানলে অভিমান কী রাখতে পারবে ? আমার টাইফয়েড হয়েছিল। আজ পঁচিশ দিন পর ভাত খেলাম। যোহরের নামায পড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। আগেও তোমাকে অসুখের কথা জানাতে পারতাম, তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে, সামনে পরীক্ষা, তাই জানাইনি। আল্লাহপাকের ইচ্ছায় ভালো হয়ে পত্র দিলাম। এবার আর আমার হৃদয়ের রানীর অভিমান নিশ্চিয় নেই ? অসুখের সময় তোমাকে কাছে পেতে খুব ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু বিধির বিধান লংঘন করবে কে ? তোমাকে কাছে পেতে অনেক বাধা। তাই আল্লাহপাকের কাছে সাহায্য চেয়ে সবর করছি। এবার দেশে ফিরে দেখব কেমন করে তুমি দূরে থাক। জান, তোমাকে চিঠি লিখতে বসলে এক সঙ্গে অনেক কথা এসে ভীড় করে। কোনটা লিখব, না লিখবো ঠিক করতে না পেরে শেষে সব গুলিয়ে যায়। তোমার স্মৃতি আমার তনু-মনুর সঙ্গে মিশে রয়েছে। যদিও জানি তুমি আমার, তবু মনে হয় তোমাকে পাব তো ?

ছুটির দিন হোষ্টেলের সব ছেলেরা কত জায়গায় বেড়াতে যায়। আমার যেতে মন চায় না। একদিন বন্ধু জায়েদ ইবনে সাঈদ, সে সৌদি আরব থেকে এসেছে, জোর করে মিউজিয়াম ও চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে গেল। তার সঙ্গে গেলাম, সবকিছু দেখলাম ; কিন্তু মনে শান্তি পেলাম না। আমার তখন মনে হয়েছে, তোমাকে সাথে না নিয়ে শান্তি পাচ্ছি না। আমাকে সে বলল, কিরে তুই অমন মন মরা হয়ে আছিস কেন ? এটাই তো হেসে খেলে বেড়াবার সময়। আমি বললাম, সবাইকে সব সময় সব কিছু ভালো নাও লাগতে পারে।

জান, এখানে তো কত মেয়ে চোখে পড়ে, তাদেরকে দেখলে তোমার কথা আরও বেশি মনে পড়ে। সেইজন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাইনি। একরাত্রে চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখলাম, তুমি হঠাৎ এখানে এসে গেছ। আমাকে রাত দুটো পর্যন্ত পড়তে দেখে বই কেড়ে নিয়ে জোর করে ঘুম পাড়ালে। আমার তখন খুব ঘুম পেয়েছিল, আমি তোমার কোলে মাথা রেখে

ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘাড়ে ব্যথা অনুভব হতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখলাম তোমার কোলে নয় টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছি। এখন রাখি, অসুখ হয়ে পড়ার অনেক ক্ষতি হয়েছে। পড়াশোনায় মন দেব। ভালো থেক, আমিও থাকার চেষ্টা করব। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি–

তোমার খালেদ।

লাইলী চিঠিটা ভাঁজ করে সুলতানার হাতে ফেরত দিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সত্যি তোদের দুজনের কথা ভেবে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবে আমিও কিছু কথা বলে তোর মনের দুঃখ লাঘব করতে পারি, যদি তুই কিছু খাওয়াস ?

বেশতো খাওয়াব বল না কি কথা ?

জানিস, আমি না বলে লাইলী মুখটা নিচু করে চুপ হয়ে গেল।

কি হল চুপ করে গেলি কেন ? মাথা তুলবি তো বলে সুলতানা তার চিবুক ধরে তুলে দেখল, লজ্জায় মুখটা রাঙা হয়ে গেছে। কিরে অত লজ্জা পাচ্ছিস কেন ? আমি তো পুরুষ না।

আমি না একজনের প্রেমে পড়ে গেছি বলে লাইলী তাকে জড়িয়ে ধরল।

আরে পাগলি ছাড় ছাড় ? কেউ দেখলে কি ভাববে বলতো ?

লাইলী তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে দিল।

সুলতানা সোৎসাহে জিজ্ঞেস করল, কার প্রেমে পড়েছিস রে ?

একটা ছেলের।

আর তাতো বুঝলাম, কিন্তু ছেলেটা কে ? তার নাম কি সে কি করে। তার বাড়ি কোথায় ?

থাম থাম, তোর অত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। যতটুকু জানি বলছি, ছেলেটার নাম সেলিম, এবছর স্ট্যাটিসটিক্স-এ অনার্স পরীক্ষা দিবে। বাড়ি গুলশানে।

ওমা তা হলে আমিওতো তাকে চিনি। ওরা আমাদের দুর সম্পর্কের আত্মীয় হয়। ওদের কেউ নামায রোযা তো করেই না, কলেমা জানে কিনা সন্দেহ। ওর আব্বা বলতো আল্লাহকে কী কেউ কোনোদিন দেখেছে যে, তার উপাসনা করব ? আমার বয়স তখন দশ এগার হবে। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, কি একটা ফ্যাংসানে ওদের বাড়িতে আব্বা-আম্মার সঙ্গে ছেলেবেলায় আমি একবার গিয়েছিলাম। আম্মাকে বোরখা পরা দেখে সকলে হেসেছিল। সেলিমের আব্বা তো সকলের সামনে আমাকে সালওয়ার কামিজ ও মাথায় ওড়না দেওয়া দেখে আব্বাকে বললেন, এযুগে আর ওসব পোষাক মানায় না। ঐসব ওল্ড মডেল। অত জামা কাপড় পরে থাকলে গায়ে আলো বাতাস লাগতে না পেরে অসুখ করবে। আব্বাও ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, দেখুন আপনারা সব উচ্চ শিক্ষিত, আমি দু'একটা কথা বলতে চাই। জানি না কথাগুলো আপনাদের ভালো লাগবে কি না। আদিম যুগের মানুষ জঙ্গলে ও পাহাড়ের গুহায়ে বাস করত। তারা ন্যাংটা থাকত। যাদেরকে আমরা অসভ্য, জঙ্গলি ও বর্বর বলে থাকি। তারপর ক্রমান্বয়ে তারা গুহা ছেড়ে কুঁড়ে ঘরে বসবাস করতে শিখল এবং লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের ছাল ও পাতা ব্যবহার করত। আরও অনেক যুগ পরে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে আরম্ভ করল। তারা বুঝল শরীরের সৌন্দর্য ধরে রাখতে হলে শরীরের আবরণ দরকার এবং লজ্জা স্থানগুলো ঢেকে রাখা দরকার। তাই তারা কাপড় তৈরি করে পরতে শিখল। কিন্তু আমরা আজ চরম সভ্যতা লাভ করে যদি সে আবরণ উম্মুক্ত করে শরীরের গোপন অংগের বেশিরভাগ সকলকে দেখিয়ে বেড়াই, তা হলে তো আবার আমরা সেই অসভ্য বর্বর যুগে ফিরে যাচ্ছি।

কিন্তু তাও বা বলব কি করে সে যুগে নর-নারী সকলেই উলঙ্গ থাকত। কিন্তু বর্তমান যুগে নরেরা দিব্বি মাথায় হ্যাট, গলায় নেকটাই, পায়ে মোজা এবং ফুলপ্যান্ট ও ফুলশার্ট পরে শরীরের কোনো অংশই মেয়েদেরকে দেখাতে চায় না। অপর দিকে নারীকে অন্ধনগ্না অবস্থায় সাথে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নারীদের পোশাক দেখে মনে হচ্ছে, তারা জাঙ্গিয়া ও বেসীয়ার পরে বেড়াতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। আর সেই কারণে বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশে মেয়েদের কদর কমে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহর রাসূল (দঃ) মেয়েদেরকে কিমতি (দামী) জিনিস বলে উল্লেখ করেছেন। একটু বিবেচনা করলে বুঝতে পারবেন। কেউ দামি জিনিষকে যেখানে সেখানে উন্মুক্ত করে ফেলে রাখে না। ফেলে রাখলে তার কি অবস্থা হবে তা সকলেই জানে। ভালো জিনিস দেখলে কার না লোভ হবে। যেই সুযোগ পাবে সেই হাত বাড়াবার চেষ্টা করবে। ফলে নানা রকম অশান্তির সৃষ্টি হবে। নারী স্বাধীনতার নাম করে মেয়েরা যে সর্বক্ষেত্রে পর্দা না মেনে যত্রতত্র অবাধ বিচরণ করছে, তার ফলাফল যে কত বিষময়, তা তো অহরহ গ্রামে গঞ্জে ও শহরে এবং খবরের কাগজে দেখতে পাচ্ছি। আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আপনারা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখুন। আব্বা চুপ করে গেলে ওঁরা কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না। শেষে রেয়ারা চা নাস্তা নিয়ে এলে সকলে সেদিকে মনোযোগ দিল। দেখিস, সেই ঘরের ছেলে সেলিম, বুঝে সুঝে পা বাড়াস।

লাইলী বলল, যেদিন জানতে পারলাম ওরা বড়লোক, সেদিন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ওকে ভুলে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারিনি। গতকাল সেলিম লাইব্রেরী থেকে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

তার অবস্থা কি রকম দেখলি ?

আমার তো মনে হল সেও আমাকে খুব ভালবাসে। তারপর সেই প্রথম দিনের ঘটনা থেকে গতকাল পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে সব খুলে বলল।

যা বললি তা যদি সত্যি হয়, তা হলে ভালই। কিন্তু জেনে রাখ, বড়লোকের ছেলেরা নারীদেরকে খেলার সামগ্রী মনে করে। দু'দিন খেলা করে তারপর ভালো না লাগলে আবার নুতনের পিছনে ছুটে। এমনি তো পুরষেরা ভ্রমরের জাত। বিভিন্ন ফুলের মধু খেতে ভালবাসে।

তা হলে তোর তিনিওতো বিলেতে বিভিন্ন ফুলের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছেন ? তুই তো আর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিস না।

তোর কথাকে মিথ্যা বলতে পারছি না। তবে একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন ? যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা তাঁর আইন অমান্য করে না। খালেদ ভাইয়ের প্রতি আমার এইটাই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর আইন মেনে চলে। এর বেশি আমি বলতে পারছি না। ঘণ্টার আওয়াজ শুনে বলল, চল, ক্লাস আরম্ভ হয়ে যাবে। তারপর দু'জনে এক সাথে ক্লাসরুমে ঢুকল।

আজ তিন দিন খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। লাইলী ভার্সিটি যেতে পারেনি। দুপুরে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল। রহিমা ভাবি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পর্দা ফাঁক করে বলল, "মে আই কাম ইন সিস্টার ?"

লাইলী না তাকিয়ে বলল, "নো, নট নাউ।"

রহিমা ভাবি ঢুকে পড়ে খাটে লাইলীর পাশে বসে বলল, কি ভাই, কিছু দিন যাবত আমাকে এড়িয়ে চলছ, জানি না কি অপরাধ করেছি। আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলছ না। মনে হচ্ছে তোমার কিছু একটা হয়েছে।

লাইলী বলল, তোমাকে আসতে নিষেধ করলাম না

কখন করলে ইংরেজীতে দু'টো নো মানে হ্যাঁ, তাই তোমার নো নট শুনে হ্যাঁ মনে করে চলে এলাম। আর নিষেধ করেছ তো কি হয়েছে ? এখানে তো আর নন্দাই নেই যে, কোনো অশোভন দৃশ্য দেখতে পাব।

ভাবি ভালো হবে না বলছি বলে লাইলী উঠে বসে কিল দেখাল।

কিল দেখাও আর যাই দেখাও, কথাটা শুনতে খুব ভালো লাগল তাই না কথা শেষ করে পালাতে গেল।

লাইলী তার আঁচল ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, হঠাৎ এসময়ে কি মনে করে ?

রহিমা আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে বলল, ভয়ে ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব ?

আজে বাজে কথা না হলে নির্ভয়ে বলতে পার।

এই বৃষ্টির দিনে ঘুম আসছিল না। ভাবলাম, ননদিনীর মনের খবর একটু নিয়ে আসি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি যদি ছেলে হতাম, তবে যেমন করে হোক তোমাকে বিয়ে করতামই করতাম। আল্লাহপাক এতরূপ তোমাকে দিয়েছে কি বলব ভাই, আমি মেয়ে মানুষ হয়েও তোমাকে দেখে তৃপ্তি মিটে না। তোমার নাগর যে কি করবে ভেবে কূল পাইনে।

নিজের রূপের প্রশংসা শুনে লজ্জা পেয়ে লাইলী বলল, পুরুষ যখন আল্লাহ তোমাকে করেনি তখন আর আফশোস করে লাভ নেই। তারপর একটু রাগতস্বরে বলল, তুমি কি আর অন্য কথা খুজে পেলে না। যতসব বেহায়াপনা কথা। যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর কোনো কথা বলব না বলে মুখ গোমড়া করে অন্য দিকে ঘুরে বসল।

রহিমা তার চিবুক ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আহা দুঃখিনীর মান ভাঙ্গাবার কেউ নেই গো। এমনভাবে কথাটা বলল, দু'জনেই জোরে হেসে উঠল। তারপর রহিমা জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা সখি, সেলিম সাহেবের খবর কি ?

ভালো, উনি দিব্বি ক্লাস করছেন, তার প্রিয়তমাকে নিয়ে বলে জিব কেটে চুপ করে গেল।

কি হল থেমে গেলে কেন। সেলিম সাহেবের প্রিয়তমাকে তুমি চেন নাকি ?

লাইলী লজ্জারাঙা চোখে বলল, আমি কি করে জানব তার প্রিয়তমা কে।

তুমি তো নিজেই বলতে গিয়ে চুপ করে গেলে। আর এদিকে তোমার ভাইয়া বলছিল, ওর একজন কলিগ ওকে একটা শিক্ষিতা, সুন্দরী ও পর্দানশীন খানদানি ঘরের মেয়ে দেখতে বলেছেন। কোনো দাবিদাবা নেই। ছেলেটা নাকি খুব ধার্মিক। শুনে আমার তো মনে হয়েছে তোমার সঙ্গে ভালো মানাবে। খালুজানের সঙ্গেও তোমার ভাইয়া ঐ ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা বলেছে।

লাইলী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাবিকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রহিমা এতটা আশা করেনি। বলল, আরে কর কি ? কাঁদছ কেন ? কি হয়েছে ব্যাপারটা খুলেই বল না। আমি তো তোমার শত্রু নই।

লাইলী তাকে ছেড়ে দিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবেসে ফেলেছি। কিন্তু.....

কিন্তু কি, বল না।

কিন্তু ওরা খুব বড়লোক। ওদের কাছে ধর্মের কোনো নাম গন্ধ নেই। তাই খুব

ভয় হয়।

তুমি শিক্ষিতা মেয়ে। তার কাছে যা নেই তা দিয়ে ভরিয়ে দাও। আল্লাহ ও রাসূলের (দঃ) তাই-ই হুকুম। তোমার কাছে যে জ্ঞানের আলো আছে তা দান করে অন্যের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে দাও। তা যদি পার, তা হলে তোমাদের দু'জনের মধ্যে আর কোনো বাধা বা ভয় থাকবে না।

তুমি ঠিক বলেছ ভাবি, আমি তাই চেষ্টা করব, তুমি দোয়া কর।

রহিমা মৃদু হেসে বলল, তোমার জন্য সব কিছু করব নিশ্চয়, কিন্তু পুরস্কার দেবে তো ? লাইলী ও মৃদু হেসে জবাব দিল, আগে কাজ পরে মজুরী, তারপর পুরস্কার। আব দিল্লী বহুৎ দূর হ্যায়।

ঠিক আছে দিল্লী দূরে না কাছে সে দেখা যাবে, তোমার ভাইয়ার ফিরবার সময় হয়ে গেছে। এখন যাই বলে রহিমা নীচে চলে গেল।

লাইলী হাতের বইটা নিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু লেখার পরিবর্তে মনের পর্দায় সেলিমের ছবি ভেসে উঠতে তন্ময় হয়ে তার কথা চিন্তা করতে লাগল।

রহিমা নিজের রুমে এসে লাইলীর কথা ভাবছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে জলিল সাহেব অফিস থেকে ফিরলেন। সালাম বিনিময়ের পর রহিমা স্বামীর জামা-কাপড় আলনায় রেখে লুংগী এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও, আমি নাস্তা নিয়ে আসি। এদিকে সাদেক ও ফিরোজা ঘুম থেকে উঠে পড়ছে। সকলে মিলে আগে আসরের নামায পড়ল। সাদেক এই বয়স থেকেই নিয়মিত নামায পড়ে। চার বছরের মেয়ে ফিরোজাও মায়ের সঙ্গে শুরু করে দেয়।

নাস্তা খাওয়ার সময় রহিমা বলল, তুমি যে লাইলীর জন্য তোমার কলিগকে পছন্দ করেছ, এদিকে তোমার বোন তো আর একজনকে মন দিয়ে বসে আছে।

জলিল সাহেব স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বোঝার চেষ্টা করে সফল হতে না পেরে বলল, ব্যাপারটা খুলে বল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

এতে না বোঝার কি আছে ? সেদিন সেলিম নামে যে ছেলেটাকে দাওয়াত করে খাওয়ানো হলো, সে তো লাইলীর জান ও ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে। তার অনেক আগেও নাকি কি একটা ঘটনায় দুজন দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেষে ঐ দুর্ঘটনার মাধ্যমে তা দৃঢ় হয়। এই তো কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলছিলাম। আমার কাছে তোমার কলিগের কথা শুনে আমাকে সব খুলে বলেছে। স্বামীকে চুপ করে নাস্তা খেতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কিছু বলছ না যে ?

কি বলব বল ? সবই তকদিরের খেলা। যার সঙ্গে যার জোড়া আল্লাহপাক রেখেছেন, তার সঙ্গে হবেই। সেখানে আমরা হস্তক্ষেপ করে শুধু হয়রানিই হব। যা ঘটবার ঘটবেই। তবে সেলিমদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। আজকাল বড়লোকের ছেলেদের চেনা বড় মুস্কিল।

রেইনী ভ্যাকেসানের জন্য ভার্সিটি দেড়মাস বন্ধ। একটানা কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ার পর আজ সকাল থেকে সোনালী রোদে চারদিক ঝলমল করছে। সোনালী রোদের সংগে লাইলীর মনটাও রঙিন হয়ে উঠল। পড়াশুনায় মন বসাতে পারল না। পনের দিন সেলিমকে দেখেনি। তার মনে হল যেন পনের বছর। কিছুক্ষণ মায়ের কাছে গিয়ে নাস্তা বানাল। তারপর নাস্তা খেয়ে রহিমা ভাবির ঘরে ঢুকল।

জলিল সাহেব একটু আগে অফিসে চলে গেছেন। রহিমা ফিরোজাকে সংগে করে নাস্তা খাচ্ছিল। সাদেক নাস্তা খেয়ে আব্বার সংগে স্কুলে গেছে। লাইলীকে দেখতে পেয়ে বলল, আরে সাত সকালে ননদিনী পড়া ছেড়ে এসেছে দেখছি। এস এস, আমার

সঙ্গে একটু নাস্তা খেয়ে নাও।

লাইলী বলল, তুমি খাও, আমি এক্ষুণি খেয়ে এলাম।

বলি ব্যাপার কি ? মনের মানুষকে কয়েকদিন দেখতে পাওনি বলে মনটা বুঝি ছটপট করছে ?

দেখ ভাবি, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। চোরের মনতো বোঁচকার দিকে থাকবেই।

আরে ভাই অত চটছো কেন ? আমার তো আর ফাঁকা মন নেই যে, বোঁচকার দিকে থাকবে। এই কথা বলে তুমি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছ, তোমার মন সেলিম সাহেবকে খুঁজছে।

সেলিমের নাম শুনে লাইলী চুপ হয়ে গেল।

ওমা, সেলিম সাহেবের নাম শুনে একেবারে চুপ করে গেলে যে ? বলি ব্যাপারটা যদি গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছে থাকে, তা হলে বল, তোমার ভাইয়াকে বলে শুভশ্য শীঘ্রম করার ব্যবস্থা করি।

তুমি থামবে, না আমি চলে যেতে বাধ্য হব ? পড়তে ভালো লাগছিল না বলে ওনার কাছে একটু গল্প করতে এলাম, আর উনি কিনা আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচেন।

ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে, আমারই ভুল হয়েছে। তোমাকে তাড়াতে যাব কেন ? তুমি গল্প বল, আমি এই চুপ করলাম। তারপর নাস্তার পর্ব শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে এসে রহিমা একটা চেয়ার টেনে লাইলীর কাছে গম্ভীর হয়ে বসল।

লাইলী অভিমানভরা কণ্ঠে বলল, কেউ গোমড়া মুখ করে বোবার মত থাকলে তার সঙ্গে গল্প করা যায় বুঝি ?

রহিমা হেসে ফেলে বলল, তুমি বড় ডেঞ্জারাস মেয়ে। কথা বললেও দোষ, আর না বললেও দোষ। কি করব তা হলে তুমিই বলে দাও।

লাইলী এই কথার উত্তর খুজে না পেয়ে চুপ করে বসে রইল। ঠিক এমন সময় কলিং বেলটা বিরতি নিয়ে দু'বার বেজে উঠল। কলিং বেল বাজাবার মধ্যেও যেন আভিজাত্য রয়েছে। প্রথমে দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর লাইলী ওঠে গেট খোলার জন্য গেল। দরজার ছিদ্র দিয়ে সেলিমকে দেখে তার মনে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। দরজার এই ছিদ্রটা ভিতরের দিকে একখণ্ড কাঠ দিয়ে ঢাকা থাকে। যখন মেয়েদের গেট খুলতে হয় তখন প্রথমে তারা এই কাঠ সরিয়ে ছিদ্র দিয়ে আগন্তুককে দেখে নেয়। সে যদি চেনা লোক হয়, তবে গেট খুলে দেয়, নচেৎ তাকে পরে আসতে বলে।

লাইলী কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল, তারপর গায়ে মাথায় ভালো করে কাপড় দিয়ে গেট খুলে দিল।

সেলিম লাইলীকে দেখে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

লাইলী বলল, ভিতরে আসুন। কেমন আছেন ? সেলিমের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে দরজার কড়া নেড়ে বলল, এই যে মশায় শুনছেন, এখানে এভাবে দাড়িয়ে থাকবেন না। প্লীজ ভিতরে আসুন। লোকে দেখলে কি ভাববে বলুন তো ? তা ছাড়া ভাবি জানালা দিয়ে সবকিছু দেখছে।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দে সেলিম বাস্তবে ফিরে এল। লাইলীর কথাগুলো শুনে চুপচাপ তার সংগে ড্রইংরুমে এসে বসল।

সেলিমকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে লাইলী বলল, কি ব্যাপার ? কোনো কথা বলছেন না কেন ?

সেলিম বলল, কি আর বলব বল ? তুমি যেভাবে আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছ, তাতে করে না এসে পারলাম না। এই কদিন কিভাবে যে কেটেছে তা ভাষায় প্রকাশ

করতে পারব ন্যা এভাবে এ সময়ে তোমাদের এখানে আসা ঠিক নয় জেনেও চলে এলাম। লোকনিন্দা আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারে নি। আচ্ছা, তোমার মনে কি কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি ?

লাইলী এতক্ষণ তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল। দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে বলল, সে খবর আমার অন্তর্যামী জানেন। আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি। তারপর দরজার বাইরে এসে রহিমা ভাবিকে দেখে লজ্জা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দু'জনের কথা শুনছিল। বলল, কথায় বলে, যে যাকে ধায় তাকে সে পায়। কথাটা এতদিন শুনে এসেছি, আজ প্রত্যক্ষ করলাম। তা যাচ্ছ কোথায় ? কি দিয়ে আপ্যায়ন করাবে শুনি ?

লাইলী প্রথমে লজ্জায় কথা বলতে পারল না। তারপর বলল, তুমিই বল না ভাবি।

বারে তোমার প্রিয়তমকে কি খাওয়াবে, সে কথা আমি কি করে বলব ? বাজারে যাওয়ার তো কোনো লোক নেই। তোমার স্টকে যদি কিছু না থাকে, তবে আমার কাছ থেকে ধার নিতে পার।

তার দরকার নেই বলে লাইলী উপরে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, জান আম্মা, ভার্সিটির সেই ছেলেটা এসেছে।

হামিদা বানু বললেন, কোথায় বসিয়েছিস তাকে ?

নিচে ড্রইংরুমে, তুমি একটু চা কর না আম্মা।

হ্যাঁরে, অত বড়লোকের ছেলেকে শুধু চা দিবি ?

আমরাতো আর বড়লোক নই, গরিব জেনেই এসেছেন। একটা ডিম সিদ্ধ করে আলমারী থেকে কয়েকটা বিস্কুট প্লেটে নিয়ে চায়ের কাপসহ এসে ঘরে ঢুকল। সেগুলো টেবিলের উপর রেখে একগ্লাস পানি নিয়ে এসে বলল, অনেকক্ষণ একা একা বসিয়ে রাখলাম, সে জন্য ক্ষমা চাইছি।

সেলিম বলল, এসবের কিছু দরকার ছিল না। তুমি তো আমার কথা না শুনে চলে গেলে। একটা কথা বলব, শুনবে ? আমার সঙ্গে একটু বাইরে যাবে ?

লাইলী কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, আগে এগুলো খেয়ে নিন।

তোমার চা কোথায় ?

আমি একটু আগে খেয়েছি।

সেলিম ডিমটা খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আমার কথার উত্তর দিলে না যে ?

আপনার সাথে যাব, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু বলে লাইলী চুপ করে মেঝের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু আবার কি ? তোমার কোনো কিন্তু আমি শুনব না।

দেখুন, আপনার সঙ্গে যেতে আমি মনেপ্রাণে চাই। কিন্তু আল্লাহপাক যুবক-যুবতীকে এভাবে যেতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (দঃ) পবিত্র হাদিসে বলেছেন-"যদি কোনো লোক কোনো স্ত্রীলোকের সহিত নির্জনে থাকে, তাহাদের মধ্যে তৃতীয়জন থাকে শয়তান।"[১] 'আল্লাহপাক সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। অতএব সেই সৃষ্টির সেরা মানুষের উচিত স্রষ্টার হুকুম মেনে চলা।

সেলিম লাইলীর মুখের দিয়ে চেয়ে তার কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করে বলল, তোমার কথা হয়তো ঠিক ; কিন্তু আমরা ছেলে মানুষ। একটু আধটু অন্যায় করলে তা তিনি নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। শুনেছি, তিনি অসীম ক্ষমাশীল ও করুণাময়। বাবা-মা

---

(১) বর্ণায় ঃ হযরত উমর (রাঃ)-তিরমিজী।

সেই গুণের কিঞ্চিতের বঞ্চিত পেয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের কত রকম অন্যায় ক্ষমা করে দেয়।

আপনি ঠিক বলেছেন, কিন্তু ছেলেমেয়েরা বড় ও শিক্ষিত হয়ে যদি পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করে তখন তো ক্ষমার কোনো প্রশ্নই উঠে না। আর ওঁরা ক্ষমা করলেও নিজেদের বিবেকের কাছে চিরকাল অপরাধী হয়ে থাকে। এখন আপনিই বলুন, আমরা শিশু, না শিক্ষিত যুবক-যুবতী ? আমরা জ্ঞানী হয়ে যদি অন্যায় করি, তবে কী তিনি বিনা শাস্তিতে তা ক্ষমা করবেন ?

সেলিম বলল, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে গেলে আল্লাহ যত শাস্তি দেন না কেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

লাইলী বলল, শাস্তি অবশ্য দু'জনেরই হবে। আমার হয় হোক কিন্তু আমার জন্য আপনি পাবেন, তা আমি হতে দিতে পারি না।

আচ্ছা, তোমরা কি কোনো কাজ আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের বাইরে কর না ?

আল্লাহপাকের প্রিয় বান্দারা তা করে থাকেন। আমরা তাদের পায়ের ধুলোর যোগ্যও নই। তবে যতটা পারি মেনে চলার চেষ্টা করি।

তোমার কাছ থেকে আজ অনেক জ্ঞান পেলাম। আমাদের সোসাইটির অনেক মেয়ের সঙ্গে বেড়িয়েছি। সত্যি বলতে কি, তাদের সঙ্গে বেড়িয়ে মনে শান্তি পাইনি। কোথায় যেন খচ খচ করে বিঁধতো। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে মনের সেই খচখচানিটা আর নেই। মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে এই সেই মেয়ে, যাকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ। তোমার সংগে বেড়িয়ে যে আনন্দ পেতাম, এখন মনে হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি শান্তি পেলাম। পড়তে ভালো লাগছিল না। তোমার কথা মনে হতে ভাবলাম, তোমাকে নিয়ে একটু বেড়ালে মনটা ফ্রেশ হয়ে যাবে। তাই এসেছি। তোমারও তো সামনে পরীক্ষা। অনেক সময় নষ্ট করলাম এখন চলি তা হলে।

সেলিম চলে যেতে উদ্যত হলে লাইলী বলল, যাবেন না, বসুন। আমার যতই পড়ার ক্ষতি হোক, আমি কিছু মনে করব না। আপনি তাড়াতাড়ি চলে গেলে বরং আমি মনে খুব কষ্ট পাব। আর পড়াশুনাও একদম করতে পারব না। আর একটু অপেক্ষা করুন। আমি এক্ষুণি আসছি বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে ভাবির ঘরে গেল।

রহিমা বলল, তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। তুমি যে কি করে সেলিম সাহেবের আমন্ত্রণ ডিনাই করতে পারলে ভেবে পাচ্ছি না ? আমি হলে তা বর্তে যেতাম। কি চিন্তা করলে ? যাবে নাকি ?

তুমিই বল না ভাবি ? আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না।

ওমা, আমি কি বলব ? তুমি আমার চেয়ে কত জ্ঞানী ? তবে আমার মতে, যার মধ্যে সবকিছু বিলীন করে দিয়েছ এবং যাকে স্বামী বলে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছ, তার সন্তুষ্টির জন্য একটু বেড়াতে গেলে পাপ হবে না। আর যদি তা হয়, আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাইলে নিশ্চয় ক্ষমা করে দেবেন।

লাইলী আর কিছু না বলে নিজের রুমে গিয়ে একটা নীল রং-এর শাড়ী ও ব্লাউজের উপর বোরখা পরল। তারপর মায়ের কাছে গিয়ে বলল, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

হামিদা বানু মেয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সেলিম চলে গেছে ?

না আমি তো তারই সঙ্গে যাচ্ছি।

হামিদা বানু অবাক হয়ে রাগের সঙ্গে বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি।

লাইলী নীচে এসে সেলিমকে বলল, চলুন।

সেলিম প্রথমে বেশ অবাক হলেও পরক্ষণে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল। ষ্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে ?

আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন ?

তুমি কিন্তু এখনও আপনি করেই বলছ। সেদিনের কথা নিশ্চয় মনে আছে, আমাকে আগে যেতে বলে তুমি পিছু নেবে বলেছিলে ?

মনে ঠিক আছে তবে কি জানেন.....

সেলিম তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আবার বলে তার ডান হাতটা ধরে তালুতে চুমো খেয়ে বলল, এরপর থেকে যদি ঐভাবে কথা বল, তা হলে আমি মনে কষ্ট পাব।

লাইলী কেঁপে উঠল। তারপর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চুমো খাওয়া হাতটা নিজের ঠোঁটে চেপে ধরল।

সেলিম আড়চোখে তা লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, কি কথা বলছ না কেন ?

এবার থেকে চেষ্টা করব।

আর একটা কথা, তুমি যতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ মুখটা খোলা রাখবে।

লাইলী মুখের নেকাবটা সরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ শহরের নানান রাস্তা ঘুরে একটা হোটেলের সামনে গাড়ি পার্ক করে সেলিম বলল, খিদে পেয়েছে কিছু খাওয়া যাক চল। ভিতরে নিয়ে গিয়ে কেবিনে বসে জিজ্ঞেস করল, কি খেতে মন চাচ্ছে বল ?

আমি এখন কিছু খাব না, তুমি খাও।

তোমাকে কিছু খেতেই হবে বলে বেয়ারাকে ডেকে লুচি, মুরগীর মাংস ও মিষ্টির অর্ডার দিল। শেষে দুটো কোক খেয়ে গাড়িতে উঠে সেলিম বলল, আমাদের বাড়িতে যাবে ? মা তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে।

লাইলী বলল, চল, খালা আম্মার সঙ্গে দেখা করে আসব।

যদি বলি আর আসতে দেব না, চিরদিন বন্দী করে রাখব।

লাইলী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে বলল, তোমার বিবেক যদি তাই বলে, তা হলে আমার আপত্তি নেই।

সেলিম তাদের বাড়িতে এসে গাড়ি থামাতে লাইলী বলল, কাদের বাড়িতে নিয়ে এলে ?

কেন ভয় লাগছে বুঝি ? বাড়িটা চিনতে পারলে না ? ভিতরে চল, বাড়ির লোকদের নিশ্চয় চিনতে পারবে ?

রুবীনা হলরুমে বসে দু'জন বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছিল। এই হলরুমটাই ড্রইংরুম। এখান থেকে ভিতরে যাওয়ার রাস্তা। দাদার সাথে লাইলীকে দেখে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন ?

লাইলী সালাম দিয়ে বলল, ভালো আছি।

সেলিম রুবীনাকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে মা কোথায় ?

মা উপরে আছে বলে লাইলীর হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলল, আমার বান্ধবী জেসমীন ও সামসুন্নাহার। আর ওদের বলল, ইনি লাইলী, ভার্সিটিতে পড়ে।

সেলিম বলল, তোমরা গল্প কর আমি আসছি।

সোহানা বেগম নিচে আসছিলেন। ছেলের গলার আওয়াজ পেয়ে সেখানে এসে বললেন, সেই সকালে যে নাস্তা না খেয়ে বেরিয়ে গেলি, খিদে পাইনি ? তারপর লাইলীকে দেখতে পেয়ে বললেন, মা মণিকে কোথা থেকে ধরে আনলি রে ?

লাইলী উঠে গিয়ে সোহানা বেগমকে কদমবুসি করে বলল, কেমন আছেন

খালা আম্মা ?

সোহানা বেগম মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, বেঁচে থাক মা, ভালো আছি। তোমার বাবা মা ভালো আছেন।

জ্বি ভালো আছেন।

সেলিম তা হলে তোমাদের বাসায় গিয়েছিল ?

লাইলী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

সেলিম বলল, জান মা, আমি ওদের বাড়িতে গিয়ে যখন বললাম, চল একটু বেড়াতে যাই তখন কত হাদিস কালাম শুনিয়ে দিল। শেষে কি জানি কি মনে করে আবার চলে এল।

সোহানা বেগম লাইলীকে বললেন, তুমি এখন আর যেতে পারবে না। আজ রুবীনার জন্মদিন পালন করা হবে। ওর অনেক বন্ধু-বান্ধবী ও আত্মীয়-স্বজন আসবে, একেবারে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবে। আমি ড্রাইভারকে দিয়ে তোমাদের বাসায় খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রুবীনা সেলিমের কাছে এসে তার হাতে একটা লিষ্ট দিয়ে বলল, এগুলো তাড়াতাড়ি কিনে আন।

এক্ষুণি যাচ্ছি বলে সেলিম গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সোহানা বেগম লাইলীকে ঘরে নিয়ে এসে বোরখা খুলে ফেলতে বললেন।

আয়াকে নাস্তার অর্ডার দিতে শুনে লাইলী বলল, আমি এক্ষুণি খেয়ে এসেছি, কিছু খেতে পারব না।

সোহানা বেগম বললেন, তা হোক, তবু দু'টো মিষ্টি খাও।

নাস্তা খেয়ে লাইলী রুবীনাদের কাছে এসে বসল। ততক্ষণ আরও দুতিনজন তার সমবয়সী মেয়ে এসেছে। তারা সব বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু লাইলীর রুপ তাদেরকে ম্লান করে দিল।

এমন সময় রেহানা এসে রুবীনার পাশে সাধারণ পোশাকে লাইলীকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কে রে রুবীনা ?

রুবীনা বলল, ইনি লাইলী, ভার্সিটির ছাত্রী। দাদার সঙ্গে এসেছে।

রেহানা এবার লাইলীকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিসে পড়েন ?

ইসলামিক হিষ্ট্রীতে অনার্স।

রেহানা কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে রুবীনাকে বলল, তোর দাদা কোথায় ?

এইতো কয়েক মিনিট আগে মার্কেটে গেল, তোমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়নি ?

কোনো কিছু না বলে রেহানা ফিরে চলে গেল।

বিকেলে রুবীনার ও সেলিমের অনেক বন্ধু ও বান্ধবী এল। যখন সবাই মিলে চা খাচ্ছিল তখন রেহানা তার বান্ধবী সালমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। সালমাকে সেলিম চিনে। ভার্সিটিতে একদিন যেঁচে তার সঙ্গে আলাপ করতে এসে সুবিধে করতে না পেরে আর মিশবার চেষ্টা করেনি। তাকে আজ রেহানার সংগে দেখে সেলিম জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন ?

ভালো আছি বলে সালমা চুপ করে রইল। সেও বড়লোকের মেয়ে।

রেহানা চা খেতে খেতে সেলিমকে বলল, সালমাকে নিয়ে আজ আমি তোমার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলব, দেখি হারাতে পারি কি না ? সালমা খুব ভালো খেলে। যারা এসেছে তারা সবাই বড়লোকের ছেলেমেয়ে। মেয়েরা কেউ সালওয়ার কামিজ, কেউ শাড়ী, আবার কেউ ফুলপ্যান্টের উপর পাঞ্জাবী পরে এসেছে। তাদের পায়ে ডিস্কো ও পেন্সিল হীল

জুতো। সেলিম মৃদু হেসে বন্ধু রেজাউলকে জুটি করে খেলতে নামল।

রেহানা স্যাণ্ডো ব্রাউজ ও শাড়ী পরেছে। সে শাড়ীটা ভালভাবে সেঁটে নিল। আর সালমা টাইটফিট সালওয়ার কামিজ পরেছে। সরু ওড়নাটা বুকের মাঝখান দিয়ে এঁটে পিছনের দিকে বেঁধে নিল। তাদের ভরাট যৌবন পুষ্ট শরীর খেলার ছন্দে উত্তাল তরঙ্গের মত ঢেউ খেলতে লাগল। ছেলেদের মধ্যে অনেকে খেলা দেখা বাদ দিয়ে তাদের দু'জনের যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ দেখতে লাগল।

এতক্ষণ লাইলী ঘরের ভিতরে সোহানা বেগমের কাছে ছিল। খেলা শুরু হতে তিনি বললেন, যাও না মা, ওদের খেলা দেখ গিয়ে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও লাইলী এক পা দু'পা করে বারান্দায় গিয়ে দু'টি মেয়েকে দু'টো ছেলের ঐভাবে খেলতে দেখে লজ্জা পেয়ে সরে এসে একটা চেয়ারে বসে রইল।

রেহানা ও সালমা দু'জনেই পটু। তার উপর আজ প্রতিজ্ঞা করে নেমেছে, সেলিমকে হারাবেই। সেলিম অপটু রেজাউলকে নিয়ে ওদের বিরুদ্ধে খেলতে হীমসীম খেয়ে যাচ্ছে। হার্ড কনটেষ্ট হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সেলিমরা তিন পয়েন্ট জিতে গেল। তারা সকলে খুব ক্লান্ত হয়ে বারান্দায় ফ্যানের নিচে বিশ্রাম নিতে এসে লাইলীকে দেখে অবাক হয়ে গেল। যারা তাকে এর আগে দেখেনি তারা তাকে অপ্সরী মনে করে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। সামসুনের সঙ্গে লাইলীর ওবেলা পরিচয় হয়েছিল। সে তার কাছে এসে বলল, চলুন আমরাও একটু খেলে আসি।

লাইলী বলল, মাপ করবেন, আমি ওসব খেলা জানি না।

কথাটা সেলিম, রেহানা ও অন্য সবাই শুনতে পেল। একমাত্র লাইলী সাদামাঠা পোশাক পরে শালীনতা বজায় রেখেছে। তাকে এই পোশাকে এদের সকলের চেয়ে সুন্দরী দেখাচ্ছে। সব ছেলে মেয়ে তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল। লাইলীর ওসব খেলা জানি না কথাটা শুনতে পেয়ে সকলে তার দিকে সরাসরি তাকাল।

রেহানা প্রথম থেকে লাইলীর রূপ দেখে হিংসায় জ্বলছিল। তার উপর সেলিমের সঙ্গে ওবেলা এসে এতক্ষণ ঘরেই ছিল বুঝতে পেরে মনে মনে ইর্ষায় ও রাগে গুমরাচ্ছিল। তাকে দেখার আগে পর্যন্ত রেহানার ধারণা ছিল, তার মত সুন্দরী তাদের সোসাইটিতে কেউ নেই। এতদিন সে মনে করত সেলিম তাকে ভালোবাসে, কিন্তু আজ লাইলীকে দেখে তার ধারণা মিথ্যা বলে মনে হল। কেন কি জানি তার ভিতর থেকে কে যেন বলল, এর কাছে তুমি হেরে যাবে। হিংসার বশবর্তী হয়ে তার কথায় খেই ধরে বিদ্রুপ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তা হলে কি খেলা আপনি জানেন ?

লাইলী কয়েক সেকেণ্ড রেহানার দিকে চেয়ে থেকে বলল, আমি কি খেলা জানি না জানি, তা আপনাদের জানা দরকার আছে বলে মনে করি না। তবে আমার মনে হয়, ঐ রকম বিদেশী খেলা আমাদের দেশের মেয়েদের কোনো প্রয়োজন নেই।

সালমা তাড়াতাড়ি কটাক্ষ করে বলে উঠল, তা হলে স্বদেশী কি খেলা আমাদের খেলা উচিত বলে দিলে বাধিত হব।

লাইলী বলল, দেখুন, আমি আপনাদের সমাজের মেয়ে নই। আপনারা কি খেলবেন না খেলবেন, সে বিষয়ে আমি উপদেশ দিতেও আসিনি এবং সে সব সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানও নেই। আপনাদের একজন আমাকে খেলতে ডেকেছেন। তার উত্তরে আমি শুধু বলেছি ওসব খেলতে জানি না। এর মধ্যে যদি আপনারা জেলাস মনোভাব নিয়ে আমাকে আক্রমণ করেন, তা হলে আমি অপরাগ। কারণ আপনাদের সকলের যুক্তির কাছে আমি একা নিরূপায় ? তবে আমার মনে হয়, বড় ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে খেলাধুলা না করে আলাদাভাবে অর্থাৎ ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে আর

মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে খেললে, খেলাধুলার উদ্দেশ্য নিশ্চয় নষ্ট হবে না।

লাইলীর কথা শুনে কেউ কোনো উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে গেল।

সেমীনা ও রোজীনা টেবিল টেনিস খেলা শেষ করে এসে লাইলীর কথা শুনছিল। সেমিনা নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠল, তা হলে আপনি ছেলেদের সঙ্গে ভার্সিটিতে পড়ছেন কেন?

লাইলী স্মীত হাস্যে তার দিকে চেয়ে বলল, নিরুপায় হয়ে। যদি আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য আলাদা ইউনিভার্সিটি থাকতো, তা হলে আমি কো-এডুকেশনে পড়তাম না।

এবার রেহানা জিজ্ঞেস করল, তা না হয় হল, কিন্তু আপনি গার্ল ফ্রেণ্ডের সঙ্গে না বেড়িয়ে বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বেড়ান কেন ?

খোঁটাটা লাইলী ভালভাবে অনুভব করল। কোনো রকম দ্বিরুক্তি না করে জওয়াব দিল, আমার কোনো বয় ফ্রেণ্ড নেই। আর আমি কোনোদিন কোন ছেলের সঙ্গে ঘুরেও বেড়ায়নি ?

রেহানা একটু রাগের সঙ্গে আবার জিজ্ঞেস করল, সেদিন সেলিম ভাই-এর সঙ্গে গাড়িতে করে তা হলে কোথায় গিয়েছিলেন ? আর আজই বা তার সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছেন কেন ? সেই জন্য লোকে বলে, কেউ নিজের দোষ নিজে দেখতে পায় না, শুধু অপরের দোষ দেখতে পায়।

এই কথায় সেলিম ও সোহানা বেগম ছাড়া সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

সোহানা বেগম রহিমের হাতে চা-নাস্তা দিয়ে সঙ্গে এসে তাদের কথা শুনছিলেন। ব্যাপারটা ক্রমশঃ ঝগড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে বললেন, তোমাদের একি ব্যাপার বলতো ? একটা মেয়ে অতিথি হয়ে এ বাড়িতে এসেছে। তাকে তোমরা যা তা প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলছো। তা ছাড়া কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সবাইর সামনে এভাবে প্রশ্ন করা খুবই অন্যায়। এখন ওসব কথা বাদ দিয়ে কে কি খাবে নাও। এরপর কেউ আর কোনো কথা বলতে সাহস করল না। চুপ চাপ কেউ কোকো কোলা, কেউ চা পান করতে লাগল।

সেলিম এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। সবাইকে বোকা বানাবার জন্য বলল, মা, তুমি কিছু বলো না, আমি লাইলীকে রেহানার শেষ প্রশ্নের উত্তরটা দিতে অনুরোধ করছি।

লাইলী কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে রইল, তারপর সেলিমের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, একবার আমি ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম। সেই সময় সেলিম সাহেব ও তার মা আমাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। যদি ওঁরা সেদিন আমাকে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার না করতেন, তা হলে আমি আর ইহজগতে কারও কাছে মুখ দেখাতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হতাম। সেই লোক যদি আমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে থাকে এবং এখানে এনে থাকেন, তা হলে কি করে আমি বাধা দিতে পারি বলুন ? অত অকৃতজ্ঞ হতে বিবেকে বেধেছে। ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন, প্রথমে আমি যেতে এবং আসতে চাইনি। পরে বিবেকের অনুশোচনায় আসতে বাধ্য হয়েছি। এখন আপনারই আমার বিচার করুন। অন্যায় করে থাকলে যে শাস্তি দেবেন মাথা পেতে নেব। কথা শেষ করে লাইলী মাথা নিচু করে বসে রইল। এমন সময় মাগরিবের আযান শুনতে পেয়ে লাইলী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মাপ করবেন, আমি নামায পড়ব। লাইলীর কথা শুনে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আর লাইলী অযু করার জন্য বাথরুমের দিকে চলে গেল।

সামসুন বলল, মেয়েটা একদম সেকেলে। চল, সবাইকে তো আবার আসতে হবে।

বেয়ারা রহিম বলে উঠল, আপনারা যাই বলুন, আপামনি কিন্তু বড় খাঁটি কথা বলেছেন।

সোহানা বেগম ধমকে উঠলেন, নে হয়েছে, তোকে আর লেকচার দিতে হবে না।

মাগরিবের নামায পড়ে লাইলী সোহানা বেগমের কাছে গিয়ে বলল, খালাআম্মা, ড্রাইভারকে দিয়ে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিন।

সোহানা বেগম বললেন, কেন মা, তোমার কী কোন অসুবিধে হচ্ছে ? তোমাকে তো বলেছি, আজ সন্ধ্যার পর রুবীনার বার্থডে উৎসব হবে। ওর অনেক বন্ধু-বান্ধবী আসবে, তুমি ওদের সঙ্গে একটু আনন্দ করবে না ?

লাইলী বলল, আমি অন্য সমাজের মেয়ে। আপনাদের এখানে যারা আসবেন, তারা হয়তো আমাকে পছন্দ করবেন না। তাই ভয় হচ্ছে, আমার জন্যে আপনারা অপমানিত হতে পারেন।

পাগলী মেয়ে, ওসব আজেবাজে চিন্তা করো না। কে কি ভাববে অত চিন্তার কি আছে ? আর তোমার জন্য আমরাই বা অপমান হতে যাব কেন ? তা ছাড়া হঠাৎ যদি তেমন কিছু ঘটেও যায়, তা হলে তুমি তোমার জ্ঞানের দ্বারা তা কভার দিতে পারবে বলে আমি মনে করি। ঐসব চিন্তা বাদ দিয়ে তুমি রুবীনার কাছে যাও মা।

রুবীনা ছোট বলে মা ও ভাই এর খুব আদর পায়। সে খুব আলট্রা মর্ডান। সব সময় নিত্য নূতন পোশাক পরে নিজেকে বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে বলে জাহির করে এবং রূপের আগুনে ছেলেদের আকর্ষণ করে বেড়ানকে গর্ব বলে মনে করে। ছাত্রী হিসাবে মোটামুটি ভালো। তবে রূপ চর্চার চেয়ে যদি পড়াশোনায় মন দিত, তা হলে অনেক ভালো রেজাল্ট করতে পারত। তবু এখনও তরুণীর শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ যৌবন ছুঁইছুঁই করছে। সব সময় স্কুলের ও পাড়ার দু' একজন বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে সময় কাটায়। তাদের মধ্যে করিম নামে বড়লোকের একটা ছেলের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে শুরু করেছে। অবশ্য এই ব্যাপারটা তার মা অথবা ভাই কেউ জানে না।

রুবীনা প্রথম থেকে লাইলীকে ভালো চোখে দেখতে পারেনি। সেটা লাইলী কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে। তাই সোহানা বেগম যখন লাইলীকে তার কাছে যেতে বললেন তখন তার মন তাতে সায় দিল না। সে ধীরে ধীরে বাইরে এসে ফুল বাগানের দিকে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে বিকেলের কথাগুলো ভাবতে লাগল।

এর মধ্যে দু'একজন করে আসতে শুরু করেছে। অনেকের বাবা-মা ও আসছেন। রুবীনা ছেলে মেয়েদের আর সেলিম বড়দের অভ্যর্থনা করতে লাগল। রাত্রি আটটায়ে কেক কাটা দিয়ে উৎসব শুরু হল। নাস্তার পর চা, কফি, কোকো, ফান্টা ও সেভেন আপ যার যার ইচ্ছামত পরিবেশন করা হল। অনেকে রুবীনাকে কিছু গাইবার জন্য অনুরোধ করল। সে একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত ও একটা আধুনিক গান গাইল। তার গান শুনে সকলে খুশি হয়ে হাততালি দিল। হঠাৎ রেহানা দাঁড়িয়ে বলল, এবার সেলিম ভাই আপনাদের একটা গান শুনাবে। তারপর লাইলীকে গাওয়ার জন্য সকলের তরফ থেকে আমি প্রস্তাব দিচ্ছি।

কথাটা শুনে লাইলী চমকে উঠল। জীবনে সে কোনোদিন গান বাজনা করে নি। এখন সে কি করবে ভাবতে লাগল।

সেলিম একটা আধুনিক গান গাইল। তার গলা খুব ভালো। সেলিমের গান শুনে সকলে মোহিত হয়ে গেল। লাইলী চিন্তার মধ্যে থাকলেও সেলিমের গলা শুনে খুব আশ্চর্য হল। সেলিম এত ভালো গান গাইতে পারে এটা যেন তার কল্পনার বাইরে।

হাত তালিতে ঘর গম গম করে উঠল। এখন লাইলী আবার চিন্তিত হয়ে পড়ল।

সেলিম লাইলীর সব কিছু লক্ষ্য করছিল। হাত তালি থামিয়ে দিয়ে সে বলল, এবার রেহানা আমাদের পিয়ানো বাজিয়ে শোনাবে।

সালমা বলে উঠল, কিন্তু এবার তো লাইলীবানুর পালা।

সেলিম বলল, ঠিক আছে, রেহানা আগে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাক।

রেহানা অনেক কষ্টে রাগটা সামলে নিয়ে নিজেকে সংযত করে পিয়ানো বাজাল। অদ্ভুত সে বাজনা। তার পিয়ানো বাজনা শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। লাইলীর মনে হল, সেলিমের গলার থেকে বাজনাটা আরো অনেক শ্রুতিমধুর। সে মনে মনে রেহানাকে ধন্যবাদ জানাল। রেহানা পিয়ানো বাজিয়ে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়াল। শেষে রেহানা লাইলীর কাছে গিয়ে তার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে সকলের দিকে চেয়ে বলল, এনাকে আপনারা অনেকে চেনেন না। ইনি আমাদের কাছে আজ নূতন অতিথি। ইসলামিক হিষ্ট্রির অনার্সের ছাত্রী। আশা করি, কিছু শুনিয়ে আমাদের সকলকে আনন্দ দান করবেন। রেহানা কথা শেষ করে চেয়ারে গিয়ে বসে ভাবল, মনের মত অপমান করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি।

এদিকে লাইলী লজ্জায় ও অপমানে ঘামতে শুরু করল। আল্লাহপাকের কাছে মনে মনে সাহায্য চাইতে লাগল। কিছুক্ষণ মেঝের দিকে চেয়ে থেকে নিজেকে সামলে নিল। সে শাড়ীর উপর খাড়ু গাঁটের নিচ পর্যন্ত কামিজের মত সাদা বোরখা পরেছে আর মাথা ও বুক অন্য একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে শুধু মুখটা খোলা রেখেছে। এখন শুধু তার হাতের দুই কব্জী ও চুলের নিচ থেকে মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে।

সে যখন রেহানার পাশে দাঁড়াল তখন সকলে তার দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এত রূপসী মেয়ে তারা এর আগে কখনও দেখেনি। সকলে নিস্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ছেলেরা মনে করল, যে মেয়ের এতরূপ, তার গলার স্বর না জানি কত মিষ্টি। সকলে শুধু এক পলক তার মুখ দেখেছে। কারণ সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তাকে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেলিম ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিজেকে অপরাধী মনে করল। সে তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

এমন সময় লাইলী এগিয়ে গিয়ে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে সকলের দিকে চেয়ে আসসালামু আলাইকুম বলল। সেলিম আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ সালামের উত্তর দিল না। লাইলী সেটা গ্রাহ্য না করে বলল, দেখুন, আমি স্বইচ্ছায় আপনাদের এই ফাংসানে আসিনি, দৈবচক্রে এসে পড়েছি। এই সমাজের রীতিনীতি সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। আর আমি গান বাজনাও জানি না। আপনাদেরকে আনন্দ দেওয়ার মত কোনো বিদ্যা আমার জানা নেই। তবে যদি অনুগ্রহ করে সকলে অনুমতি দেন, তা হলে সেই সৃষ্টিকর্তা, যিনি পরম দাতা দয়ালু, তাঁর ও তাঁর প্রেরিত রাসূলের (দঃ) কিছু স্তুতীগান ও আলোচনা করে শোনাতে পারি। তারপর সে অনুমতির পাওয়ার আশায় সকলের দিকে চেয়ে মাথা নিচু করে নিল।

এতক্ষণ যেন চাঁদ সেখানে আলো ছড়াচ্ছিল, লাইলী মাথা নিচু করে নিলে সকলের মনে হল চাঁদ যেন মেঘের ভিতরে ঢুকে গেল। বেশ কয়েক মিনিট কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। সোহানা বেগম এবং আরও দুই তিনজন বয়স্কা মহিলা একসঙ্গে বলে উঠলেন, বেশ তো মা, তুমি কি শোনাতে চাও শোনাও।

লাইলী মুখ তুলে সকলের দিকে চেয়ে উর্দুতে একটা গজল গাইল।

খুদী কো মিটাকর খোদা সে মিলাদে,
শুরুর আওর মস্তী কী দৌলত লুটাদে,
শরাবে হকিকত কী দরিয়া বাহাদে,

নেগাহুঁকী সাদকে মে বেখুদ বানাদে,
মুঝে সোফিয়া জামে ওহাদাৎ পিলাদে,
খুদীকো.....
আজল সেহুঁ কুশতা ম্যায় তেরী আদাকা,
নাজীনে কী হজরত নাগাম হ্যায় কাজাকা,
না জোঁইয়া আসর কা না খাঁহাঁ দোওয়া কা,
মাসিহা সে তালেব নেহী ম্যায় সে কা কা,
মরীজে আলম হুঁ তেরা তু দোওয়া দে,
খুদী কো.....
খুদারা কভি মেরী তুরজাত পীয়া কর,
বাসাদ নাজ হালকি সে ঠোকর লাগা কর ;
দেখা মেরী খবিদা কীসমত জাগা কর,
সাদা কুম বেএজনী কি মুজকো শুনা কর,
ম্যায় বেদম হুঁ আয়া ফাখরে ইসা জিলাদে
খুদী কো মিটা কর খোদা সে মিলাদে।"

লাইলী থেমে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পিন অফ সাইলেন্স বিরাজ করতে লাগল। সকলে বোবা দৃষ্টিতে তার দিকে করুণভাবে চেয়ে রইল। তাদের কানে এখনও লাইলীর সুমধুর ঝংকার বেজে চলেছে। যদিও অনেকে এই উর্দুগজলের মানে বুঝতে পারেনি, তবুও লাইলীর কোকিলকণ্ঠ গলা ও দরদভরা সুর সবাইকে যেন পাথরের মত স্তব্ধ করে দিয়েছে। সব থেকে বেশি অভিভূত হয়েছে সেলিম। সে ভাবল, লাইলীর সুরের কাছে তাদের সকলের সুরের কোনো তুলনা হয় না।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথমে সালমা হাততালি দিতে সকলে সম্বিত ফিরে পেয়ে তারাও হাততালি দিতে লাগল। সকলকে থামিয়ে সালমা বলল, আপনার গলা এত সুন্দর ? আপনি যদি রেডিও, টিভি কিংবা ফিলম লাইনে যান, তা হলে তারা আপনাকে লুফে নেবে। আমি কত গায়ক-গায়িকার গান শুনলাম, কিন্তু আপনারটা তুলনাহীন।

লাইলী এতক্ষণ লজ্জা পেয়ে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সালমা থেমে যাওয়ার পর তার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার জওয়াবে অনেক কথা বলতে হয়। সেগুলো বললে আপনারা শুনে হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন। তাই বেশি কথা না বলে এক কথায় বলছি, ইসলামে গান-বাজনা নিষিদ্ধ। তারপর সকলের দিকে এক নজর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার বলল, আল্লাহপাক তাঁর সৃষ্টির সেরা মানুষকে নর ও নারী দুটি আলাদা সত্ত্বে সৃষ্টি করেছেন। তাদের দৈহিক ও মানসিক দিক ভিন্ন করেছেন এবং তাদের কাজ ও তার ধারা আলাদা করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তার সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে তার আদেশ অমান্য করে নিজেদের স্বার্থ চারিতার্থ করার জন্য নিজেরা আইন তৈরি করে নিয়েছি। যার ফলে আজ সারাবিশ্বে অশান্তির আগুন জ্বলছে। ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পিতামাতার এবং স্ত্রীদের সঙ্গে স্বামীদের মনমালিন্য শুরু হয়ে সংসার নরকে পরিণত হতে চলেছে। এইসব কথা বলতে গেলে সরারাতেও শেষ হবে না। তা ছাড়া এমন আনন্দ উৎসব ফাংশানে এইসব আলোচনাও খাপ খায় না। তবুও আর একটু বলে শেষ করছি। প্রত্যেক মসুলমানের উচিত পৃথিবীকে জানার আগে নিজেকে জেনে নেওয়া। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতা, ভাষা, ধর্ম ও মতামতকে প্রধান্য দেওয়ার আগে তার নিজের ধর্মের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে জেনে নেওয়া দরকার। যদি তারা তাই করত, তা হলে বুঝতে পারত, পৃথিবীর অন্যান্য সবকিছুর চেয়ে ইসলামের অর্থাৎ আল্লাহপাকের আইন কত সুষ্ঠ, কত সুন্দর, কত

সহজতর। দূর থেকে লম্বা কুর্তা ও টুপী পরা মৌলবী এবং বোরখা পরা মেয়ে দেখে আজকাল বেশিরভাগ লোক সেকেলে, ন্যাষ্টি বলে নাক সিটকায়। আবার অনেকে ইসলামের আইন এযুগে মেনে চলা খুব কঠিন ও অচল বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলছেন, "আমি বান্দাকে এমন কাজ করতে আদেশ দিই নাই, যা তাদের পক্ষে মেনে চলা কঠিন।"[১] আর বেশি কিছু বলে আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। এতক্ষণ যা কিছু বললাম, তাতে হয়তো অনেক ভুলত্রুটি থাকতে পারে, সে জন্য ক্ষমা চাইছি। তারপর সে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে ঘামতে লাগল। তার মনে হল, সে যেন আগুনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। এরপরও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করল।

সোহানা বেগম বলে উঠলেন, এবার তোমরা সবাই খাবে চল, রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে। তিনি রহিমকে ডেকে ডাইনিং রুমে খাবার সাজাতে বললেন।

এদিকে যারা লাইলীকে অপমান করতে চেয়েছিল, তারা ব্যর্থ হয়ে মনে মনে গুমরাতে লাগল। ছেলেরা তো লাইলীর রূপের ও সুরের প্রশংসায় মশগুল।

রেজাউল সেলিমের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, দোস্ত, এই কী সেই মেয়ে, যার সঙ্গে তুই ভার্সিটিতে এ্যাকসিডেন্ট করেছিলি ? আর মিল্লাদুন্নবীর ফাংশনের দিন যার সঙ্গে দেখা করার জন্য কবিতা গেয়েছিলি ?

সেলিম বলল, তুই ঠিক ধরেছিস। আমার কথা সত্য না মিথ্যা তার প্রমাণ পেলি তো ?

রেজাউল বলল, সত্যি দোস্ত, তুই মহাভাগ্যবান। এরকম মেয়ে বর্তমান দুনিয়ায় খুব বিরল।

একটু পরে রহিম এসে বলল, আপনারা সবই খাবেন চলুন।

একে একে সকলে ডাইনিং রুমে গেল। শুধু লাইলী একা বসে রইল।

সেলিম ফিরে এসে বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে না ?

লাইলী করুণসুরে বলল, প্লীজ সেলিম, তুমি মনে কিছু করো না। আমি কিছুতেই সকলের সাথে খেতে পারব না। তুমি যাও, নচেৎ অতিথিরা মনে কষ্ট পাবে। সেলিম চলে যাওয়ার পরও লাইলী চুপ করে বসে সারাদিনের ঘটনাগুলো একের পর এক ভাবতে লাগল।

এদিকে খাবার টেবিলে লাইলীকে দেখতে না পেয়ে একজন জিজ্ঞেস করল, কই নূতন অতিথিকে তো দেখতে পাচ্ছি না ?

কেউ কিছু বলার আগে রেহানা বলে উঠল, উনি পর্দানশীন মহিলা, ছেলেদের সঙ্গে খান না। কথাটা শুনে অনেকে হেসে উঠল।

এমন সময় সোহানা বেগম ঘরে ঢুকে তাদের কথা শুনে বুঝতে পারলেন, লাইলী খেতে আসেনি। সেলিমকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যারে, লাইলী কোথায় ?

সেলিম বলল, সে ঐ রুমে বসে আছে। তুমি তাকে আলাদা খাওয়াবার ব্যবস্থা কর।

সোহানা বেগম লাইলীর গজল ও কথা শুনে খুব মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। মনে মনে অনেক তারিফ করেছেন। তিনি লাইলীকে ডেকে অন্য রুমে খেতে দিলেন। সকলে বিদায় নিতে রাত্রি দশটা বেজে গেল। সোহানা বেগম লাইলীকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলে সেলিমকে সাথে যেতে বললেন।

যেতে যেতে গাড়িতে সেলিম বলল, সত্যি বলছি আজ যে রুবীনার বার্থডে পালন

---

(১) সূরা-বাক্বারা, ২৮৬ আয়াতের প্রথম অংশ, পারা-৩।

করা হবে, সে কথা আমার একদম মনে ছিল না। তবে একটা কথা মনে রেখ, যারা তোমাকে হিংসা করে অপমান করতে চেয়েছিল, তারা নিজেরাই অপমানিত হয়েছে। আর আমি আমার প্রিয়তমাকে অনেক বেশি জানতে পারলাম। তোমার গলা যে এত ভালো, আমি প্রশংসা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

লাইলী লজ্জা পেয়ে বলল, কি জানি, আমি তো কোনোদিন গলা সাধিনি। আর কোনোদিন গানও গাইনি। যদি সত্যি তোমার কাছে ভালো লেগে থাকে, তা হলে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তারপর আবার বলল, আমি কাউকে অপমান করার উদ্দেশ্যে কিছু বলিনি। বরং আমি ভাবছি, আমার জন্য তোমাদের কোনো অপমান হল কি না ?

সেলিম বলল, তুমি আমাদের ইজ্জৎ বাড়িয়ে দিয়েছ। ওরা নিজেদেরকে খুব সুন্দরী ও ভালো গায়িকা মনে করত। আজ তাদের সেই অহংকার চূর্ণ হয়ে গেছে।

লাইলী বলল, তোমার গান শুনে আমি কিন্তু নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তোমার গলা যে কত সুন্দর তার প্রশংসা করা আমার দ্বারা সম্ভব না।

দূর আমার গলা আবার গলা। কতদিন ওস্তাদ রেখে গলা সেধে এটুকু তৈরি করেছি। আরে তুমি এমনি যা গাইলে, এর আগে জীবনে কোনোদিন শুনিনি।

এরপর লাইলী কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, রাত অনেক হয়ে গেল, আব্বা-আম্মা খুব চিন্তা করছেন। অনেক বকাবকি ও করবেন।

আজ আমার জন্য না হয় একটু বকাবকি খেলে। ততক্ষণে তারা লাইলীদের বাড়ির গেটে পৌঁছে গেল। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দিল।

লাইলী নেমে কলিং বেলে চাপ দিয়ে বলল, ভিতরে আসবে না ?

তুমি বললে নিশ্চয় আসব।

জলিল সাহেব গেট খুলে দিয়ে লাইলীর সঙ্গে সেলিমকে দেখে বললেন, আরে সেলিম সাহেব যে, আসুন ভিতরে আসুন। লাইলী লজ্জা পেয়ে পাশ কাটিয়ে নিজের রুমে চলে গেল। জলিল সাহেব সেলিমকে সঙ্গে করে নিয়ে ড্রইংরুমে বসিয়ে বললেন, রাত্রে যখন এসেই পড়েছেন তখন একমুঠো ভাত খেয়ে যান।

সেলিম বলল, এইমাত্র খেয়ে আসছি। এখন কিছু খেতে পারব না।

অন্ততঃ এক কাপ চা তো চলবে। তারপর উঠে গিয়ে স্ত্রীকে চা তৈরি করে লাইলীর হাতে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

একটু পরে লাইলী দুকাপ চা নিয়ে এল।

চা খেয়ে সেলিম বিদায় নিয়ে চলে গেল।

লাইলী খালি কাপ নিয়ে ফিরে এলে হামিদা বানু রাগের সঙ্গে বললেন, আজকাল মেয়েদের লজ্জা সরম বলতে কিছুই নেই। তুই যে সারাদিন ঐ ছেলেটার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালি, তোর লজ্জা করল না ? কলিযুগ ঘোর কলিযুগ। তা না হলে জোয়ান জোয়ান ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে লেখাপড়া ও ঘোরাফেরা করে ? মেয়েদের পর্দা বলতে আর কিছুই রইল না। এইজন্য মানুষ দিন দিন রসাতলে যাচ্ছে। আর কোনোদিন এভাবে যাবি না বলে দিচ্ছি ?

রহমান সাহেব লাইলী ফেরার খবর শুনে শুবার ব্যবস্থা করছিলেন। স্ত্রীর কথা শুনে বললেন, আহা রাগারাগি করছ কেন। যা বলবে মেয়েকে তো ভালো মুখে বুঝিয়ে বলতে পার ?

হামিদাবানু গর্জে উঠলেন, তুমি থামো, তোমার আস্কারা পেয়ে তো ওর এত সাহস হয়েছে। মেয়ে ছোট নাকি যে, তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ? সে কি কিছু বোঝে না, না জানে না ? পরের ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে বংশের ইজ্জত বাড়বে বুঝি ?

লাইলী বলল, মা তুমি চুপ কর। এতরাতে কথা কাটাকাটি করো না। আমার অন্যায় হয়েছে। আর কোনোদিন যাব না। হয়েছে তো বলে নিজের ঘরে চলে গেল। সেলিমদের বাড়িতে সারাদিন যাই ঘটুক না কেন, ফেরার সময় তার মনটা বেশ উৎফুল্ল হয়েছিল। বাড়িতে ফিরে বকুনি খেয়ে তা খারাপ হয়ে গেল। পরক্ষণে ভাবল, এতে মায়ের কোনো দোষ নেই। কারণ পিতামাতা সন্তানের ভালো চান। আমার ভালোর জন্য মা রাগারাগি করেছে। আরও চিন্তা করল, গার্জেনরা শাসন না করলে ছেলেমেয়েরা প্রথমে ছোট-খাট অন্যায় করতে করতে পরে বড় বড় অন্যায় কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তারপর ঐ সব চিন্তা দূর করে দিয়ে সেলিমের কথা মনে করতে তার মধুর কণ্ঠের গানটা কানের পর্দায় ভেসে উঠল। সেই গান শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

রেহানা বাড়িতে ফিরে লাইলীর কথা যত ভাবতে লাগল, তার প্রতি তত রাগে মনটা ভরে উঠল। তাকে হিংসার আগুনে পুড়োতে গিয়ে নিজেই দগ্ধ হতে লাগল। চিন্তা করল, সেলিম এতদিন তাকে ভালবাসত, এখন লাইলীকে পেয়ে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করছে। আবার ভাবল, সেলিম যে তাকে ভালবাসে, এতদিনে তা ঘুনাক্ষরে প্রকাশ করেনি। আর আমিও যে তাকে ভালবাসি তাও তো জানাইনি। কিন্তু আমি তাকে ভালবাসি। সে আমাকে ভালবাসবেনিই বা কেন ? আমার কী রূপ নেই ? আমি দেখতে কী এতই খারাপ ? স্বীকার করি লাইলী আমার থেকে বেশি সুন্দরী। তা বলে একটা সেকেলে আনকালচার্ড মেয়ের দিকে সেলিম ঝুকে পড়বে আর আমাকে তা দেখতে হবে ? না-না, সেটা আমি হতে দিচ্ছি না। আমিও দেখে নেব, সে কেমন মেয়ে ? আমার এত দিনের স্বপ্ন কী করে ভেঙ্গে দেয় ? পড়ার ঘরে বসে রেহানা ঐ সব চিন্তা করছিল।

তার ভাই মনিরুল এসে বলল, কিরে অমন চুপ করে কি ভাবছিস ? রুবীনাদের বাসায় গিয়েছিলি নাকি ?

ওরা দুই ভাইবোন। সে রেহানার চেয়ে দু'বছরের বড়। এম, কম, পাশ করে বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করে। স্বভাব চরিত্র তেমন ভালো নয়। কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে তার ভালবাসা আছে। সাধারণতঃ বড় লোকের ছেলেরা যে স্বভাবের হয়ে থাকে, তা থেকে একটু বেশি বেলাইনে চলাফেরা করে। প্রতিদিন নাইট ক্লাবে যাওয়া চাই। ক্লাবে ফ্লাস খেলে এবং বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মদও খায়। তবে বংশ মর্যাদার দিকে তার প্রখর দৃষ্টি। কোনো কিছু এমন বাড়াবাড়ি করে না, যাতে বংশের দুর্নাম হয়।

রেহানা ভাইকে তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে বলল, তুমি যে আজ সন্ধ্যা বেলাতেই ফিরে এলে। ক্লাবে যাওনি ?

আজ শরীরটা একটু খারাপ লাগছে, তাই ক্লাব থেকে চলে এলাম। হ্যারে, তুই এত গভীরভাবে কি চিন্তা করছিলি বললি না যে ? আজ রুবীনার বার্থডে পার্টিতে গিয়েছিলি বুঝি ? আমারও কিন্তু যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। জরুরী কাজ থাকায় যেতে পারলাম না। তারও রুবীনার প্রতি খেয়াল আছে। অপেক্ষা করে আছে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলেই তার পিছু নেবে। আবার জিজ্ঞেস করল, সেলিম সাহেবের খবর কি ? এখনও তোকে কিছু বলেনি ? মনিরুলও জানে রেহানার সঙ্গে সেলিমের বিয়ের কথা হয়েছে।

রেহানা বলল, দাদা তুমি একটু বেশি বেহায়া হয়ে যাচ্ছ ?

আরে এতে বেহায়া হওয়ার কি হল ? তোদের বিয়ের কথা হয়েছে, তাই ভাবলাম আগের থেকে হয়তো দু'জন দু'জনকে জেনে নিচ্ছিস ?

হয়েছে হয়েছে, আর বেশি কিছু তোমাকে ভাবতে হবে না। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, আজ লাইলী নামে একটা মেয়েকে ওদের বাড়িতে দেখলাম। কি একটা বিপদ থেকে মেয়েটাকে নাকি সেলিম উদ্ধার করেছিল।

তাতে আর কি হয়েছে ? বড়লোকদের ছেলেরা অমন কত মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। নিশ্চয় মেয়েটা গরিবের আর দেখতেও খুব সুন্দরী ?

গরিবের তো বটেই, কিন্তু শুধু সুন্দরীই নয়, অপূর্ব সুন্দরী এবং ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। এত নিখুঁত সুন্দরী আমি একটাও দেখিনি।

তাই বল, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তুই এত গভীরভাবে কি চিন্তা করছিলি। মেয়েটার ঠিকানা জানিস ?

কেন, ঠিকানা নিয়ে তুমি কি করবে শুনি ? ঠিকানা আমি জানি না।

আহ, অত চটছিস কেন ? ঠিকানা পেলে তাকে আমি বুঝিয়ে দিতাম, বড়লোকের ছেলেরা মেয়েদেরকে দুদিনের খেলার সামগ্রী মনে করে। পুরোনো হয়ে গেলে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেয়।

থাক তোমাকে আর বোঝাতে হবে না, আমিই ব্যবস্থা করব।

যাকগে, তুই যখন তোর দিকটা সামলাবি বলছিস, তখন আমি আর হস্তক্ষেপ করব না। তবে সামলাতে না পারলে আমাকে বলিস।

সে দেখা যাবে, তুমি এখন যাও তো ? শরীর খারাপ বলছিলে, খেয়ে নিয়ে ঘুমাওগে যাও।

তাই যাচ্ছি বলে মনিরুল চলে গেল। ঘুমোবার সময় বিছানায় শুয়ে চিন্তা করল, পুরুষ জাতটার স্বভাবই শালা ঐ রকম, সব সময় নূতন ফুলের মধু খেতে ভালবাসে। এক ফুলে মন ভরে না। রেহানার কথামত মেয়েটা যদি সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী হয়, তা হলে তো বেশ চিন্তার কথা। দেখা যাক কত দূরের পানি কত দূরে গড়ায়। এমন সময় ফোন বেজে উঠল। মনিরুল বিরক্ত হয়ে রিসিভার তুলে বলল, হ্যালো, আমি মনিরুল বলছি, আপনি কাকে চান ?

যাকে চাই সেই ফোন ধরেছে।

ও পারভীন বলছ ? তা এত রাতে, কি খবর ?

তুমি যে আজ ক্লাবে আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলে ? অবশ্য আসতে আমার একটু লেট হয়েছে। ভাবলুম আমার উপর রাগ করে হয়তো চলে গেছ।

না-না, তা নয়। শরীরটা ভালো নেই। তাই মনটাও খারাপ। কিছু ভালো লাগছিল না, সেই জন্য চলে এলাম। এবার রাখি তা হলে ?

আগামীকাল নিশ্চয় আসছ ?

শরীর ভালো থাকলে যাব বলে মনিরুল ফোন ছেড়ে দিয়ে চিন্তা করতে লাগল, শালা এই মেয়েটা জোঁকের মত পিছু লেগেছে। ওকে যতই এড়িয়ে চলতে চাই, ততই যেন জড়িয়ে ধরতে চায়। অথচ সে বড়লোকের শিক্ষিতা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। তবে বড় গায়েপড়া স্বভাব। নিজের কোনো পার্শনালিটি নেই। ক্লাবে যার তার সাথে বড় বেশি মাখামাখি করে। অথচ তাকে কয়েকবার বলেছে, আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা বেশি ভালবাসি। তুমি আমাকে কি মনে কর জানি না, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। প্রথমে পারভীন যখন এই কথা মনিরুলকে বলে তখন তার প্রতি মনিরুলের মনটা ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল। তার হাবভাব দেখে মনে হয়েছে, সে এই

রকম কথা হয়েতো আরো অনেকের কাছে বলেছে। সেদিন মনিরুল তার কথার উত্তরে শুধু বলেছিল, এব্যাপারে আমি এখনও কোনো চিন্তা করিনি। পরে ভেবেচিন্তে দেখা যাবে। সেই থেকে মেয়েটা ওর পিছু লেগেছে। সে যা বলে মেয়েটা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায়। অবশ্য এরকম আরও চার পাঁচটি তার বান্ধবী আছে। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবল, কম্পারেটিভলি পারভীনই সব বান্ধবীদের চেয়ে ভালো। একে বিয়ে করলে নেহাৎ খারাপ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে রুবীনার কথা মনের পর্দায় ভেসে উঠল। ভাবল, যদি রুবীনাকে বাগাতে না পারি তখন দেখা যাবে। দূর কি সব ভাবছি, তার চেয়ে ঘুমোলে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে যাবে। তারপর চিন্তা দূর করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ দেড় মাস বন্ধের পর আজ ভার্সিটি খুলেছে। সেলিম ঠিক দুটোর সময় লাইব্রেরীতে এসে লাইলীকে দেখতে না পেয়ে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে তাকে খুঁজতে লাগল।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর একটা বোরখা পরা মেয়েকে আসতে দেখে মনে করল, নিশ্চয় লাইলী।

মেয়েটি একদম কাছে এসে মুখের নেকাব খুলে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে স্মীত হাস্যে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ ?

লাইলী যখন মুখের নেকাব সরিয়ে তার সামনে দাঁড়াল তখন সেলিমের মনে হল, মেঘের ভিতর থেকে চাঁদ বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। সে তন্ময় হয়ে তার পানে চেয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যেতে লাইলী বলল, কি হল কথা বলছ না কেন ? ভিতরে চল। এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে অন্যেরা কি মনে করবে ? তবুও যখন সেলিমের নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না তখন সেলিমের একটা হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলল, চুপ করে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?

সেলিম যেন ইহজগতে ছিল না। সম্বিত ফিরে পেয়ে ভিতরে গিয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ ?

লাইলী বলল, আমি যে আগেই সে কথা জিজ্ঞেস করেছি, তার বুঝি উত্তর দিতে নেই ?

সেলিম বলল, তোমাকে ও তোমার হাসিমাখা মুখ দেখে আমি এতই মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, তোমার কোনো কথা তখন শুনতে পাইনি। আমার মনে হল, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। সৃষ্টিকর্তা তোমাকে এত সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাকে যতবার দেখি ততবারই যেন নূতন দেখি।

আমি সৌন্দর্যের অধিকারী কিনা কোনদিন চিন্তা করিনি। আমাকে তুমি খুব বেশি ভালবাস। আর সেই ভালবাসার চোখে আমাকে দেখ, তাই তোমার কাছে আমি অপূর্ব সুন্দরী। আমিতো নিজের চেয়ে তোমাকে বেশি সুন্দর বলে মনে করি। তোমার মত সুপুরুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি। একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো ?

তোমার কথায় আমি কিছু মনে করব, একথা ভাবতে পারলে ? বল কি বলবে।

আমার কথা শুনে প্রিয়তম অসন্তুষ্ট হোক, তা আমি চাই না, তাই জিজ্ঞেস করেছি।

যখন যা মনে আসবে কোনো দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ বলে ফেলবে। অনুমতি নিতে হবে না। বল কি বলবে বলছিলে ?

না এমন কিছু কথা নয়, হাদিসের কথা। রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেওয়া ওয়াজেব, অর্থাৎ কর্তব্য। না দিলে গোনাহ হয়। তাই বলছিলাম আমি তোমাকে প্রথমে সালাম দিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করছিলাম। তুমি

সালামের জবাবও দাওনি, আর কুশলও জানাওনি।

একটু আগেই তো বললাম। তোমাকে দেখে আমার বাহ্যিক জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। তাই তখন তোমার কথা শুনতে পায়নি। আচ্ছা, সালাম কি এবং কেন সালাম দিতে হয় ? তার ব্যাখ্যাটা আমাকে বুঝিয়ে দাও তো ?

লাইলী বলল, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, "একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের সঙ্গে দেখা হলে বলবে-আসসালামু আলাইকুম।" ইহা বলা সুন্নত। আর দ্বিতীয় জন তার উত্তরে বলবে, ওআলাইকুম আসসালাম। ইহা বলা ওয়াজিব। তার ব্যাখ্যা হল, আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আপনার প্রতিও আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক।' অর্থাৎ সাক্ষাৎকারীদ্বয় উভয় উভয়ের জন্য আল্লাহর কাছে শান্তি কামনা করবে। যে প্রথমে সালাম দিবে সে উত্তর দাতার চেয়ে নব্বইগুণ বেশি সওয়াব পাবে। বোধ হয় সেই কারণে রসূল পাক (দঃ) কে কেউ কোনো সময় আগে সালাম দিতে পারেনি।' এখন বুজেছ ?

সেলিম বলল, হ্যাঁ বুঝেছি। ইসলামের রীতি সত্যিই খুব সুন্দর।

লাইলী বলল, ইসলামের সমস্ত আইন এমন বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, মানুষ যদি তা অনুধাবন করত, তা হলে কেউ ইসলামের আইনের বাইরে চলতে পারত না। যাক, পরীক্ষার পড়াশোনা কেমন চলছে বল ?

পরীক্ষার পড়াতো ঠিকভাবে চালাতেই হবে। তোমরাও নিশ্চয় চলছে ?

তোমার কথাই ঠিক। তবে সেলিম নামে একটা ছেলের স্মৃতি মাঝে মাঝে বেশ বিঘ্ন ঘটায়।

তাই নাকি ? তা হলে তো ছেলেটার শাস্তি হওয়া উচিৎ। আমার কিন্তু লাইলী নামে একটি মেয়ের স্মৃতি মনে পড়লে খুব উৎসাহিত বোধ করি।

তা হলে মেয়েটা তোমার বেশ উপকার করেছে। তাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে লাইলী হেসে ফেলল।

লাইলীর হাসি সেলিমকে পাগল করে দেয়। সে তার মুখের দিকে পলকহীনভাবে চেয়ে রইল।

তাকে ঐভাবে চেয়ে থাকতে দেখে লাইলী বলল, এই কি হচ্ছে ? আবার অমনভাবে চেয়ে রয়েছে ? কে যেন আসছে ?

সেলিম তাড়াতাড়ি বলল, চল না একটু বেড়িয়ে আসি ?

লাইলী চল বলে সেলিমের সঙ্গে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল।

সেলিম গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, সেদিন তোমার মা-বাবা কিছু বলেনি ?

মা অনেক বকাবকি করেছেন। আব্বা কিছু বলেননি।

তা হলে আজ যে আবার আমার সঙ্গে বেড়াতে এলে ?

বারে, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। ঠিক আছে গাড়ি থামাও, আমি নেমে যাব।

বাব্বা, মেয়ের রাগ দেখ না ? একটু রসিকতা করলাম। আর উনি কিনা রেগে গেলেন। বেশ তবে নেমেই যাও বলে সেলিম গাড়ির স্পীড খুব বাড়িয়ে দিল।

লাইলী ভয় পেয়ে বলল, একি হচ্ছে ? প্লীজ এত জোরে চালিও না। আমার ভয় করছে বলে চোখ বন্ধ করে নিল।

সেলিম তার দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে অবস্থা বুঝতে পেরে স্পীড কমিয়ে দিয়ে বলল, সুন্দরী গো, এবার আঁখি খুলে দেখ, গাড়ি ধীরে চলছে।

লাইলী চোখ খুলে সেলিমের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে যত আনন্দ পাই, তার তুলনায় মায়ের বকুনী কিছুই নয়।

আচ্ছা দেখা যাবে, দু'দিন তোমাকে আটকে রাখব, তারপর বাড়ি পৌঁছে দেব। দেখব মায়ের কত বকুনি হুজম করতে পার ?

আমার প্রিয়তম যদি তার প্রিয়তমাকে বকুনি খাইয়ে খুশি হয়, তা হলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে মায়ের সব রকম বকুনি হজম করতে পারব।

তোমার বুদ্ধির ও কথার সঙ্গে আমি কোনোদিন পারব না। হার মানলাম সুন্দরী, আমায় ক্ষমা কর বলে সেলিম তার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করল।

এমন সময় সামনে থেকে একটা ট্রাককে ওদের গাড়ির দিকে সোজা আসতে দেখে লাইলী চিৎকার করে কিছু বলে উঠল।

সেলিম তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে একবারে সামনে একটা ট্রাক দেখে বিদ্যুৎ গতিতে নিজের গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বিপদ থেকে রক্ষা পেল। দ্রুত গাড়ি ঘোরাবার ঝাঁকানিতে লাইলী টাল সামলাতে না পেরে সেলিমের গায়ের উপর পড়ে গিয়ে ভয়ে তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

সেলিম গাড়ি সামলে নিয়ে এক হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমো খেয়ে বলল, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে না ? আজ আল্লাহ তোমার মত পুণ্যবতী নারীর কারণে এ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করলেন। লাইলী তখনও ভয়ে কাঁপছিল। সেলিম রাস্তার একপাশে গাড়ি পার্ক করে তার পিঠে ও মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, কি, এখনও ভয় দূর হচ্ছে না ?

লাইলী লজ্জা পেয়ে সেলিমকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসে কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর বলল, আমি পুণ্যবতী না পাপী হতভাগী ? তা না হলে গাড়িতে উঠতে না উঠতে এ্যাকসিডেন্ট হতে যাচ্ছিল।

সেলিম বলল, তুমি কি যা তা বলছ ? পাপ পুণ্যের কথা আল্লাহ জানেন। ভাগ্যের লিখন কেউ খণ্ডন করতে পারে না শুনেছি। সে কথাতো তুমি আমার চেয়ে বেশি জান। ভাগ্যে যদি দুর্ঘটনা থাকত, তা হলে হতই। নেই, তাই আমরা বেঁচে গেলাম। তা ছাড়া শুনেছি, আল্লাহ যা করেন, বান্দাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। ঐসব নিয়ে অত চিন্তা করে কান্নাকাটি কর না। তারপর সেলিম পকেট থেকে রুমাল বের করে লাইলীর চোখ মুখ মুছে দিল।

এমন সময় একটা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী যুবতী ময়লা কাপড় পরনে একটা ছেলে কোলে করে ম্লানমুখে ওদের কাছে এসে হাত পেতে বলল, আপনারা দয়া করে আমাকে কিছু সাহায্য করুণ। আজ দুদিন যাবত বাচ্চাটাকে কিছু খেতে দিতে পারিনি।

সেলিম বলল, কোনো বাড়িতে কাজ করে খেতে পার না ? যাও এখান থেকে, পেটে ভাত জোটে না বাচ্চা এল কোথা থেকে ?

মেয়েটি বলল, আপনারা বড়লোক, গরিবের খবর রাখেন না। আমি কি আর সখ করে ভিখারিণী হয়েছি ? গরিব ঘরে জন্মান যে কত বড় পাপ, তা যদি জানতেন, তা হলে ঐসব কথা বলতে পারতেন না। গরিব ঘরের মেয়েদের এই রকম পরিণতির জন্য আপনাদের মত ধনী লোকেরাই বেশি দায়ী।

লাইলী বলল, কেন কি হয়েছে? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি লেখাপড়া জান?

মেয়েটি বলল, কি আর বলব, সবই ভাগ্যের ফের। আমাদের বাড়ি কুমিল্লা জেলার দেবীদ্দার থানায়। আমার বাবা একজন গরিব কৃষক। আমরা শুধু চার বোন। যে টুকু জমি ছিল, তা বিক্রি করে বাবা তিন বোনের বিয়ে দেয়। আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি। একা বাবা গতরে খেটে সংসার চালাবেন ,না আমার পড়ার খরচ যোগাবেন। অভাবের তাড়নায় পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আর বাবা যৌতুকের টাকা

যোগাড় করতে পারেনি বলে আমার বিয়েও দিতে পারেনি। একদিন গ্রামের মাতব্বরের বাগান থেকে শুকনো ডালপালা আনছিলাম। বাগানের গেটে একটা অচেনা সুন্দর ছেলেকে পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, বাঃ এত সুন্দর মেয়ে তুমি, আর কাঠ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছ ? আমি বললাম, কি করব বলুন আমরা গরিব। এগুলো নিয়ে গেলে রান্না হবে। আপনি দয়া করে পথ ছাড়ুন। তখন ছেলেটি বলল, তুমি আগামীকাল দুপুরে এখানে এস, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। এই বলে সে চলে গেল। ছেলেটাকে দেখে আমারও খুব ভালো লাগল। পরের দিন ভয়ে ভয়ে সেখানে গেলাম। দেখি ছেলেটা বাগানের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতে নাম জিজ্ঞেস করল। বললাম, আমার নাম আসমা। ছেলেটা বলল, বেশ সুন্দর নাম তোমার। আমার নাম মনিরুল। তোমাকে কি জন্য ডেকেছি জান ? আমি মাথা নেড়ে বললাম না। ছেলেটি তখন বলল, আমার বাড়ি ঢাকায়। মাতব্বরের ছেলে শামীম আমার বন্ধু। ওর সাথে কয়েকদিন বেড়াতে এসেছি। তোমাকে দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি লজ্জা ও ভয় পেয়ে বললাম, আপনি আমার বাবার সঙ্গে কথা বলুন। ছেলেটি তখন বলল, ঠিক আছে তাই বলব। তারপর থেকে আমরা প্রতিদিন লুকিয়ে দেখা করতাম। সে আমাকে নানান প্রলোভন দেখাতো। এর মধ্যে একদিন দুর্বল মুহূর্তে হঠাৎ ছেলেটা আমার সর্বনাশ করে ফেলে। আমি কাঁদতে থাকি। ছেলেটা আমাকে বুঝাল যে, সে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে করবে। তারপর থেকে নানান কথা বলে আমার মধু আহরণ করতো। এভাবে প্রায় একমাস চলার পর হঠাৎ ছেলেটা আসা বন্ধ করে দিল। খবর নিয়ে জানলাম, সে ঢাকা চলে গেছে। মনে করলাম কোনো কারণে হয়তো তাড়াতাড়ি করে চলে গেছে, নিশ্চয় চিঠি দেবে। সে রকম কথাবার্তা আমাদের মধ্যে হয়েছিল। তার ঠিকানাও আমাকে দিয়েছিল। সেই ঠিকানায় অনেকগুলো চিঠি দিয়ে ব্যর্থ হই। যখন তিন মাস পার হয়ে গেল এবং তাঁর কোনো খবর পেলাম না তখন আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। কারণ এই ছেলেটা তখন আমার পেটে এসেছে। লজ্জায় ও ঘৃণায় কয়েকবার আত্মহত্যা করতে গেছি। কিন্তু পারিনি। জানাজানি হয়ে গেলে বাবার ইজ্জত যাবে, বাবা-মার কাছে মুখ দেখাব কি করে ? এইসব সাত-পাঁচ ভেবে সামান্য কয়েকটা টাকা জোগাড় করে তার ঠিকানায় আসি। প্রথমে গেটে দারোয়ানের কাছে বাধা পাই। সাহেব আমার আত্মীয় বলাতে সে ভিতরে যেতে দেয়। আমি মনিরুলের খোঁজ করলাম। সে তখন বাড়িতে ছিল না। তার বাবা ছিলেন। তিনি আমার পরিচয় ও আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি যতটা সম্ভব অকপটে সবকথা খুলে বললাম। তখন তিনি আমাকে কুৎসিত গালাগালি করে দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় বললেন, টাকা কামাবার জন্য এরকম কত মেয়ে শহরের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে বেড়ায়। আবার যদি কোনোদিন এ বাড়িতে আস, পুলিশে ধরিয়ে দেব। শেষে আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, যাও, আর কোনোদিন আসবে না। আমি টাকাটা তার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে আসি। অনেক কষ্টে একটা বাড়িতে ঝিগিরি কাজ জোগাড় করি। কিছুদিন পর তারা যখন বুঝতে পারল আমার পেটে বাচ্চা আছে তখন আমাকে নষ্ট মেয়ে ভেবে তাড়িয়ে দিল। শেষকালে স্বামী আছে খাওয়াতে পারে না, তাই মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে অন্য একটা বাড়িতে কাজ পাই। সেখানেই এই বাচ্চাটা হয়। বাচ্চাটা হওয়ার পর যখন আমার স্বাস্থ্য ভালো হল তখন বাড়ির কর্তার নজর আমার উপর পড়ল। সে উচ্চ শিক্ষিত সরকারী অফিসার। তার বয়সও বেশ হয়েছে। উনার এক ছেলে। তিনি বিদেশে পড়তে

গেছেন। ঐ রকম লোক হয়ে সুযোগ পেলে আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করতেন। তার স্ত্রী আমাকে মেয়ের মত ভালবাসতেন। একদিন দুপুরে একা পেয়ে লোকটা আমাকে জড়িয়ে ধরেন। আমি তখন মেয়ের তুলনা দিয়ে কাকুতি-মিনতি করছি। ঠিক সেই সময় উনার স্ত্রী ঘরে এসে পড়েন। লোকটা তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। উনার স্ত্রীও কোনো কথা না বলে স্বামীকে অনুসরণ করলো। সারাদিন আমি নিজের ঘরে বসে বসে কেঁদে কাটাই। সেই রাতের ভোরে তাদের বাড়ি থেকে লুকিয়ে চলে আসি। আজ দুদিন নিজে ও বাচ্চাটা পানি খেয়ে রয়েছি। কারও কাছে হাত পাতলে তারা আমার শরীরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন গিলে খাবে। সে জন্য কারও কাছে হাত পাতিনি বলে মেয়েটা কেঁদে ফেলল। তারপর বলল, আপনাদেরও ছোট ভাইবোন আছে। আমাকে না হয় নাই দিলেন। ছেলেটা তো আর কোনো পাপ করেনি। তাকে না হয় কিছু দিন। এক নাগাড়ে এতকথা বলে মেয়েটা হাঁপাতে লাগল।

সেলিম জিজ্ঞেস করল, ছেলেটার ঠিকানা তোমার মনে আছে ?

মেয়েটা হ্যাঁ বলে ঠিকানাটা বলে দিল।

সেলিম চমকে উঠে গম্ভীর হয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

লাইলী সেলিমের পরিবর্তন বুঝতে পেরে বলল, মনে হচ্ছে ছেলেটাকে তুমি চেন?

তোমাকে পরে বলব বলে সেলিম মেয়েটিকে গাড়িতে উঠিয়ে একেবারে নিজেদের বাড়ির গেটের বাইরে গাড়ি রেখে লাইলীকে বলল, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি একে মায়ের কাছে দিয়ে আসছি। তারপর মেয়েটিকে নিয়ে সে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

সোহানা বেগম বারন্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেলিমের সঙ্গে ছেলে কোলে এক ভিখারিণীকে আসতে দেখে অবাক হলেন।

সেলিম তার কাছে গিয়ে বলল, এই মেয়েটা ভীষণ বিপদে পড়েছে। একে তোমার আশ্রয়ে দিলাম। এ আমাদের পরম আত্মীয়া। ভাগ্যদোষে আজ ভিখারিণী। এর বেশি কিছু এখন বলতে পারছি না। ফিরে এসে সব কিছু বলব। এদের আজ দু'দিন কিছু খাওয়া হয়নি। তুমি এদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা কর। মাকে অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সেলিম আবার বলল, তোমার ছেলে কখনো কোনো অন্যায় করেনি। আর কখন করবেও না। তারপর মাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল।

সোহানা বেগম নির্বাক হয়ে ছেলের চলে যাওয়া দেখলেন। এর মধ্যে রুবীনা ও কাজের দু'জন মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি কাজের মেয়েদের বললেন, এদের ভিতরে নিয়ে খাবার ব্যবস্থা কর। আর সিঁড়ির পাশে রুমটাতে থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

ফিরে এসে সেলিম গাড়িতে উঠে বলল, এখন তো ক্লাস নেই, কোথায় যাবে, না তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব ?

লাইলী বলল, তোমার যা ইচ্ছে।

কিছুক্ষণ বেড়িয়ে ওরা একটা রেষ্টুরেন্টে ঢুকে নাস্তার জন্য অর্ডার দিল।

লাইলী বলল, আমি কিছু কথা বলতে চাই।

বেশ তো বল।

চার পাঁচদিন আগে আমি একটা বই কেনার জন্য নিউমার্কেটে গিয়েছিলাম। সেখানে হঠাৎ রেহানার সঙ্গে দেখা। আমাকে একটা রেষ্টুরেন্টে ডেকে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ার সময় বলল, সে তোমার বাগদত্তা। তোমার সাথে আমার পরিচয় কি করে হল তা জানতে চাইল। আমি শুধু সেই ঝড়ের দিনের দুর্ঘটনার কথা বলেছি। শুনে

বলল, তুমি নাকি তোমার কর্তব্য করেছ। আমি যেন তোমাকে শুধু উপকারী বন্ধু বলে মনে করি। তার বেশি এগোলে আমাদের মত গরিবদের বিড়ম্বনা ও দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। আমি তার কথা শুনে মনে কিছু করিনি। বরং আমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসি।

সেলিম এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। লাইলী থেমে যেতে বলল, আমি জীবনে মিথ্যা কথা বলিনি। আর কখনো যেন বলতে না হয়। রেহানা আমার বাগদত্তা নয়। যদি তা হত, তা হলে নিশ্চয় আমি জানতাম। তবে বেশ কিছুদিন আগে মা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, ওকে আমার কেমন মনে হয় ? তার উত্তরে আমি বলেছিলাম, "সে ভালো মেয়ে। ভালোকে তো আর খারাপ বলতে পারি না। তবে মেয়েটার একটু অহংকার আছে। মেয়েদের অহংকার থাকা ভালো নয়।" ব্যাস, ওর সম্পর্কে সব কথা এখানে ইতি টেনেছিলাম। রেহানা আমার মামাতো বোন। মা যদি তার ভাইয়ের সঙ্গে কোনো কথা বলে থাকে, তবে সে সব কিছু জানি না। আমার যতদূর মনে হয়, মা তার ভাইয়ের কাছে আমাদের দু'জনের বিয়ের সম্বন্ধে যখন কিছু বলা কওয়া করছে তখন হয়তো রেহানা শুনেছে। আর সেই জন্য তোমাকে ঐরকম কথা বলেছে। তবে মা আমার মতের বিরুদ্ধে কিছু যে করবে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তুমি কিছু মনে করো না। আমি তোমাকে কথা দিয়েছি বললে ভুল হবে, বরং যেখানে আমি আমার মানস প্রিয়াকে আবিষ্কার করেছি, সেখানে দুনিয়াশুদ্ধ লোক আমার বিরুদ্ধে গেলেও আমি তাকে হারাতে পারব না। তার জন্য যদি সব কিছু ত্যাগ করতে হয় তাতেও পিছপা হব না। তুমি আমাকে সব কিছু বলে খুব ভালো করেছ। রেহানার কথা শোনার পরেও আমার প্রতি তোমার অকপট ব্যবহারে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস দেখে আমার মন আনন্দে ভরে গেছে। সবশেষে একটা কথা বলে রাখছি, যদি কখনো আমাকে কোনো মেয়ের সঙ্গে অশোভন ভাবভঙ্গীতে নিজের চোখেও দেখ, তবু আমার ভালবাসাকে তুমি অবিশ্বাস করো না। জানবে, এটা কোনো ছলনাময়ীর ষড়যন্ত্র। আশা করি, এরূপ ঘটনা ঘটবে না, তবু তোমাকে সাবধান করে রাখলাম।

লাইলী বলল, প্রেম মানেই কান্না। সেটা মানবিক হোক বা আধ্যাত্মিক হোক। কান্না আছে বলেই সুখের মূল্য আছে। মানুষ যদি দুঃখ না পেত, তা হলে সুখের মর্যাদা অনুভব করতে পারত না। তাইতো কবি বলেছেন–

"চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে কি পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনী যারে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অভিজ্ঞতা ভিন্ন মানুষ সুখের আনন্দ, দুঃখের বেদনা, রোগের যন্ত্রণা, ভোগের মাধুর্য, ঐশ্বর্যের সুখ, দারিদ্রের যাতনা বুঝতে সক্ষম হয় না। আগুনে পুড়ে সোনা যেমন খাঁটি হয়, প্রকৃত মানুষ হতে হলে আমাদেরকেও তেমনি দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে। আমরা সুখের জন্য যত চেষ্টা করি না কেন, আল্লাহপাক আমাদের তকদ্বীরে যতটা সুখ ও দুঃখ রেখেছেন, কোনো কিছুর দ্বারা তা কমবেশি করতে পারব না। তাই তিনি ক্বোরআনপাকের মধ্যে বলেছেন–"যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা দুঃখ কষ্টের সময় বিচলিত না হয়ে আল্লাহ পাকের উপর সন্তুষ্ট থেকে সবর করে।"

সেলিম বলল, সত্যি, তোমার জ্ঞানের গভীরতা দেখে আমি মাঝে মাঝে খুব

আশ্চর্য্য হয়ে যাই। এত অল্প বয়সে তুমি কত জ্ঞান অর্জন করেছ। তোমার সঙ্গে যত বিষয়ে কথা বলি, সব বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দাও। তাই তোমার মত মেয়েকে প্রিয়তমা হিসাবে পেয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি। জানি না, তোমার মত সৌভাগ্যবতীকে কবে আমি স্ত্রীরূপে পাব ?

লাইলী নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জায় জড়সড় হয়ে বলল, তুমি আমাকে খুব বেশি ভালবাস, তাই এই রকম ভাবছ। আসলে আমি তোমার পায়ের ধুলোর যোগ্য কিনা আল্লাহপাককে মালুম।

সেলিম ওর দু'টো হাত ধরে তন্ময় হয়ে মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তুমি আমার হৃদয়ের স্পন্দন, চোখের জ্যোতি। নিজেকে এত ছোট করে আর কখনো আমার কাছে বলবে না। সব বিষয়ে তোমার মর্যাদা অনেক। আমার মত ছেলের সঙ্গে কি আল্লাহ তোমাকে জোড়া নির্ধারণ করেছেন ? আল্লাহ না করুন, যদি তোমাকে আমি না পাই, তা হলে সত্যি আমি বাঁচব না।

লাইলী কান্না জড়িত স্বরে বলল, প্লীজ, সেলিম, তুমি এবার থাম। তোমার ভালবাসার মূল্য কি ভাবে দেব, সে কথা ভেবে দিশেহারা হয়ে যাই। যদি তুমি আমাকে এভাবে বল, তা হলে আমি নিজেকে সামলাব কি করে ?

সেলিম রুমাল দিয়ে তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, চল ওঠা যাক, নচেৎ দেরি হলে তোমাকে বকুনী খেতে হবে।

লাইলী কিছু না বলে গাড়িতে উঠল।

সেলিম তাকে তাদের বাড়ির কাছে রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে ফেরার সময় ভাবল, কই লাইলী তো ভিখারিণী আসমার কথা জিজ্ঞেস করল না ? সত্যি লাইলী, তুমি অতি বুদ্ধিমতি ও ধৈর্যশীলা। তোমার জুড়ি দ্বিতীয় নেই, তুমি ধন্যা। তারপর বাড়িতে এসে মাকে আসমার সব কথা খুলে বলল।

সব শুনে সোহানা বেগম গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটিকে নিয়ে তুই কী করতে চাস ?

আমি মেয়েটাকে রুবীনার মত স্নেহ দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে পাঁচজনের মত ভদ্রভাবে বাঁচাতে চাই। যদি সম্ভব হয়, আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে মনিরুল তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলে নেয়। অবশ্য তার আগে ওকে মনিরুলের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবো।

ছেলের কথা শুনে সোহানা বেগম অবাক হয়ে বললেন, কী যা-তা পাগলের মত বকছিস, সে কি করে সম্ভব ?

সেলিম বলল, তুমি দোয়া কর মা, আমি অসম্ভবকে সম্ভব করে ছাড়ব। আমি যা ভালো বলে চিন্তা করি, তা করেই থাকি। তুমি মা হয়ে নিশ্চয় ছেলের এই বদগুণটা জান ?

সোহানা বেগম কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বেশ চেষ্টা করে দেখ কতদুর কি করতে পারিস।

সেলিম বলল, তুমি যদি এ ব্যাপারে সাহায্য কর, তা হলে ইনশাআল্লাহ আমি কামিয়াব হতে পারব।

সোহানা বেগম ছেলেকে যেন আজ নূতনরূপে দেখেছেন। এতদিন যেরূপে দেখেছেন সেটা ধীরে ধীরে তার কাছ থেকে যেন দুরে সরে যাচ্ছে। এই ভাবধারায় ওঁর মুখ দিয়েও হঠাৎ বেরিয়ে গেল, আল্লাহ তোর মনের মকসুদ পুরণ করুক।

সেই থেকে ভিখারিণী আসমা ওদের বাড়িতে রুবীনার বোনের মর্যাদা নিয়ে রয়ে গেল। সেলিম প্রাইভেট মাষ্টার রেখে তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে

দিল। আসমা সেলিমকে বড় ভাই এবং সোহানা বেগমকে খালা আম্মা বলে ডাকে।

সেদিন রাত্রে ঘুমোবার সময় সোহানা বেগমের রুবীনার জন্মদিন উৎসবে লাইলীর গজল ও হাদিসের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আরিফের স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠল। আজ পাঁচ ছয় বছর হল আরিফ ঘর ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় কিভাবে আছে ? কি করছে ? নানা চিন্তায় ডুবে গেলেন। সে যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো চিঠি-পত্রও দেয়নি। সোহানা বেগমের দুই চোখ মাতৃস্নেহে পানিতে ভরে উঠল। ভাবলেন, সে তো ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হেফাজতে রেখেছেন। আরিফের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের অতীত জীবনের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। সে যখন মৌলবী সাহেবের কাছে আরবি পড়ত তখন তার মুখে শুনেছিল, যে বান্দা আল্লাহর এলেম অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হয়, তিনি তার হেফাজত করেন। তার মা খুব ধার্মিক মহিলা ছিলেন। বিয়ের পর স্বামীর বাড়ি এসে খাপ খাওয়াতে তার অনেক কষ্ট হয়েছে। স্বামী ছিলেন বিলেত ফেরৎ ব্যারিষ্টার। তাদের চাল-চলন ছিল সাহেবী ধরনের। স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য তাকে নিজের ও ইসলামের নীতির বাইরে অনেক কাজ করতে হয়েছে। স্বামীর বাড়িতে ইসলামের নামগন্ধ ছিল না। এত কিছু সত্ত্বেও তিনি যথাসম্ভব নামায রোযা করতেন। আর প্রতিদিন ক্বোরআন পড়তেন ? তার স্বামী নিষেধ করতেন। বলতেন, ঐ সব করে কি লাভ ? মৃত্যুর পরে কি হবে না হবে, সে কি কেউ কোনোদিন দেখেছে ? পরে স্ত্রীর রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে খুব ভালবেসেছিলেন। তাই তার মনে কষ্ট হবে বলে ধর্মের ব্যাপারে স্ত্রীকে আর কিছু বলতেন না। সেই মায়ের একমাত্র সন্তান সোহানা বেগম। মা তাকে নিজের মত করে গড়তে চাইলে এত দিন পর আবার স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হয়। বাবা চাইলেন মেয়েকে নিজের মত যুগপযোগী করার জন্য শিক্ষায়-দিক্ষায় চাল-চলনে আপটুডেট করে গড়তে। শেষে বাবার জীদ বজায় রইল। মেম সাহেব মাষ্টার রেখে ইংলিশ শিখিয়ে ইংলিশ স্কুলে ভর্তি করেন। তবে প্রথম অবস্থায় মা মৌলবী রেখে কিছু আরবি পড়িয়েছিলেন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর সে সব বন্ধ হয়ে যায়। তবুও মা অবসর সময় গোপনে মেয়েকে ধর্মের অনেক কথা শোনাতেন। অনেক দিন আগের কথা হলেও আজও সোহানা বেগমের বেশ স্পষ্ট মনে আছে। যখন তার বয়স পনের বছর তখন তার মা মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে মারা গেলেন। তারপর বাবা আর বিয়ে করেননি। মেয়েকে আল্ট্রামডার্ণ করে মানুষ করেছিলেন। মায়ের কাছে যা কিছু ধর্মের কথা শিখেছিল সব ভুলে গেল। আজ সে সব কথা ভেবে সোহানা বেগম চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। লাইলীর কথাগুলো ঠিক যেন তার মায়ের মুখে ধর্মের কথা শুনলেন। তার মাও তাকে মাঝে মাঝে এ রকম করে বোঝাতেন। লাইলীকে দেখলে মায়ের কথা মনে পড়ে। তার মনে হয় তার মাও যেন এ রকম দেখতে ছিল। লাইলীর প্রতি কি এক অজানা আকর্ষণ অনুভব করলেন। ভাবলেন, লাইলী যদি সেলিমের বৌ হয়ে আসে, তা হলে বেশ ভালো হয় ? আবার ভাবলেন, সেলিম যে সমাজে মানুষ হয়েছে, সে কি লাইলীকে মেনে নিতে পারবে ? কিন্তু সেলিম মাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। লাইলী দু'দিন এখানে এসেছে। তার সঙ্গে সেলিমের ব্যবহার অন্যান্য বান্ধবীদের থেকে আলাদা। তৎক্ষণাৎ রেহানার কথা মনে পড়ল। রেহানাকে লাইলীর চেয়ে এই সমাজে যেন বেশি মানায়। দেখা যাক, সেলিম কাকে পছন্দ করে। তার অমতে কিছু করতে পারব না। কারণ সেলিম তার বাবার মত একগুয়েমী স্বভাব পেয়েছে। নিজে যা ভালো মনে করবে তা করেই ছাড়ে। রেহানার বাবাকে বুঝেয়ে বললেই হবে। রুবীনাটা তার মত হয়েছে। তাকে নিয়েই চিন্তা। সে খুব উগ্র আর

উচ্ছৃঙ্খল। ভাইপো মনিরের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে বলে ভেবে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন তার দুশ্চরিত্রের কথা জেনে সোহানা বেগমের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবলেন, মনির কি আসমাকে গ্রহণ করবে ? হঠাৎ কিসের শব্দ শুনে সোহানা বেগমের চিন্তা ছিন্ন হয়ে গেল। শব্দটা যেন রুবীনার ঘরের জানালার দিকে হল। বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে রুবীনার ঘরের দিকে গেলেন। ভেন্টিলেটার থেকে আলো দেখতে পেয়ে বুঝলেন, সে জেগে আছে। এতরাত্রে সে কি করছে দেখার জন্য জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলেন, রুবীনা বাগানের দিকের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। এতরাত্রে বাইরের একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলতে দেখে সন্দেহ হল। দরজার কড়া নেড়ে রুবীনা বলে ডাকলেন।

রুবীনা মায়ের গলা পেয়ে ছেলেটাকে বিদায় দিয়ে দরজা খুলে বলল, মা তুমি এখনও ঘুমোওনি ?

সোহানা বেগম গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার সঙ্গে এতরাত্রে কথা বলছিলে ? ছেলেটা কে ? তার সঙ্গে এখন তোমার কী দরকার ?

রুবীনা ধরা পড়ে ভয়ে ও লজ্জায় একেবারে বোবা হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কি উত্তর দেবে খুঁজে পেল না।

সোহানা বেগম গর্জে উঠলেন, কথা বলছ না কেন ? দিন দিন বড় হচ্ছ, না ছোট হচ্ছ ? এবার তোমার ভালো মন্দ জ্ঞান হওয়া উচিৎ। এতরাত্রে যে ছেলে গোপনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, সে যে খারাপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যাও ঘুমিয়ে পড়। আর যেন কোনোদিন এরকম দুঃসাহস তোমার না হয়। তোমার বয় ফ্রেণ্ড আছে, ভালো কথা। তাই বলে তার সঙ্গে এরকম করা মোটেই ভালো নয়। তারপর তাকে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তে বলে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

সেলিমের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। একদিন মাকে বলল, আমি ফার্স্টক্লাস পেলে বিলেতে পড়তে যাব।

সোহানা বেগম ছেলের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, তুমি এখন বড় হয়েছ, যা ভালো বুঝবে করবে। তবে আমার মতে এবার তোমার ব্যবসা-পত্র দেখা উচিত। আমার বয়স হয়েছে। আমি একা কতদিন চালাব ? তুমি যদি তোমার নিজের জিনিষ না দেখ, তা হলে অন্য লোক আর কতদিন দেখবে। বিলেতে না গিয়ে ব্যবসা-বানিজ্যে মন দাও। আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল আরিফের কোনো খোঁজ খবর নেই। তার চিন্তায় আমি জারে-জার হয়ে আছি। তার উপর তুমি যদি বিদেশে পড়তে চলে যাও, তা হলে আমি বাঁচাবো কাকে নিয়ে ? শেষের দিকে তাঁর গলা ধরে এল।

সেলিম মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ঠিক আছে, তোমার মনে আমি দুঃখ দেব না। তুমি যা বলবে তাই করব। আরিফের জন্য আমারও মনটা মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে যায়। আজ যদি সে ঘরে থাকত, তা হলে দুই ভাই মিলে সব কিছু দেখাশোনা করতাম। তুমি দেখ মা, আরিফ একদিন না একদিন মানুষের মত মানুষ হয়ে ঠিক ফিরে আসবে।

এরপর থেকে সেলিম নিয়মিত অফিসে ব্যবার সীটে গিয়ে বসতে লাগল। তার

কাজে ও ব্যবহারে অফিসের সবাই খুব সন্তুষ্ট। সে অফিসের ও মিলের সব ধরণের অফিসার ও শ্রমিকদের সঙ্গে খুব সহজভাবে মেলামেশা করে। তাদের অভাব অভিযোগ শুনে এবং যতটা সম্ভব সেগুলোর সমাধান করে। সব বিষয়ে সেলিমের কর্মদক্ষতা দেখে সকলে খুব খুশি।

একদিন সেলিম অফিসে কাজ করছে। এমন সময় লেবার অফিসার এসে একজন শ্রমিকের বিরুদ্ধে অনুপস্থিতির কমপ্লেন দিয়ে তাকে ছাঁটাই করার কথা বললেন।

সেলিম তাকে ব্যাপারটা খুলে বলতে বলল।

লেবার অফিসার বললেন, হারুন নামে এই শ্রমিকটা প্রতি মাসে দশ-বার দিন কামাই করে। তাকে বহুবার ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে। সে প্রতিবারই নানান অজুহাত দেখায়। তাকে এত বেশি ফেসিলিটি দিলে অন্যান্য শ্রমিকরাও সে সুযোগ নিতে চাইবে।

সেলিম বলল, আপনি এখন যান, আমি পরে আপনাকে জানাব। লেবার অফিসার চলে যাওয়ার পর সেলিম বেয়ারাকে ডেকে বলল, তুমি হারুনকে ডেকে নিয়ে এস।

কিছুক্ষণ পর একজন আধাবয়সী লোক এসে সেলিমের টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

সেলিম ফাইল দেখতে দেখতে তার দিকে না চেয়ে বলল, আপনি বসুন।

লোকটা থতমত খেয়ে বলল, হুজুর !

আপনি বসুন, আমি আমার হাতের কাজটা সেরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি।

লোকটা ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে রইল

সেলিম ফাইলের কাজটা শেষ করে সেটা যথাস্থানে রেখে লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

লোকটা ঘামতে ঘামতে একটা চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসল।

আপনার নাম হারুন, আপনি প্রতিমাসে দশবার দিন করে কামাই করেন, একথা কি সত্যি ?

সাহেবকে তার মত একজন সামান্য শ্রমিকের সঙ্গে আপনি করে কথা বলতে শুনে হারুন অবাক হয়ে মাথা নিচু করে বলল, হুজুর যদি আমার সব কথা শোনেন, তা হলে সব বুঝতে পারবেন।

আপনি অত হুজুর হুজুর করছেন কেন ? আপনার সব কথা শুনব, তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

জ্বি, আমার নাম হারুন। আমি প্রতিমাসে দশবার দিন নয়, চার পাঁচ দিন কামাই করি।

কামাই দিনের বেতন কি কেটে নেওয়া হয় ?

জ্বি, কিন্তু যতদিন কামাই করি, তার ডবল দিনের বেতন কেটে নেয়।

কেন আপনি প্রতি মাসে কামাই করেন ?

হুজুর, আমার মা বাপ, আমাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করবেন না।

আবার হুজুর হুজুর করছেন, যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দিন।

আমার বাড়ি হাতিয়া। সেখানে আমার বুড়ো মা অসুস্থ। আমার স্ত্রী তাকে দেখাশোনা করে। আমাদের কোনো সন্তান নেই। আর এমন কোনো আত্মীয় নেই, যে মায়ের ঔষধপত্র ডাক্তারের কাছ থেকে এনে দেবে। তাই প্রতি মাসে বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ বুড়ো মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আসতে হয়। মাহফিলে মৌলবীদের মুখে শুনেছি, উপযুক্ত ছেলে থাকতে যদি মা-বাপ কষ্ট পায়, তা হলে আল্লাহ তাকে মাফ করেন না। আমি আল্লাহ আদেশ পালন করার জন্য কাজ কামাই করে প্রতিমাসে মায়ের সেবা করতে যাই। এখন আপনি যদি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন; তা হলে আমার মায়ের চিকিৎসা করা খুবই অসুবিধে হবে। সামান্য যেটুকু জমি আছে, তাতে

একবেলা একসন্ধ্যে করে চলে যায়। কিন্তু মাকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা। টাকা পয়সার অভাবে শহরে এনে চিকিৎসা করাতে পারছি না বলে খুব অশান্তিতে আছি।

সেলিম বলল, আপনার কথা কি সত্যি ?

হারুন জীব কেটে "তওবা আসতাগফেরুল্লাহ" পড়ে বলল, কি যে বলেন সাহেব, আমি অশিক্ষিত হতে পারি; কিন্তু আলেমদের মুখে শুনেছি, যে মিথ্যা বলে তার ঈমান থাকে না। আবার কলমা পড়ে ঈমান আনতে হয়। আমি গরিব হতে পারি; কিন্তু মিথ্যাবাদী নই।

সেলিম একজন অশিক্ষিত শ্রমিকের মুখে মাতৃভক্তি ও ধর্মের কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, আমি আপনার কাছ থেকে অনেক জ্ঞান পেয়ে আপনাকে ওস্তাদের আসনে বসালাম। আর এই নিন বলে একশত টাকার পাঁচখানা নোট মানি ব্যাগ থেকে বের করে তার দিকে বাড়িয়ে বলল, এটা আমি আমার ওস্তাদের নজরানা দিলাম। আপনি এই টাকা দিয়ে আপনার মাকে এখানে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করে দিন। তার যাবতীয় খরচ আমি দেব। তারপর বেয়ারাকে লেবার অফিসারকে ডাকতে বললেন।

সেলিমের কথা শুনে হারুন পাথরের মত জমে গেল। চিন্তা করল, সে জেগে আছে, না স্বপ্ন দেখছে ? নিজের কান ও চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। কোথায় তার চাকুরি বরখাস্ত হওয়ার কথা, আর কোথায় এতসব কাণ্ড ?

তাকে অবাক হয়ে চুপ করে থাকতে দেখে সেলিম বলল, নিন, টাকাটা পকেটে রাখুন।

নিজের অজান্তে কম্পিত হাতে হারুন টাকাটা নিয়ে পকেটে রাখল।

একটু পরে লেবার অফিসার এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ডেকেছেন স্যার ? তারপর হারুনকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে রেগেমেগে বলে উঠলেন, এই ব্যাটা উঠ, তোর সাহস তো কম না, সাহেবের সামনে তুই চেয়ারে বসে রয়েছিস। লেবার অফিসারের নাম মামুন।

হারুনকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সেলিম বলল, আপনারা দু'জনেই বসুন। তারপর বললেন, আচ্ছা মামুন সাহেব, আপনি নিজেকে কি ভাবেন ?

হঠাৎ এরকম প্রশ্নের জন্য মামুন সাহেব প্রস্তুত ছিলেন না। আমতা আমতা করে বললেন, কেন স্যার ? কিছু অন্যায় করে ফেলেছি কি ?

আপনি অন্যায় করেছেন কি না তা আমি জিজ্ঞেস করিনি, যা জিজ্ঞেস করেছি তার উত্তর দিন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মামুন সাহেব বললেন, দেখুন স্যার।

আপনি স্যার স্যার করছেন কেন ? আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

না স্যার, নিজেকে আর কি ভাববো ? তবে ওদেরকে বেশি প্রশ্রয় দিলে মাথায় উঠে যায়। তখন শত চেষ্টা করেও নামান যাবে না।

চুপ করুন, আমি এদের কথা জিজ্ঞেস করিনি, করেছি আপনার কথা।

মামুন সাহেব কি উত্তর দিবে ঠিক করতে না পেরে চুপ করে বসে রইলেন।

সেলিম বলল, মামুন সাহেব, আমাদের প্রত্যেকের জানা উচিত, আমরা আল্লাহ-পাকের সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম ও সব থেকে প্রিয়। তার প্রধান কারণ হল, তিনি মানুষকে বিবেক বলে একটা অমূল্য জিনিষ দান করেছেন। যা অন্য কোনো সৃষ্টকে দেন নি। আমরা সেই শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম বিবেক সম্পন্ন জীব হয়ে একে অন্যকে ঘৃণা করি, নিজেকে বড় মনে করি। এর কারণ কি জানেন ? অহমিকা ও অজ্ঞতা। এইগুলোই মানুষকে বিভিন্ন গোত্রে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। আর একই কারণের বশবর্তী হয়ে বিবেক বিসর্জন দিয়ে আমরা একে অন্যের

প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করি। অথচ আল্লাহপাক বলিয়াছেন, "এক মুমীন অন্য মুমীনের ভাই।"[১] আর আমাদের নবী (দঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম।"[২] তাঁর দরবারে ধনী দরিদ্রের কোনো তফাৎ নেই। যে কেউ তাঁকে ভয় করে আদর্শ চরিত্রবান হবে, সেই তাঁর কাছে উচ্চ আসন পাবে। তাঁর রাসূল (দঃ) হাদিসে বলেছেন "মানুষকে ঘৃণা করো না, পাপীকে ঘৃণা করো না, বরং পাপকে ঘৃণা করবে।" যাই হোক, এই লোকটার বেতন সামনের মাস থেকে একশত টাকা বাড়িয়ে দেবেন। আর উনি যখন ছুটির দরখাস্ত করবেন, মঞ্জুর করবেন। শুধু ইনার কেন, যে কোনো লোকের আবেদন সরাসরি আমাকে জানাবেন। আমাকে না জানিয়ে নিজে কিছু করবেন না। যদি কেউ ফাঁকি দেয়, কিংবা অন্যায় আচরণ করে, সে দিকে কড়া নজর রাখবেন। আমার কথায় আপনি রাগ বা মনে কষ্ট নেবেন না। আপনার ক্ষমতা কমানো হল না, যেমন আছে তেমনি থাকবে। শুধু কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমার পরামর্শ নেবেন। যান, এবার আপনারা আসুন।

ফেরার পথে হারুন মনে করল, এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। সে ছোট সাহেবের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগল। আর লেবার অফিসার মামুন সাহেব আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, এর আগে তো কতবার ছোট সাহেবকে দেখেছি, তখন তো তাকে ধার্মিক বলে মনে হয়নি ? তিনি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন না। আর এ ব্যাটা হারুনটাই বা কি বলল কি জানি ? বড় সাহেব তো ধর্মের নামে জ্বলে উঠতেন। তারই ছেলে হয়ে ছোট সাহেব কেমন করে ধার্মিক বনে গেল ?

যোহরের আযান ভেসে আসতে সেলিম নামায পড়ার জন্য মসজিদে রওয়ানা হল। সে সমস্ত মিলে ও অফিসে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে, নামাযের সময় সব কিছু বন্ধ রেখে যেন সবাই মসজিদে নামায পড়তে যায়। নোটিশ পেয়ে নামাযীরা খুব খুশি হল। বেনামাযীরা খুশি না হলেও সেই সময়টা ক্যান্টিনে আড্ডা জমায়। সেলিম আজ পনের দিন হল নামায ধরেছে। এরই মধ্যে অফিসে সকলের জন্য পাঠাগার করেছে। সেখানে সব ধরনের বই আছে। তবে ইসলামিক বই-এর সংখ্যা বেশি। অবসর সময়ে সেও ইসলামিক বই পড়ে। কিছুদিন আগে সে বায়তুল মোকাররমে কি একটা জিনিস কিনতে গিয়েছিল। সে দিন ছিল জুম্মার দিন। দলে দলে টুপি পরা লোকদের মসজিদে ঢুকতে দেখে তার লাইলীর কথা মনে পড়ল। অনেক বোরখাপরা মেয়েকেও নামায পড়তে যেতে দেখে একজন মুসুল্লীকে জিজ্ঞেস করল, এখানে মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে নামায পড়ে ? লোকটা কয়েক সেকেণ্ড তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। এখানে মেয়েদের নামায পড়ার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। সেলিমেরও মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার খুব ইচ্ছা হল। কিন্তু কি ভেবে গেল না। আজ পর্যন্ত সে বায়তুল মোকাররমে কোনোদিন ঢুকেনি। শুধু দূর থেকে তার সৌন্দর্য উপভোগ করেছে। ঐ দিনই ইসলামি ফাউণ্ডেশন থেকে ইসলামিক অনেক বই কিনে আনে। তারপর নামায ধরেছে। ইসলামিক বই যত পড়তে লাগল তত ধর্মের প্রতি তার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মাতে লাগল এবং ধর্মের আইন মেনে চলার প্রেরণা পেল। সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাতের সঙ্গে পড়ে। বাড়িতে এখনো পড়েনি। তাই বাড়িতে কেউ এখনও জানেনি যে, সে নামায পড়ে।

একদিন ম্যানেজার সাহেব সোহানা বেগমকে বললেন, ছোট সাহেবের মধ্যে

---

(১) সূরা-হুজুরাত, ১০ নং-আয়াত, পারা-২৬।

(২) বর্ণনায়, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)- বোখারী ও মুসলিম।

আমরা অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। সে ক্রমশঃ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ম্যানেজার সাহেব প্রবীণ ব্যক্তি। মিলের জন্মদিন থেকে এই পদে আছেন। তিনি সেলিমকে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন। তার অনেক আব্দার সাহেবের অগোচরে পূরণ করেছেন। তাই তাকে তিনি ছেলের মত সম্বন্ধ করে থাকেন।

কথাটা শুনে সোহানা বেগমের নারী হৃদয় আনন্দে ভরে গেল। আর সেই সঙ্গে আরিফের কথা মনে পড়ল। সেও আজ কত বছর এই ধর্মের জ্ঞানলাভ করার জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে।

সোহানা বেগমকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যানেজার আবার বললেন, ছোট সাহেবকে আর সাহেব বলে চেনা যায় না। মিলের ছোট-বড় সকলের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করে; দেখে মনে হয় সেও যেন তাদেরই একজন।

সোহানা বেগম বললেন, আপনি তার গার্জেনের মত, কিছু বলেননি কেন ?

বলিনি মানে ? একদিন আমরা পাঁচ ছয়জন ছোট সাহেবকে এসব না করার জন্য বোঝাতে গেলাম। যেমনি দু-একটা কথা বলেছি, অমনি তার উত্তরে এমন সব হাদিস কালাম শুনিয়ে উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকেই বুঝিয়ে দিল যে, আমরা আর কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না।

সোহানা বেগম বললেন, ঠিক আছে, আপনি আসুন। আমি সময় মতো ওকে সবকিছু বুঝিয়ে বলব।

এদিকে ছোট সাহেবের পরিবর্তন মিলের ও অফিসের সকলের চোখে ধরা পড়ল। ছোট সাহেবকে তারা যেমন যমের মত ভয় করে, তেমনি পীরের মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। ছুটির পর এবং ছুটির দিন সেলিম শ্রমিক কলোনিতে ঘুরে ঘুরে ছোট-বড় সকলের খোঁজ-খবর নেয়। কারও কোনো অভিযোগ থাকলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। তাদের অসুখে-বিসুখে নিজের টাকায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। সেলিমের এই সব দেখে বেশির ভাগ লোক বলাবলি করে, কি লোকের ছেলে কি হয়েছে। তারা আরও বলতে লাগল, ইনি নিশ্চয়ই অলি আল্লাহ ধরনের লোক হবেন। একদিন তারা মসজিদের ইমাম সাহেবকে ছোট সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করল। উনি বললেন, আল্লাহপাক যাকে হেদায়েৎ করেন, তাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। মনে হয়, উনি কোনো পরশ পাথরের সংস্পর্শে গেছেন।

ক্রমশঃ মিল-কারখানার শ্রমিকরা সেলিমকে অলি আল্লাহ ভাবতে লাগল। তারা তার সম্মানে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করতে লাগল। এবছর অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি মুনাফা হল।

রমজানের এক সপ্তাহ আগে সেলিম মায়ের অনুমতি নিয়ে বোর্ডের সব মেম্বরদের বোনাসের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সকলকে একদিন বিকেলে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল। সেদিন ছুটির দিন। কাজের ব্যস্ততার জন্য বেশ কিছুদিন সেলিম লাইলীর খোঁজ-খবর নিতে পারেনি। আজ অবসর পেয়ে লাইলীদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বেলা তিনটের দিকে গাড়ি নিয়ে বেরুল।

সোহানা বেগম ছেলেকে অসময়ে বেরোতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এখন আবার কোথায় যাচ্ছিস ? বিকালে বোর্ডের মিটিং বসবে ?

তুমি কিছু ভেবো না মা, আমি ঠিক সময় মত ফিরে আসব বলে সেলিম চলে গেল।

এদিকে লাইলী সেলিমের অনেকদিন খোঁজ খবর না পেয়ে খুব চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে। তারও পরীক্ষা হয়ে গেছে। ভাবল, এতদিন হয়ে গেল তার খোঁজ নিচ্ছে না কেন ? সে পুরুষ, তার তো উচিত আমার খোঁজ নেওয়া। একবার তাদের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু লজ্জা এসে তাকে বাধা দিয়েছে। কোনো কিছুতেই তার

মন বসছিল না।

আজ রহিমা ভাবি তার মনমরা দেখে জিজ্ঞেস করল, কিগো সখি, মুখে হাসি নেই কেন ? সখা বিনে দিন দিন যে শুকিয়ে যাচ্ছ ? বলি এখন যদি এত ? বিয়ের পরে যে কি করবে, তা উপরের মালিকই জানেন।

লাইলী কপট রাগ দেখিয়ে বলল, তোমার শুধু ঐ এক কথা। মানুষের মন তো আর সব সময় এক রকম থাকে না। নানান কারণে সেটা খারাপ হতে পারে।

তা হতে পারে, তবে আমি যে কারণটা বললাম, সেটাই কিন্তু আসল কারণ। কী ঠিক বলিনি ?

তুমি তো দেখছি ভবিষ্যৎ বক্তা হয়ে গেছ ?

তা একটু আধটু হচ্ছি বই কি ?

তা হলে বলতো দেখি, সেলিম সাহেবের এতদিন খোঁজ-খবর নেই কেন ?

রহিমা প্রথমে হেসে ফেলে বলল, ঠিক জায়গা মত তা হলে কোপটা পড়েছে ? তারপর কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে গম্ভীর হয়ে বলল, তিনি হয়তো কোনো কাজে আটকা পড়েছেন। সময় পেলেই তার প্রিয়ার খোঁজে ছুটে আসবেন। রহিমার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কলিং বেল বেজে উঠতে দু'জনই চমকে উঠল। রহিমা বলল, এই রে, এ যে দেখছি সেলিম সাহেবের বেল বাজাবার কায়দা।

লাইলীও সেটা বুঝতে পেরেছে। সে লজ্জা পেয়ে কি করবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে চুপ করে বসে রইল।

কি হল বসে রইলে কেন ? যাও ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস। দরজা না খুলে দিলে বাড়িতে কি করে ঢুকবে ? কেউ নেই মনে করে যদি ফিরে যান, তা হলে তো তখন তোমার আফশোসের সীমা থাকবে না।

কথাটি সূচের মত লাইলীর বুকে বিধল। সে তাড়াতাড়ি উঠে গেটের দিকে গেল। ততক্ষণে আবার বেলটা বেজে উঠল। লাইলী দরজার ছিদ্র দিয়ে সেলিমকে দেখে খুলে দিল।

সেলিম লাইলীকে দেখে প্রথমেই সালাম দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ ?

সেলিমকে সালাম দিতে দেখে খুব অবাক হলেও লাইলী সালামের জবাব দিয়ে বলল, "আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। এস, ভিতরে এস, তুমি কেমন আছ ?

সেলিম তখন আর লাইলীর কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না। এতদিন পর তার প্রিয়তমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। তার মনে হল, লাইলীকে অনেক বছর দেখেনি। বহুদিন পর তার প্রাণ শীতল হল।

সেলিমকে চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে লাইলী বলল, ভিতরে এস না ? এখানে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে ভাববে কি ? তবুও সেলিমের সাড়া না পেয়ে গেটের কড়াটা জোরে নাড়া দিয়ে বলল, এই যে মশাই শুনছেন ? লোকের বাড়িতে এসে এভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা অভদ্রতার লক্ষণ।

কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে সেলিম চমকে উঠল। তারপর ভিতরে ঢুকল। লাইলী গেট বন্ধ করে সেলিমকে নিয়ে এসে ড্রইংরুমে দু'জন বসল। প্রথমে লাইলী বলল, এতদিন খবর না পেয়ে ভেবেছিলুম, তোমার কোনো অসুখ-বিসুখ হল কি না। আল্লাহ পাকের দরবারে লাখলাখ শুকরিয়া জানাই, তিনি তোমাকে সুস্থ রেখেছেন। বাড়ির সবাই ভালো আছে ?

সেলিম বলল, হ্যাঁ, সকলে ভালো আছে। অফিসের কাজে এই কয়েকদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। এবারতো আমাকেই সব কিছু দেখাশোনা করতে হচ্ছে।

তুমি একটু বস, আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসি বলে লাইলী যাওয়ার উপক্রম করলে সেলিম আতঙ্কিত স্বরে বলল, যেও না প্লীজ।

লাইলী কাছে এসে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, আজ তোমার কি হয়েছে বলতো ? তোমাকে যেন একটু এ্যাবনরম্যাল লাগছে।

সেলিম তার হাত ধরে সামনে চেয়ারে বসিয়ে বলল, তোমাকে দেখার আগে পর্যন্ত আমি নরম্যাল ছিলাম। তোমাকে দেখার পর থেকে এ্যাবনরমাল হয়ে গেছি। আমার ব্রেনটা যেন ঠিকমত কাজ করছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, তোমাকে অনেক দিনের জন্য হারিয়ে ফেলব। আমার চা-টা লাগবে না, তুমি চুপ করে বস। আর আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমাকে দেখে তৃপ্ত হই।

লাইলী অভিমান ভরা কণ্ঠে বলল, এতদিন দেখার ইচ্ছে হয়নি বুঝি ? এদিকে এই হতভাগী তোমার চিন্তায় অস্থির। ছেলেদের জান বড় শক্ত। শেষের দিকের কথাগুলো ভারী হয়ে এল।

সে জন্য মাফ চাইছি বলে সেলিম দু'হাত জোড়া করল।

হয়েছে, হয়েছে বলে লাইলী স্মিত হাস্যে বলল, দু'মিনিট অপেক্ষা কর, আমি আসছি। সেলিমকে মাথা নাড়তে দেখে লাইলী আবার বলল, বা রে, আমি কি হারিয়ে যাচ্ছি ? তুমি কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে এলে, আর আমি তোমাকে এক কাপ চা দিয়েও আপ্যায়ন করাব না ? আমরা গরিব তাই বলে মেহমানের যত্ন নেব না ?

সেলিম বলল, তুমি বড়লোকের ছেলের সঙ্গে প্রেম করেও তাদেরকে হুল ফোটাতে ছাড় না। এক এক সময় ইচ্ছা হয়, সব কিছু ত্যাগ করে চিরকালের জন্য তোমার কাছে চলে আসি।

লাইলী সেলিমের কাতর উক্তি শুনে নিজের ভুল বুঝতে পারল। বলল, তুমি মনে এত বড় আঘাত পাবে জানলে কথাটা বলতাম না। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। তারপর তার দু'টো হাত ধরে বলল, আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম, এভাবে তোমাকে আর কখনো বলব না। তুমিও প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনোদিন ঐরূপ চিন্তা করবে না। তারপর চোখের পানি গোপন করার জন্য মাথা নিচু করে নিল।

সেলিমও এতটা ভেবে বলেনি। লাইলী যেমন কথার ছলে বলেছে, সেও তেমনি বলেছে। লাইলীকে মাথা নিচু করে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, দু'জনেই কথাচ্ছলে বলেছি, এতে অন্যায় কারো হয়নি। হলেও সেম সাইড চার্জ, মামলা ডিসমিস। আমার দিকে তাকও তো ?

লাইলী ধীরে ধীরে চোখভরা আঁশু নিয়ে তার দিকে চাইল।

এত সামান্য কথায় তার চোখে আঁশু দেখে সেলিম অবাক হয়ে লাইলীর ডাগর ডাগর পটলচেরা চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

লাইলী নিজেকে সামলে নিয়ে আঁচলে চোখ মুছে বলল, আমাকে একটু যাওয়ার অনুমতি দাও বলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেলিম আবার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, তুমি চা আনতে যাবে তো ? আমি ওসব ফরমালিটি পছন্দ করি না।

তা হলে তুমি কি পছন্দ কর ?

পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্যের বদলে তোমাকে কাছে পেতে চাই।

সেলিমের কথাগুলো ঠিক যেন কেউ লাইলীর মুখে একরাশ আবীর ছড়িয়ে দিল। সে কয়েক সেকেণ্ড লজ্জায় কথা বলতে পারল না। তারপর ধীরে ধীরে তার দিকে চোখ তুলে বলল, প্লীজ সেলিম, কথাগুলো একটু আস্তে বল, ভাবি

হয়তো সব শুনতে পাচ্ছে।

সেলিম বলল, প্রতিদিন শুধু তোমার মুখে ভাবির কথা শুনি। কিন্তু সেই পূণ্যবতী নারীকে কোনোদিন দেখার সৌভাগ্য হল না। তুমি তাকে বলো, তিনি আমার বড় বোনের মত। এই অধম গোনাহগার ভাইয়ের কাছে কী আসতে পারেন না ?

রহিমা এতক্ষণ পর্দার আড়াল থেকে তাদের কথোপকথন শুনছিল। আর থাকতে পারল না, দরজার পর্দা সরিয়ে বলল, আসতে পারি

লাইলী ফিস ফিস করে বলল, ভাবি।

সেলিম দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বলল, আসুন ভাবি আসুন। তারপর সে এগিয়ে গিয়ে রহিমার পায়ের কাছে বসে কদমবুসি করে বলল, আমাকে ছোট ভাই মনে করলে কৃতার্থ হব।

রহিমা এতটা ভাবেনি। একটু থতমত খেয়ে গেল। তার কোনো ভাই নেই। তারা তিন বোন। তার মনটা আনন্দে ভরে গেল। মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে বলল, উঠে বস ভাই। খুব খুশি হয়ে তোমাকে ভাই বলে গ্রহণ করলাম। আমাদের কোনো ভাই নেই। তারপর তোমরা গল্প কর, আমি চা তৈরী করে নিয়ে আসি।

রহিমা চলে যাওয়ার পর তারা দু'জন দু'জনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। লাইলী মিষ্টি ভৎর্সনা করে বলল, এই কি হচ্ছে ? ভাবি এসে দেখলে কি মনে করবে বল তো ?

সেলিম বলল, যা মনে করার তা তো অনেক আগেই করে ফেলেছে। এখন আর নূতন করে কি ভাববে ? সত্যি ভাবি যে কত ভালো, তা আজ বুঝতে পারলাম। চল একটু বেড়িয়ে আসি। পরীক্ষার পড়ার তো আর তাড়া নেই ? তাকে চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, কী চাচী আম্মার বকুনীর ভয় হচ্ছে বুঝি ?

কয়েক সেকেণ্ড মাথা নিচু করে থেকে যখন লাইলী তার হরিণীর মত চোখ নিয়ে সেলিমের দিকে তাকাল তখন তার চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

সেলিম তাকে কাঁদতে দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমি তো একটু রসিকতা করলাম। এতে তুমি কাঁদবে জানলে বলতাম না। ঠিক আছে, আমি আমার কথা উইথড্র করে নিচ্ছি। প্লীজ চোখ মুছে ফেল।

লাইলী আঁচলে চোখ মুছে বলল, এই হতভাগীকে যে তুমি অত ভালবাস, সেটা কি আমার কপালে সইবে ?

রহিমা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকে লাইলীর কথা শুনে বলল, আরে ভাই কপালে কি লেখা আছে না আছে, তা যিনি লিখেছেন তিনিই জানেন। ওসব নিয়ে অত চিন্তা করে কাজ নেই। মানুষ বর্তমানকে নিয়ে বেঁচে থাকে। প্রত্যেক মানুষের উচিত তাঁর উপর নির্ভর করে যখন যে অবস্থায় তিনি রাখেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। তাই দুঃখ হোক আর সুখ হোক। সেটা তাঁরই নির্দেশ বুঝেছ ? নাও, এখন চিন্তা বাদ দিয়ে চা খেয়ে দু'জনে একটু বেড়িয়ে এস।

লাইলী লজ্জারাঙা চোখে ভাবির দিকে চেয়ে বলল, আম্মাকে কি বলে যাব ?

সে চিন্তাও বাদ দাও, আমি খালা আম্মাকে বলবখন।

বারে, আম্মাকে বলে যেতে হবে না ?

বেশতো বলেই যাও।

কি বলে যাব ?

যা সত্য তাই বলবে, তুমি তো মিথ্যা বলবে না। সত্য পথে চললে বাধা বিঘ্ন তো আসবেই। তুমি বলত ভাই, ঠিক বলছি কিনা বলে রহিমা সেলিমের

দিকে চাইল।

সেলিম কোনো কথা না বলে মিটি মিটি হাসতে লাগল।

লাইলী চা খেয়ে কাপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে এক্ষুণি আসছি বলে উপরে চলে গেল।

রহিমা চায়ের কাপ ও পিরীচগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় বলল, আমার সখীর জন্য একা একা একটু অপেক্ষা কর ভাই।

লাইলী একটা গ্রীন রং-এর শাড়ী ও ব্লাউজ পরে তার উপর বোরখা চড়িয়ে রহমান সাহেবের কাছে গিয়ে বলল, আব্বা, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

রহমান সাহেবের হার্টের অসুখটা ক'দিন থেকে বেড়েছে। তিনি এই ক'দিন অফিসে যেতে পারেননি, শুয়েছিলেন। বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি।

স্ত্রী হামিদা বানু স্বামীর পাশে বশে বুকে তেল মালিশ করছিলেন। লাইলী বেরিয়ে যাওয়ার পর বললেন, মেয়ে কোথায় কার সাথে গেল, জিজ্ঞেস করলে না যে ?

রহমান সাহেব বললেন, ছেলেমানুষ পরীক্ষার পর একটু কোথাও বেড়াতে যাবে হয়তো, তাতে অত দোষ মনে করছ কেন ?

মেয়ে বড় হয়েছে সেদিকে খেয়াল করেছ ? তুমিই তো কিছু না বলে দিন দিন ওর সাহস বাড়িয়ে দিচ্ছ।

লাইলী নিচে এসে দেখল, সেলিম একা বসে আছে। বলল, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু, আব্বার শরীর ভালো নেই।

সেলিম বলল, চাচাজানের কি হয়েছে ? আমাকে এতক্ষণ বলনি কেন চল তাকে দেখব।

এস বলে লাইলী আগে আগে উপরে গিয়ে তাকে বারান্দায় একটু অপেক্ষা করতে বলে ঘরে ঢুকে বলল, মা তুমি ওঘরে যাও। সেলিম এসেছে আব্বাকে দেখতে।

হামিদা বানু তাড়াতাড়ি উঠে ভিতরের দরজা দিয়ে পাশের রুমে চলে গেলেন।

লাইলী দরজার কাছে এসে সেলিমকে ভিতরে আসতে বলল।

সেলিম ঘরে ঢুকে সালাম দিয়ে বলল, "চাচাজান আপনার কি হয়েছে ?"

রহমান সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আমার বরাবর হার্টের অসুখ আছে। মাঝে মাঝে বেশ ট্রাবল দেয়। দু'চারদিন রেষ্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে। তা বাবা তোমাদের বাড়ির সব খবর ভালো তো ?

সেলিম হ্যাঁ বলে জিজ্ঞেস করল, কোনো বড় ডাক্তারকে দেখান না কেন ?

রহমান সাহেব বললেন, আমাদের অফিসের বড় ডাক্তার দেখছেন। এখন একটু ভালো আছি। লাইলী তোমার সঙ্গে বুঝি বাইরে কোথায় যাচ্ছিল ? তোমাকে দু' একটা কথা বলব বাবা, মনে আবার কষ্ট নিও না যেন। আব্বা কি কথা বলবে বুঝতে পেরে লাইলী সকলের অলক্ষ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেলিম বলল, আপনি কি বলবেন বলুন, কিছু মনে করব না। আমি আপনার ছেলের মত। যদি অন্যায় কিছু করি, তা হলে গার্জেনের মত নিশ্চয় বলবেন।

রহমান সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমরা গরিব, আমাদের তো কিছুই নেই বাবা। যতটুকু আছে তা হল ইজ্জত। জ্ঞাতি শত্রু কম বেশি সকলেরই থাকে, আমারও আছে। তুমি বড় লোকের ছেলে। গাড়ি করে আমাদের বাড়ি আস এবং লাইলীর সঙ্গে তোমার খুব জানাশোনা, সেটা এরই মধ্যে পাড়াতে কানাঘুষো চলছে। আমার তো ঐ একটি মাত্র মেয়ে। তা ছাড়া আল্লাহপাকও বেগানা জোয়ান ছেলে মেয়েদের এক সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন। তুমি শিক্ষিত ছেলে, অল্প কথায় সব কিছু নিশ্চয় বুঝতে পারছ ? আমার মেয়ের নামে দুর্নাম রটলে আমি

তার বিয়ে দিতে পারব না। আর পাঁচজনের কাছে মুখও দেখাতে পারব না। এই দেখ, মনের খেয়ালে তোমাকে কত কথা শুনিয়ে দিলাম।

সেলিম বলল, না-না চাচাজান, আপনি ঠিক কথা বলেছেন। আপনার কথায় আমার মনে কোনো কষ্ট হয়নি। বরং আপনার এই সর্তকবাণী আমার জ্ঞানের চোখ খুলে দিয়েছে। আপনাকে বলতে আমার কোনো বাধা নেই, আপনারা কি মনে করবেন জানি না, আমি লাইলীকে বিয়ে করতে চাই। কথাটা নির্লজ্জার মত আমিই বলে ফেললাম। ইচ্ছা ছিল, আমার মাকে দিয়ে বলাব। আপনি অসুস্থতার মধ্যে দুঃশ্চিন্তায় থাকবেন, তাই বললাম। ভাববেন না, এটা বড় লোকের ছেলের খামখেয়ালী। আমি আল্লাহপাকের কসম খেয়ে বলছি, তিনি রাজি থাকলে কেউ আমার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারবে না। এখন আমি বেশি কিছু বলতে চাই না। যা কিছু বলার আমার মা এসে বলবেন। অবশ্য মাকে এ পর্যন্ত আমি কিছুই জানাইনি। তবে যতদূর আমি আমার মাকে জানি, তিনি এই কাজে অমত করবেন না। আর যদি একান্ত রাজি না হন, তা হলে আমি সবকিছু ত্যাগ করে হলেও আমার সত্যকে মিথ্যা হতে দেব না।

রহমান সাহেব বললেন, তুমি আমাকে অনেক দুঃশ্চিন্তা থেকে বাঁচালে বাবা। আল্লাহ তোমার মনের নেক মকসুদ পুরা করুন। তবে বাবা জেনে রেখ, বিয়ে সাদি তক্বদিরে লেখা থাকে। আল্লাহ যার সঙ্গে যার জোড়া তৈরি করে রেখেছেন, তার সঙ্গে তা হবেই। কেউ আটকাতে পারবে না।

লাইলী বারান্দা থেকে এবং তার মা পাশের রুম থেকে তাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। লাইলী সব শুনে খুব লজ্জা পেয়ে চিন্তা করতে লাগল, এরপর সেলিমের সঙ্গে বেড়াতে যাব কি করে ? আর তার মা ভাবছিলেন, কোটিপতির ছেলেকে কি সত্যি জামাই হিসেবে পাব ? মেয়ের কপালে কি অত সুখ আছে ?

একটু পরে সেলিম রহমান সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে লাইলীকে দেখতে পেয়ে বলল, চল নিচে গিয়ে আগে আসরের নামায পড়ে নিই, তারপর বেড়াতে যাব।

সেলিম নামায পড়বে শুনে লাইলী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, "আলহামাদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার।) তাঁর দরবারে জানাই কোটি কোটি শুকরিয়া, যিনি অধম বান্দীর দোয়া কবুল করেছেন। ততক্ষণ তার চোখ দিয়ে আনন্দে অশ্রু পড়তে শুরু করেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সেলিম বলল, তুমি অধম হলে তোমার দোয়া কবুল হত না। তুমি তাঁর প্রিয় বান্দী। তাইতো তিনি তোমার দোয়া কবুল করেছেন।

ড্রইংরুমে সেলিমের নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে লাইলী ভাবির সঙ্গে নামায পড়ে নিল। তারপর সেলিমের কাছে এসে বলল, চল কোথায় বেড়াতে যাবে বলছিলে।

সেলিম বলল, এখানে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পাঁচটার পর আমাদের বাড়িতে বোর্ডের মিটিং আছে। সন্ধ্যার পরে সেই উপলক্ষে একটা ফাংশানও হবে। আমি তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই।

লাইলী বলল, বেশতো চল। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব।

রহিমা আসরের নামায পড়ে লাইলীর কাছে সেলিম ও খালুজানের সব কথা শুনেছে। সেও খুব খুশি হয়ে ড্রইংরুমে ঢুকে হাসতে হাসতে বলল, কি ভাই, দিল্লী এখন দূরে, না কাছে ?

লাইলী ভাবির গাল টিপে দিয়ে বলল, অ্যাভি ভি দূর হ্যায়, (এখনও অনেক দূরে)।

সেলিম বলল, ভাবি, আমি লাইলীকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি, রাত্রে দিয়ে যাব। আপনিও চলুন না ওর সঙ্গে, মা আপনাকে দেখে খুব খুশি হবেন।

রহিমা বলল, তোমার দুলাভাই এর অনুমতি না নিয়ে তো আমি কোথাও যেতে পারি না, অনুমতি নিয়ে অন্য একদিন না হয় যাব।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সেলিম জিজ্ঞেস করল, বেড়াতে যাওয়ার কথা বলতে তোমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল কেন ?

লাইলী বলল, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করে তোমাকে নামায পড়ার তওফিক দিয়েছেন জেনে আনন্দে চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আজ কিন্তু আমি তোমাদের ফাংশানে কিছু গাইতে পারব না, সে কথা এখন থেকে বলে রাখছি। সেদিনের কথা মনে হলে আজও আমার যে কি হয়, তা বলতে পারছি না।

সেলিম বলল, সেদিন রেহানা তোমাকে অপমান করার জন্য গাইতে বলেছিল। আজ আর হয়তো সে কিছু বলবে না। তবে যাই বল তোমার গলা কিন্তু অদ্ভুত। আমি তো তোমার গলা শোনার জন্য সেই থেকে পাগল হয়ে আছি। আজও একটা গজল গেয়ে শোনাবে ?

লাইলী জোড়হাত করে বলল, মাফ কর। অত লোকের সামনে আমি কিছুতেই গজল গাইতে পারব না।

তা হলে আমার মনের বাসনা মনেই থেকে যাবে ?

তোমাকে সময় মত একদিন শোনাব। প্লীজ, আমাকে আর কিছু বল না। তোমার কথা রাখতে না পারলে আমার বড় কষ্ট হয়।

সেলিম বলল, ঠিক আছে তাই হবে। পথে গাড়ি থামিয়ে নানারকম ফল ও মিষ্টি কিনল।

বাড়ি পৌঁছাতে রুবীনা বলল, তুমি এত দেরি করে ফিরলে কেন ? মা তোমাকে খুঁজছে। তারপর লাইলীর দিকে চেয়ে বলল, কেমন আছেন।

লাইলী বলল, ভালো আছি।

সেলিম লাইলীকে সঙ্গে করে একেবারে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, তুমি নাকি আমাকে খুঁজছিলে ?

সোহানা বেগম লাইলীকে দেখে খুশি হয়ে বলে উঠলেন, এদের বাড়িতে গিয়েছিলি বুঝি ? তারপর লাইলীকে বললেন, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। এখন মিটিং হবে এবং রাত্রে ফাংশান আছে। অফিসাররা সব এসে গেছেন। এস তো মা, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে।

সেলিম বলল মা, একটু ওঘরে চল, তোমাকে একটা কথা বলব।

কি কথা এখানেই বল না।

লাইলীর দিকে একবার আড় নয়নে চেয়ে সেলিম বলল, সব কথা কি সকলের সামনে বলা যায় ?

পাগল ছেলে, আচ্ছা চল বলে লাইলীকে বললেন, তুমি এখানে বস আমি আসছি। পাশের রুমে গিয়ে সেলিম মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কথাটা শুনে তুমি রাগ করবে না বল ?

আজ তোর কি হয়েছে বলতো ? ছাড় ছাড়, তোর কথায় আমি আবার কোনো-দিন রাগ করেছি ?

সেলিম মাকে ধরে রেখেই বলল, আমি লাইলীর বাবাকে আজ কথা দিয়ে এসেছি, ওকে আমি বিয়ে করব। তুমি হয়তো রেহানাকে আমার জন্য ঠিক করে রেখেছ ? তোমার মনে আঘাত দেওয়ার মোটেই আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছি রেহানাকে আমি সুখী করতে পারব না। আর লাইলীকে না পেলে আমিও সুখী হতে পারব না।

সোহানা বেগম ছেলেকে সামনে এনে বললেন, কথা দেওয়ার আগে মাকে তো

একবার জিজ্ঞেস করতে পারতিস ? যাক, যা হওয়ার হয়েছে। আর রেহানার ব্যাপারে দাদাকে একবার বলে ছিলাম। তোর সুখের জন্য না হয় দাদার কাছে থেকে কথাটা ফিরিয়ে নেব। এখন চল বোর্ডের মেম্বাররা সব তোর অপেক্ষায় বসে আছেন।

আসমা এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিল। সে সোহানা বেগমের খোঁজে এসে লাইলীকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কখন এলেন ? কেমন আছেন ?

লাইলী বলল, এইতো একটু আগে এসেছি। আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন

আল্লাহপাকের রহমতে খুব ভালো আছি ভাই। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না তো ?

না, কি বলবেন বলুন।

আপনি কি এদের আত্মীয়া ?

না, এরপরে যে প্রশ্ন করবেন, সেটার উত্তর সেলিম সাহেবের কাছ থেকে জেনে নেবেন।

আসমা বলল, সত্যি আল্লাহপাক আপনাকে যেমন রূপবতী করেছেন তেমনি বুদ্ধিমতীও করেছেন বলে হেসে ফেলল।

আপনার ছেলেকে দেখছি না যে, তার কি নাম রেখেছেন ?

সে আয়ার সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছে। দাদাই তার নাম রেখেছে রফিকুল ইসলাম।

মায়ের সাথে সেলিম এঘরে এসে লাইলীর সঙ্গে আসমাকে কথা বলতে দেখে জিজ্ঞেস করল, একে চিনতে পেরেছিস ?

আসমা বলল, হ্যাঁ, তুমি যেদিন আমাকে নিয়ে এলে সেদিন তো ইনিই তোমার সঙ্গে ছিলেন। আচ্ছা দাদা, ইনি আমাদের কে হন ? তুমি তো আজও পরিচয় করিয়ে দিলে না ?

সেলিম বলল, কেন ? তুই পরিচয় জেনে নিতে পারিস না।।

চেষ্টা তো করেছিলাম, প্রথম চান্সেই ফেল করেছি।

ফেল যখন করেছিস তখন মায়ের কাছ থেকে জেনে নিস।

সোহানা বেগম বললেন, একটু পরেই সবাই ওর পরিচয় জানতে পারবে। তারপর ওদেরকে এদিকের কাজ দেখতে বলে সেলিমকে সঙ্গে করে মিটিং রুমে এসে প্রবেশ করলেন।

সেলিম ঢুকেই "আসসালামু আলাইকুম" দিয়ে বলল, আমার আসতে একটু লেট হয়ে গেছে, সেই জন্য প্রথমে আপনাদের কাছে মাফ চাইছি।

মাতা পুত্রকে এক সঙ্গে আসতে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে দু'একজন সালামের উত্তর দিল।

সেলিম তাদের সবাইকে বসতে অনুরোধ করে বলল, আজকে আমরা শ্রমিকদের বোনাস, বেতন ও তাদের সুবিধা অসুবিধার ব্যাপারে আলোচনা করব। আপনারা সব প্রবীন ব্যক্তি। অনেকদিন থেকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে আসছেন। আমি যা কিছু বলব, তার মধ্যে ভুলত্রুটি হলে সুধরে দেবেন এবং প্রত্যেকে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করবেন। তারপর কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে সেলিম আবার বলতে শুরু করল, আপনাদের ন্যায়নিষ্ঠ ও পরিশ্রমের ফলে আমাদের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। অবশ্য এতে শ্রমিকদেরও দান রয়েছে। আমার মতে একজন কুলি থেকে আমরা যারা এখানে রয়েছি, সবাই শ্রমিক। শুধু আমাদের কাজ ভিন্ন। যাই হোক, আমি যা বলছিলাম, আমরা মানে মিল-কারখানার সমস্ত অফিসার ও শ্রমিকরা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছি বলে অন্যান্য বছরের চেয়ে এবছর দ্বিগুণ মুনাফা হয়েছে। আমি

এই অধিক মুনাফা থেকে দুমাসের বেতন ঈদের বোনাস হিসাবে এবং গ্রেড অনুযায়ী প্রত্যেকের বেতন বাড়িয়ে দিতে চাই। আর শ্রমিকদের ফ্রি চিকিৎসার জন্য মিল এলাকায় একটা হাসপাতাল করার মনস্থ করেছি। এখন আপনারা প্রত্যেকে নিজের মতামত প্রকাশ করে ঠিক করুন, কতটা কি করা যায়।

সেলিম থেমে যেতে সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। সোহানা বেগম প্রথমে বলে উঠলেন, প্রত্যেককে দুই মাসের বেতন বোনাস দিলে কত টাকা লাগবে তা হিসেব করে দেখেছ ?

সেলিম মায়ের দিকে চেয়ে বলল, যা লাভ হয়েছে তার একের আট অংশ।

সোহানা বেগম বললেন, আমি এতে রাজি। এবার আপনাদের মতামত বলুন।

ডাইরেক্টর আসাদ সাহেব বললেন, আপনারা মালিক হয়ে যখন খুশি মনে এসব দিচ্ছেন তখন আমরা তাতে অমত করব কেন ?

জেনারেল ম্যানেজার বসির সাহেব বললেন, কিন্তু যে বছর লোকসান যাবে, সে বছরের কথা চিন্তা করেছেন। তখন কত টাকা আসল থেকে বেরিয়ে যাবে ?

সেলিম বলল, আপনি ঠিক বলেছেন। আমি সে কথাও চিন্তা করে দেখেছি। লাভ-ক্ষতি নিয়ে ব্যবসা। কোনো বছর লাভ হবে। আবার কোনো বছর ক্ষতি হবে। আপনারা তা এত বছর কাজ করে আসছেন, কোনো বছর ক্ষতি হয়েছে কি ? হয় নি ? তবে লাভ কম বেশি হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (দঃ) বলেছেন "যে ব্যবসায় ক্ষতি ছাড়া শুধু লাভ হয়, সে ব্যবসা হারাম। যেমন সুদের ব্যবসা। এই ব্যবসায় লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। তাই এটা হারাম।" আমি মনে করি, শ্রমিকদের খুশি রাখলে তারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ করবে। আমরা যদি তাদের সব রকম সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখি, আর তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিই, আমার দৃঢ় ধারণা, তা হলে তারা কোনো দিন কাজে ফাঁকি দেবে না। বেশি পাওয়ার আশায় আরো বেশি পরিশ্রম করবে।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আসিফ সাহেব প্রবীণ ও ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি বললেন, আল্লাহপাক আপনাকে কামিয়াব করুন। আপনার কথা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আশা করি, আমার অন্যান্য সহকর্মী ভাইয়েরাও আপনাকে সমর্থন করবেন। ওঁর কথা শেষ হওয়ার পর সকলে সেলিমকে সমর্থন করলেন। তারপর সকলে মিলে আলোচনা করে মুসলমান অফিসার ও শ্রমিকদের জন্য দুই ঈদে দু'মাসের বেতন এবং হিন্দুদের জন্য পূজার সময় দু'মাসের বেতন বোনাস ও গ্রেড অনুযায়ী বেতন বাড়ানর এবং মিল এলাকায় আপাতত পঁচিশ বেডের একটা হাসপাতাল করার সিদ্ধান্ত নিল।

মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। সভা শেষ ঘোষণা করে সেলিম নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেল। মেম্বারদের মধ্যেও দু'জন গেলেন।

সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত মেহমানরা আসতে লাগল। রেহানাও তার মার সঙ্গে এসেছে। সেলিমের অনেক বন্ধু বান্ধবী এল। তারপর ছোট খাট গানের আসর হল। যারা সেবারে লাইলীর গজল শুনেছিল, তারা আজও একটা গজল গাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করল। লাইলী কিছুতেই সম্মত হল না। শেষে সবই সেলিমকে বলল, তোমাকে কিছু শোনাতে হবে। সেলিম সে জন্য প্রস্তুত ছিল। সে স্বরচিত একটা গান অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়ে গাইল-

তুমি সুন্দর তাইতো শুধু তোমার পানে চেয়ে থাকি,
তোমার নয়ন মনিতে দেখিতে পাই নিজের প্রতিচ্ছবি।
আমার হৃদয়ে তোমার স্মৃতি রয়েছে যে গো জড়িয়ে,
তাইতো তোমায় পুলকিত মনে চেয়ে দেখি বারে বারে।

লোকলজ্জা বাধা দিতে পারে নাকো হেন কাজে,
আমি যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি তোমারই মাঝে।
পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর,
সবারই কাছে হয় তা সমাদর।
কাউকে যদি সেই সুন্দর করে আকর্ষণ,
তা হলে কি তারে দুষিবারে পারে সর্বজন ?
যে যাই বলুক, মাশুক করে না কো দুর্ণামের ভয়,
শত বাধা ঠেলে সে তার সুন্দরকে পেতে চায়।
পৃথিবীতে এমন কত আশেক মাশুক আছে,
বাধা পেয়ে গেছে হারিয়ে নিষ্ঠুর সমাজের কাছে।
তাই মনে হয় মানুষ যদি মানুষের মত হত,
তা হলে তারা সুন্দরের মর্যাদা দিতে জানত।

সেলিম যখন গান গাইতে শুরু করে, তখন রেহানার ভাই মনিরুল এল। সেলিমের দৃষ্টি অনুসরণ করে সে লাইলীকে দেখে একেবারে এ্যসটোনিষ্ট হয়ে গেল। অন্য সব মেয়েদের দিকে চেয়ে আবার লাইলীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিন্তা করল, ওরা সব দামী দামী কাপড় পরে কত রকমের প্রসাধন মেখে সুন্দরী সেজেছে। আর লাইলীকে প্রসাধনহীন সাধারণ পোষাকে তাদের থেকে অনেক বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে। গানটা শুনে মনে মনে সেলিমকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না। সত্যি এরকম নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে বিরল। সে লাইলীর দিকে একাগ্রচিত্তে চেয়ে রইল।

গান শেষ হওয়ার পর হাত তালিতে ঘর ভরে উঠল। সবশেষে সোহানা বেগম সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে একটা আনন্দের খবর জানাচ্ছি। তারপর লাইলীর কাছে গিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে বললেন, এই যে মেয়েটিকে আপনারা দেখছেন, অনেকে একে চেনেন না। এ একজন সাধারণ ঘরের মেয়ে, ইসলামীকে হিষ্টীতে অনার্স পরীক্ষা দিয়েছে। এর নাম লাইলী। একে সেলিম পছন্দ করেছে বিয়ে করার জন্য। আমিও ছেলের পছন্দকে সমর্থন করি। আশা করি, আপনারাও সেলিমের পছন্দ করা মেয়েকে সমর্থন করবেন। কথা শেষ করে তিনি দু'গাছা সোনার বালা লাইলীর হাতে পরিয়ে দিয়ে সকলকে দোয়া করতে বললেন।

লাইলী ভীষণ লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে রইল। আর সবাই হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। অনেকে বলল, সেলিমের পছন্দকে বাহবা দিতে হয়। সেলিম খুব সুন্দর। তার বৌ তার থেকে আরও বেশি সুন্দরী। যারা এর আগে লাইলীকে দেখেনি, তারা তার রূপ দেখে নির্বাক হয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তারপর ডিনার পরিবেশন করা হল। বাইরের মেহমানরা বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর সোহানা বেগম দাদাকে ডেকে বললেন, রেহানাকে বৌ করব বলে মনে বড় সখ ছিল। সেইজন্য একদিন তোমাকে সেকথা বলেও ছিলাম। কিন্তু সেলিমকে কিছুতেই রাজি করাতে পারিনি। আমি তোমার ছোট বোন হয়ে আমার অপরাধের জন্য মাফ চাইছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও দাদা।

রেহানার বাবা জাহিদ সাহেব বললেন, এতে তোমার কোনো অপরাধ হয়নি। আজকাল শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা নিজেদের পছন্দ মত বিয়ে করে। তাই সেলিমকেও দোষ দেওয়া যায় না। তবে মেয়েটির বাবা কি করেন ? তাদের বংশ কেমন ? দেখা দরকার। তারপর তিনি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সোহানা বেগম লাইলীকে খাইয়ে দিয়ে সেলিমকে বললেন, ওকে এবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়। আর লাইলীকে বললেন, তোমার বাবা মাকে আমার সালাম

জানিয়ে বলো, আমি দুই একদিনের মধ্যে আসছি।

লাইলী সোহানা বেগমকে কদমবুছি করলে তিনি লাইলীর মুখে চুমো খেয়ে বললেন, সুখী ও দীর্ঘজীবি হও মা।

লাইলী সেলিমের পাশে বসেছে। সেলিম ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল, সেলিম নামে দুষ্টু ছেলেটার সাথে বিয়েতে মত আছে তো ? তোমার কোনো মতামত না নিয়েই তার মা তোমার সঙ্গে ছেলের বিয়ের কথা সবাইকে জানিয়ে দিলেন।

এমনিতেই লাইলী খুব লজ্জিত ছিল। তার উপর সেলিমের প্রশ্ন শুনে আরও বেশি লজ্জা পেয়ে কথা বলতে পারল না। কারণ আনন্দ আর লজ্জা তখন গলা টিপে ধরেছে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সেলিম আবার জিজ্ঞেস করল, আমার প্রশ্নে উত্তর দিলে না যে ?

লাইলী সেলিমের কাঁধে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে বলল, আমি তো অনেক আগেই সেই দুষ্টু ছেলেটার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। আবার ঐ সব প্রশ্ন করছ কেন ? আমার ভীষণ লজ্জা করছে।

সেলিম ডান হাত দিয়ে তার গলাটা আলতো করে টিপে দিয়ে বলল, লজ্জা মেয়েদের চিরচারিত ভুষণ। যে মেয়ের লজ্জা নেই, তাকে সেলিম পছন্দ করবে কেন ?

সেলিমের হাতের স্পর্শ পেয়ে লাইলী কারেন্ট সর্ট খাওয়ার মত কেঁপে উঠে ঐ অবস্থায় নিথর হয়ে বসে রইল।

লাইলীদের বাড়ির গেটে গাড়ি পার্ক করে সেলিম বলল, আবার কবে তোমাকে দেখতে পাব ?

লাইলী গাড়ি থেকে নেমে কলিং বেলে হাত রেখে বলল, যে দিন তুমি ইচ্ছা করবে।

জলিল সাহেব অফিস থেকে ফিরে সকালের দিকের ঘটনা শুনেছেন। তিনি গেট খুলে ওদের দুজনকে দেখতে পেলেন। সেলিমকে সালাম দিয়ে বললেন, কেমন আছেন ?

সেলিম সালামের উত্তর দিয়ে বলল, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ?

আল্লাহপাকের দয়াতে ভালো আছি। আসুন ভিতরে চলুন। ড্রইংরুমে এসে দুজনে বসল। লাইলী আগেই ভাইয়াকে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গেছে।

একটু পরে রহিমা তিন কাপ চা নিয়ে এসে লাইলীকে দেখতে না পেয়ে বলল, কই আমার ননদিনীকে দেখছি না কেন ?

জলিল সাহেব বললেন, ও গেট দিয়ে ঢুকেই পালিয়ে গেছে। চা পান শেষ করে সেলিম বিদায় নিয়ে ফিরে গেল।

রহমান সাহেব ও হামিদা বানু এত রাত পর্যন্ত লাইলী ফিরে আসছে না দেখে খুব চিন্তিত ছিলেন। মেয়েকে দেখে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন। লাইলীকে ডেকে রহমান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, এত রাত হল কেন মা ? আমরা এদিকে ভেবে মরছি।

লাইলী বালা পরা হাত দুটো দেখিয়ে লজ্জা রাঙা হয়ে বলল, ওর আম্মা পরিয়ে দিয়েছেন। উনি আপনাদের সালাম জানিয়েছেন। আমি আর কিছু বলতে পারব না বলে প্রায় ছুটে নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

রহমান সাহেব স্ত্রীর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, তার দুচোখ থেকে তখন পানি গড়িয়ে পড়ছে।

পরের দিন সকালে লাইলীর হাতের দিকে চেয়ে রহিমা জিজ্ঞেস করল, কি গো

সখি, কে পরিয়ে দিল ?

লাইলী লজ্জা পেয়ে বলল, তুমিই বল না দেখি ?

নেকলেস হলে বুঝতাম, সেলিম দোকান থেকে কিনে পরিয়ে দিয়েছেন। বালা যখন, তখন নিশ্চয় ওর মা পরিয়ে দিয়েছেন।

প্রথমটা ঠিক কিনা জানি না, তবে দ্বিতীয়টা তুমি ঠিক বলেছ। জান ভাবি, ফাংশানের শেষে যখন ওর মা সকলকে বিয়ের কথা বলে বালা দু'টো পরিয়ে দিলেন তখন আমার এত লজ্জা ও ভয় করছিল যে, তোমাকে আমি ঠিক বলতে পারছি না।

শুধু লজ্জা আর ভয় পেলে, আনন্দ পাওনি ?

তা আবার পাইনি। কত বড় বড় ঘরের লোকজনও তাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে ছিল, আমি তো খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

রহিমার কাছে লাইলীর মা-বাবা সব কিছু শুনে যেমন খুশি হলেন, তেমনি আবার চিন্তিতও হলেন। অত বড়লোকের খাতির যত্ন করবেন কেমন করে ? রহমান সাহেব আনন্দে অসুখের কথা ভুলে গেলেন। তিনি সুস্থ মানুষের মত পরের দিন থেকে নিয়মিত অফিস করতে লাগলেন।

দু'দিন পর বিকালে সোহানা বেগম ড্রাইভারের সঙ্গে লাইলীদের বাড়িতে এলেন।

রহমান সাহেব ও জলিল সাহেব কেউ অফিস থেকে তখনও ফেরেন নি। লাইলী সোহানা বেগমকে সালাম করে মা ও ভাবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচয়ের পালা শেষ করে হামিদা বানু প্রাথমিক আপ্যায়নের পর রহিমাকে সোহানা বেগমের কাছে বসিয়ে, লাইলীকে নিয়ে নাস্তা তৈরি করতে গেলেন।

সোহানা বেগম রহিমার কাছ থেকে তাদের ও লাইলীদের সব খবর জেনে নিলেন।

হামিদা বানু নাস্তা তৈরি করে এনে বললেন, আমরা ভাই গরিব মানুষ। আপনাদের মত লোকের আদর যত্ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যতটুকু করেছি খেয়ে আমাদের ধন্য করুন।

সোহানা বেগম তার হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললেন, ঐ রকম কথা বলে লজ্জা দেবেন না। আমি সবকিছু জেনেশুনে আত্মীয়তা করত এসেছি। এখানে গরিব ও বড়লোকের প্রশ্ন নেই। আসুন আমরা তিনজন এক সঙ্গে খাই, লাইলীর বাবা ও দাদা বুঝি এখনও ফেরেন নি ?

হামিদা বানু বললেন, না, তবে আসবার সময় হয়ে গেছে। লাইলী সবাইকে নাস্তা পরিবেশন করল। নাস্তার পর তিনজনে গল্প করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রহমান সাহেব ও জলিল সাহেব ফিরলেন।

পরিচয়াদির পর সোহানা বেগম বললেন, আমি তো লাইলীকে পূত্রবধূ করার জন্য পাকা কথা বলতে এসেছি। আপনাদের মতামত না নিয়েই সেদিন আমাদের বাড়িতে সকলের সামনে লাইলীকে পূত্রবধূ করব বলে মনোনীত করেছি। আপনাদের মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এখন আপনাদের মতামত জানতে পারলে একদম দিন ধার্য্য করে ফিরব।

রহমান সাহেব বললেন, আমরা কি আর বলব। এযুগে এরকম ঘটনা বিরল। মনে হয় আল্লাহপাকের বড় রহমত আমাদের মেয়ের উপর। তাই আপনাদের মত লোকের বাড়িতে তার স্থান হচ্ছে। দোয়া করি, তিনি যেন আপনাদের সবাইকে সুখী করার তওফীক লাইলীকে দান করেন। আর ওদের দাম্পত্য জীবন সুখের করেন। আমি এর বেশি কি আর বলব বোন ?

সোহানা বেগম লাইলীকে ডাকতে বললেন।

রহমান সাহেব অনুচ্চস্বরে মেয়ের নাম ধরে ডেকে বললেন, এখানে এস তো মা।

পাশের রুম থেকে লাইলী তাদের সবকথা শুনতে পাচ্ছিল। ধীরে ধীরে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

সোহানা বেগম ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে পাঁচভরী ওজনের একটা সোনার হার বার করে লাইলীর গলায় পরিয়ে দিলেন।

লাইলীর রূপ ঝলসে উঠল। সবাই নির্বাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। লাইলী প্রথমে সোহানা বেগমকে ও পরে একে একে সবাইকে কদমবুসি করল।

সোহানা বেগম তার মাথায় ও চিবুকে হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, বেঁচে থাক মা, তোমরা দু'জনে সুখী হও।

বিয়ের তারিখ ঠিক করে সোহানা বেগম ফিরতে চাইলে রহমান সাহেব বললেন, সে কি কথা বেয়ান, আপনি আজ মেহমান হয়ে প্রথম এসেছেন, খাওয়া দাওয়া না করে যেতে দিচ্ছি না

সোহানা বেগম বললেন, একটু আগে তো খেলাম। আমি এত তাড়াতাড়ি আর কিছু খেতে পারব না। আত্মীয়তা যখন হল তখন তো মাঝে মাঝে এসে খেয়ে যাব। আমি একা মানুষ, আরও কয়েক জায়গায় যেতে হবে, কাজ আছে।

রহমান সাহেব নাছোড় বান্দা। শেষে আর এক প্রস্থ চা বিস্কুট খেয়ে সোহানা বেগম বিদায় নিলেন।

সেলিমদের বাড়ি থেকে ফিরে মনিরুল রেহানাকে বলল, তুই তো সেদিন খুব ফটফট করে বললি, তোর দিকটা তুই সামলাবি। দেখলি তো, ঐ মেয়েটা তোকে টেক্কা দিয়ে জিতে গেল।

রেহানা ভিতরে ভিতরে গুমরাচ্ছিল। কোনো কথা বলতে পারল না। চিন্তা করল, সে এতদিন সেলিমের সঙ্গে মেলামেশা করেও তাকে আকর্ষণ করেত পারল না। মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়ে তাদের প্রেম এতদূর গড়িয়ে গেল ? লাইলীর উপর রাগ বেশি হল। তার মনে হল, গরিব ঘরের মেয়ে ঐশ্বর্যের লোভে সেলিমকে রূপের ফাঁদে ফেলেছে।

রেহানাকে চুপ করে ভাবতে দেখে মনিরুল আবার বলল, তুই যদি বলিস, আমি ওদের বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারি।

রেহানা চমকে উঠে বলল, কিন্তু বিয়ে ভেঙ্গে গেলে সেলিম যে আমাকে বিয়ে করবে তার কোনো নিশ্চয়তা আছে ? তা ছাড়া আমি কি এতই ফেলনা যে, আমাকে পছন্দ না করলেও তোমরা তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাও। আমি শুধু দেখব লাইলীকে বিয়ে করে সে কত সুখী হয়।

মনিরুল বলল, তুই কিছু ভাবিস না, দেখি আমি কতদূর কি করতে পারি। একটা কথা ভুলে যাচ্ছিস কেন ? মাঝপথে লাইলী না এলে সেলিম তোকে ঠিকই বিয়ে করত। তা ছাড়া সে তো তোকে ডিনাই করেনি। যত গণ্ডগোলের মূল হল, লাইলী। ওর বাড়ির ঠিকানাটা দিতে পারিস ?

যেদিন নিউ মার্কেটে লাইলীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেদিন কথায় কথায় রেহানা তার ঠিকানা জেনে নিয়ে পরে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখেছিল। রেহানা ভ্যানিটি

ব্যাগ থেকে লাইলীর ঠিকানাটা এনে দিয়ে বলল, দেখ, তুমি যেন আবার এমন কিছু করো না, যাতে করে সেলিম না মনে করে আমরা তাদের বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছি।

আরে না না। আমি কী কচি খোকা ? সে কথাও তোকে বলে দিতে হবে। এমনভাবে কাজ করব লাঠিও ভাঙবে না, আর সাপও মরবে না। তারপর ঠিকানাটা পড়ে বলল, আরে এই ঠিকানায় নাজমুল নামে একটা ছেলে আমাদের অফিসের টাইপিষ্ট। দাঁড়া, কালকেই তাকে জিজ্ঞেস করলে সবকিছু জানা যাবে।

নাজমুল লাইলীর চাচাতো ভাই। সে কোনো রকমে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পাড়ার ও কলেজের লম্পট ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াত। তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকটা হাইজ্যাক ও নারীঘটিত কেসে ধরা পড়ে হাজৎ খেটেছে। তারপর তার বাবা তাকে অনেক শাসন করেও যখন বাগে আনতে পারলেন না তখন তাকে নিজের রেশন দোকানে বসান। সেখানেও সে অনেক টাকা পয়সা নষ্ট করে ফেলে। শেষে টাইপ শিখিয়ে একজনকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে মনিরুলদের অফিসে চাকরিতে ঢুকিয়েছেন। ছেলের মতিগতি ভালো করার জন্য তার বাবা কয়েক জায়গায় মেয়ে দেখেছেন। কিন্তু সে রাজি হয়নি। শেষে তার মায়ের জেদাজেদীতে বলেছে, চাচাতো বোন লাইলীকে ছাড়া বিয়ে করবে না। তার বাবা কথাটা শুনে প্রথমে খুব রাগারাগি করেন। কারণ বড় ভাইয়ের সাথে কয়েক বছর আগে থেকে আকসা-আকসি। কোন মুখে সেখানে বিয়ের কথা বলবে। ছেলেকে অনেক বুঝিয়েও যখন কাজ হল না, তখন একদিন বড় ভাইকে ডেকে বিয়ের প্রস্তাব দেন।

ছোট ভাইয়ের কথা শুনে রহমান সাহেব অনেকক্ষণ চুপ করে চিন্তা করলেন। ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে দিলে মেয়েকে সব সময় কাছে পাবেন। কিন্তু ছোট ভাইতো হারাম টাকা রোজগার করে। ছেলেটা আবার নামায রোযার ধার ধারে না। তার চরিত্রের অধঃপতনের কথা লাইলী ও নিশ্চয় শুনেছে। মেয়ে আমার ধর্মের আইন মেনে চলে। তা ছাড়া ছেলে, মেয়ের চেয়ে কম শিক্ষিত।

বড় ভাইকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতক্ষণ কি ভাবছ ? তোমার মতামত বল ?

রহমান সাহেব বললেন, এসব ব্যাপারে ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে হয়। ঠিক আছে, আমি লাইলীর মায়ের সঙ্গে কথা বলে পরে জানাব। ঘরে ফিরে স্ত্রীকে ছোট ভাইয়ের কথা বললেন।

হামিদা বানু শুনে খুব রেগে গেলেন। বললেন, আমার অমন সোনার চাঁদ মেয়েকে ঐ লম্পট ছেলের হাতে দিতে পারব না। দেওরপুত হলে কি হবে ? চরিত্রহীন। তা ছাড়া লাইলী এখন বড় হয়েছে, লেখাপড়া করেছে, তারও তো একটা মতামত আছে ? আমি একদম নারাজ। তুমি তোমার ভাইকে জানিয়ে দাও, এ বিয়ে হওয়া একদম অসম্ভব।

লাইলী কি দরকারে আব্বার কাছে যাচ্ছিল। আব্বাকে মায়ের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে শুনে দরজার আড়াল থেকে সব কথা শুনল। আব্বার কথা শুনে প্রথমে সে খুব রেগে গিয়েছিল, শেষে মায়ের কথা শুনে তার মনটা হালকা হয়ে গেল।

দু'দিন পর রহমান সাহেব ছোট ভাইকে অমতের কথা জানালেন।

এতদিন পর ছেলের বিয়ের কথা বলে নাজমুলের বাবা বড় ভাইয়ের উপর কিছুটা নরম হয়েছিলেন। বিয়েতে অমত শুনে খুব রাগের সঙ্গে বললেন, আমিও দেখব, কোন রাজপুত্র এসে তোমার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যায়।

আব্বাকে চাচার সঙ্গে কথা বলতে নাজমুল গোপনে তাদের কথাবার্তা শুনতে ছিল চাচা তার সঙ্গে বিয়ে দেবে না জেনে সেও খুব রেগে গেল। আর মনে মনে ভাবল, দেখে নেব কেমন করে লাইলীর অন্য জায়গায় বিয়ে হয়।

পরের দিন মনিরুল অফিসে নাজমুলকে বলল, তোমাকে একটা মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করব, তার সম্বন্ধে তুমি যা জান সব আমাকে বলবে।

নাজমুল বলল, বলুন কোন মেয়ের সম্বন্ধে কি জানতে চান ?

মনিরুল ঠিকানাটা তার সামনে ধরে জিজ্ঞেস করল, এটা কি তোমাদের বাড়ির ঠিকানা ?

নাজমুল একবার চোখ বুলিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার।

লাইলী নামে একটা মেয়েরও এই ঠিকানা, সে তা হলে কি হয় তোমার ?

ছোট সাহেবের মুখে তার স্বপ্নের রাণীর নাম শুনে নাজমুল অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

কি হল তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন ? নামটা শুনে খুব অবাক হয়েছ দেখছি।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নাজমুল বলল, লাইলী আমার বড় চাচার মেয়ে। তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল।

বিয়ের কথা হয়েছিল ? হল না কেন ?

আপনি যখন তার কথা জানতে চান তখন সব কথা খুলে বলছি শুনুন, অনেক দিন থেকে চাচাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য। কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকে লাইলীকে ভালবাসি। বেশ কিছুদিন আগে আমি তাকে আমার মনের কথা বলে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। আমার কথা শুনে লাইলী বলল, দেখ নাজমুল ভাই, তুমি যে রকম ছেলে, সেই রকমের মেয়েকে বিয়ে করা তোমার উচিত। আর একটা কথা মনে রেখ, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে যেও না। তার কথা শুনে আমি খুব রেগে যাই। সেই সময় প্রতিজ্ঞা করি, যেমন করেই হোক আমি তার দেমাগ ভাঙব। শেষে বাবাকে দিয়ে চাচার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিই। তারা কেউ রাজি হয়নি। আমিও দেখব, কেমন করে অন্য জায়গায় বিয়ে হয়।

মনিরুল বলল, তুমি কি তাকে এখনও ভালবাস ? আমি যদি তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করি, তা হলে কী তাকে বিয়ে করবে ?

নাজমুল ছোট সাহেবের কথা শুনে যেন হাতে চাঁদ পেল। বলল হ্যাঁ স্যার, তাকে এখনও আমি প্রাণ অপেক্ষা বেশি ভালবাসি। সে ভাগ্য কি আমার হবে স্যার ? তা ছাড়া আপনি আমার জন্য এত কিছু করবেন কেন ?

মনিরুল বলল, তুমি যদি আমার কথামত কাজ কর, তা হলে তোমার মনোস্কামনা পূর্ণ হতে দেরি হবে না।

আপনি যা বলবেন তাই শুনব স্যার। আপনাকে বলতে আমার আর কোনো লজ্জা নেই, আমি যদি ওকে না পাই, তবে সারাজীবন আর বিয়েই করব না।

ঠিক আছে, আমি তার সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। তবে তার আগে তোমাকে নিয়ে ওর নামে আমি দুর্ণাম রটাতে চাই। তোমাকে খুলে বলি, ওর সঙ্গে আমার এক আত্মীয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আমি চাই না তার সঙ্গে ওর বিয়ে হোক। তাই তোমার সংগে ওর দুর্ণাম রটিয়ে বিয়েটা ভাঙ্গাতে চাই। কিন্তু তুমি জীবনে কোনোদিন এই কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না। করলে এতে তোমারই বেশি ক্ষতি হবে। আর বিয়েটা ভেঙ্গে গেলে তুমি লাইলীকে বিয়ে করতে পারবে এবং আমি তোমার প্রমোশনও দিয়ে দেব।

নাজমুল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, আপনি মনিব, আপনার কথার বিরুদ্ধে আমি এতটুকুও কিছু করব না। কেউ কি স্যার তার নিজের ভবিষ্যৎ কোনোদিন নষ্ট করতে চায় ?

মনিরুল বলল, আমি সময় মত সব কিছু তোমাকে জানাব। এখন যাও কাজ করগে। তারপর সে দুটো চিঠি লিখে অফিসের পিওনের হাতে দিয়ে একটা রহমান সাহেবকে ও অন্যটা সোহানা বেগমকে দেওয়ার নির্দেশ দিল। পিওন মনিবের কথা মত কাজ করে ফিরে এলে মনিরুল জিজ্ঞেস করল, দুটো চিঠিই ঠিক লোকের হাতে দিয়েছ তো ?

পিওন বলল, হ্যাঁ সাহেব, আমি আগে চিঠির মালিকের নাম জেনেছি, তারপর দিয়েছি।

রহমান সাহেব, পিওনের হাত থেকে চিঠি নিয়ে ঘরে এসে পড়তে লাগলেন।

শ্রদ্ধেয় রহমান সাহেব,

প্রথমে সালাম নেবেন। পরে জানাই যে, আপনি আপনার একমাত্র মেয়ে লাইলীর বিয়ে যে ছেলের সঙ্গে ঠিক করেছেন, তার খোঁজ-খবর নিয়েছেন ? ঐশ্বর্য্যের প্রতি গরিবদের কী এতই লোভ ? একমাত্র মেয়েকে না জেনে, না দেখে বড়লোকের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে যাচ্ছেন। বড়লোকের ছেলেরা যে কত চরিত্রহীন হয়, তার খোঁজ যদি রাখতেন, তা হলে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজার ছেলেকে জামাই করার স্বপ্ন দেখতেন না। এতটুকুও ভেবে দেখেন নি, অত বড় লোকের ছেলে কেন আপনার মতো গরিব লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছে ? মেয়েরা তো তাদের কাছে খেলার সামগ্রী। দুদিন পরে ভালো না লাগলে ব্যবহৃত খেলনার মত ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বিয়ে করা মেয়েকে তো আর সে ভাবে ছুঁড়ে ফেলতে পারে না। নেহাত বেকায়দায় পড়ে ঘরে ফেলে রাখে। আর তারা মদ খেয়ে অন্য মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করে বেড়ায়।

যাক আমি আপনার হিতাকাঙ্খী। সেলিমের দুশ্চরিত্রের কথা জানি বলে আপনাকে বাধা দিলাম। আপনার মেয়ে সুন্দরী ও শিক্ষিতা। যদি বলেন, আমি তার জন্য একটা ভালো ছেলে দেখে দেব। সে আপনাদের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। আশা করি, আপনার মেয়েকে বাঁদীগিরী করার জন্য বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। যদি আমাকে শত্রু মনে করে জিদ করে এই কাজ করেন, তবে আপনার মেয়ের শেষ পরিণতির জন্য আপনি দায়ী হবেন। দরকার মনে করলে নিচের ঠিকানায় পত্র দিয়ে জানাবেন।

ইতি

আপনার জনৈক হিতাকাঙ্খী।

ঠিকানা ঃ পোস্ট বক্স নাম্বার.....।

চিঠি পড়ে রহমান সাহেব খুব মুষড়ে পড়লেন। তার মনের মধ্যে তখন অনেক রকম চিন্তা হতে লাগল। চিঠিটা যেই লিখুক না কেন, সত্যিই বড়লোকের ছেলেদের চরিত্র আজকাল খুব নিচে নেমে গেছে। খবরের কাগজ খুললে প্রায় প্রতিদিন তা দেখতে পাওয়া যায়। কি করবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। ভাড়াটিয়া জলিল সাহেবকে চিঠিটা দেখালেন। উনি বললেন, চিঠিটা যে দিয়েছে, তার নিশ্চয় কোনো মতলব আছে।

রহমান সাহেব বললেন, কার কি এমন মতলব আছে জানি না বাবা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

জলিল সাহেব বললেন, আপনি বেশি চিন্তা করবেন না। বিয়ের তো এখনও একমাস দেরি। দেখা যাক, এর মধ্যে কোনো কিছু ঘটে কিনা। লাইলীকে এ ব্যাপারে কিছু বলার দরকার নেই।

এদিকে সোহানা বেগমও চিঠি পেয়ে পড়তে লাগলেন–

শ্রদ্ধেয়া,

আমি আপনাদের পরিচিত লোক। বিশেষ কারণবশতঃ পরিচয় দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। সেলিমের সংগে লাইলীর বিয়ে হবে শুনে আপনাকে কয়েকটা কথা না বলে থাকতে পারলাম না। আপনারা বড়লোক ও উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। কেন জানি না, লাইলীর মতো একটা চরিত্রহীনা মেয়েকে ঘরের বৌ করতে যাচ্ছেন। তার সম্বন্ধে ভালভাবে খোঁজ-খবর নিলে দেখবেন, সে মোটেই ভালো মেয়ে নয়। তার চাচাত ভাইয়ের সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল। লাইলী বিয়ের কয়েকদিন আগে পাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। কি করে যেন পুলিশ তাকে উদ্ধার করে দিয়ে যায়। সেই জন্য তার চাচাতো ভাই তাকে বিয়ে করেনি। মেয়েটা শুধু দেখতেই যা রূপসী। রূপ দিয়ে অনেক ছেলের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছে। আপনারা নিশ্চয় জানেন, "অল দ্যাট গ্লীটার ইজ নট গোল্ড"। বেশি কিছু আর বলতে চাই না, জ্ঞানী হলে অল্পতেই বুঝতে পারবেন।

ইতি–

আপনাদের শুভাকাঙ্খি।

চিঠি পড়ে সোহানা বেগম যেন গাছ থেকে পড়লেন। চিঠিতে অনেক অবান্তর কথা থাকলেও কিছু কথা ঠিক। ভাবলেন, ওদের মহল্লার অন্যান্য লোকের কাছে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল। যদি সত্যিই লাইলীর চরিত্র খারাপ হয় ? নাহ, কিছুই যেন তার মাথায় আসছে না। কে নাম ঠিকানা ছাড়া পত্র দিল ? শেষে তার মনে হল, কেউ হয়তো এভাবে বিয়ে ভাঙ্গিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চায়। সেলিমও বাড়িতে নেই, চিটাগাং গেছে। সে বাড়িতে থাকলে তার সঙ্গে যুক্তি করা যেত। তারও খোঁজ খবর নেই। নানান চিন্তায় তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। সেলিমকে আসার জন্য একটা টেলিগ্রাম করে দিলেন।

সেলিম আজ এক সপ্তাহ হল চিটাগাং এসেছে। সেখানে একটা বাড়ি কিনে নূতন অফিস খুলবে। সেই জন্য ম্যানেজারকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। সুন্দর দেখে একটা দোতলা বাড়ি কিনে নিচে অফিস ও উপরে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অফিসের জন্য ফার্ণিচার কিনে ফেরার পথে সেলিমের গাড়ির সঙ্গে একটা ট্রাকের মুখোমুখী এ্যাক্সিডেন্ট। গুরুতর অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। মাথায় বেশি আঘাত পেয়েছে। ম্যানেজার সাহেবও একই গাড়িতে ছিলেন। অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে গেছেন। তার আঘাত সামান্য। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি সেলিমদের বাড়িতে টেলিগ্রাম করে দিলেন।

টেলিগ্রাম পেয়ে সোহানা বেগমের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পিয়নকে দেখে আসমা ও রুবীনা এই দিকে আসছিল। মায়ের মুখ রক্তশূন্য দেখে ছুটে আসে টেলিগ্রামটা পড়ল, সেলিম সিরিয়াসলি ইনজেড্, হি ইজ ইন ডেঞ্জার। কাম সার্প।

রুবীনা মাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, চল মা আমরা এখুনি রওয়ানা দিই।

সোহানা বেগম ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলে রুবীনাকে বললেন, আমি একা যাব। তুমি আর আসমা এদিকে দেখাশুনা করবে। তারপর তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠলেন। তিনি যখন চিটাগাং হসপিটালে পৌছালেন তখন রাত্রি নটা। আজ তিন দিন সেলিমের জ্ঞান ফিরেনি। মাথা প্লাষ্টার করা। সোহানা বেগম ছেলের অবস্থা দেখে মুষড়ে পড়লেন। অনেক টাকা খরচ করে

কেবিনের ও স্পেশাল চিকিৎসার জন্য বড় ডাক্তারের ব্যবস্থা করলেন।

পরের দিন বেলা এগারটায় সেলিমের জ্ঞান ফিরল। ডাক্তার বললেন, রুগী এখন আউট অফ ডেঞ্জার। আপনারা ঘাবড়াবেন না। তবে আজও যদি জ্ঞান না ফিরত, তা হলে রুগীকে বাঁচান যেত কিনা সন্দেহ।

সোহানা বেগম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই চিঠির কথা মনে পড়তেই ভাবলেন, লাইলী সুন্দরী হলে কি হবে . সে বড় অপয়া। তা না হলে বিয়ের তারিখ ঠিক হতে না হতে ছেলে আমার বিপদে পড়ল। আবার ভাবলেন, লাইলীর মতো মেয়ে অপয়া দুশ্চরিত্রা হতে পারে না। আর ঐ লোকটাই বা কেন উপযাজক হয়ে বেনামে তার দুর্নাম দিয়ে বিয়ে ভাঙ্গাতে চাচ্ছে ? এতে কি তার কোনো স্বার্থ আছে ? নানা চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষে ভেবে ঠিক করলেন, সেলিম ভালো হোক, তারপর তাকে লাইলীর সব কিছু জানিয়ে যা করা যাবে।

সেলিমের জ্ঞান ফিরল ঠিকই, কিন্তু সে কথা বলতে পারছে না। সকলের দিকে শুধু চেয়ে চোখের পানি ফেলে। সোহানা বেগম এর কারণ ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন।

ডাক্তার বললেন, এ রকম অনেক সময় হয়। ব্রেনে বেশি আঘাত পেলে অনেকে বাকশক্তি অথবা স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ইনি তো দেখছি দুটোই হারিয়েছেন।

সোহানা বেগম আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে কি সেলিম আর কখন কথা বলতে পারবে না ? স্মৃতি শক্তি ও কী ফিরে পাবে না ?

সেটা আমরা এখন ঠিক বলতে পারছি না। দেখা যাক, রুগী আগে সুস্থ হয়ে উঠুক। আমরা নরম্যালে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, বাকি আল্লাহপাকের মর্জি।

সেলিম ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু সে কথা বলতে পারল না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে থাকে।

সোহানা বেগম ছেলেকে ঢাকায় এনে বড় বড় ডাক্তার দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল, লাইলী নিশ্চয় অপয়া মেয়ে। সেই জন্য ছেলের এই অবস্থা। তিনি বড় ভাই জাহিদ সাহেবকে একদিন বললেন, বিয়ের দিন তো প্রায় এসে গেছে। আমি এখন কি করব ?

তিনি বললেন, এ অবস্থায় তো আর বিয়ে হতে পারে না ? ওদের সবকিছু জানিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিয়ের দিন পিছিয়ে দাও।

সোহানা বেগম বললেন, আমি এ বিয়ে একদম ভেঙ্গে দেব। আমার মনে হয়, মেয়েটা অপয়া। তা না হলে এরকম হবে কেন ?

জাহিদ সাহেব বললেন, তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর।

সেখানে রুবীনা ও আসমা ছিল। শুনে রুবীনা খুশি হল। কারণ লাইলীকে সে মোটেই পছন্দ করে না। বড় সেকেলে বলে তার মনে হয়। রেহানাকে এ বাড়ির উপযুক্ত বলে সে মনে করে। কিন্তু আসমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। লাইলীর ব্যবহার তাকে খুব ভালো লাগে। অমন সুন্দরী মেয়ে চরিত্রহীনা, অপয়া এটা যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

সেলিমের খবর পেয়ে রেহানা এ বাড়িতে ঘনঘন যাতায়াত করতে আরম্ভ করল। সে প্রতিদিন এসে প্রায় সারাদিন সেলিমের তত্ত্বাবধান করে।

বিয়ের তিন দিন আগে সোহানা বেগম অনেক ভেবে চিন্তে একটা পত্র লিখে ড্রাইভারের হাতে লাইলীদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

রহমান সাহেব পত্র পড়ে সেইখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

লাইলী বাপের অবস্থা দেখে ছুটে এসে বলল, কি হল আব্বা, তুমি অমন করছ কেন ? তারপর চিঠিটা দেখতে পেয়ে বলল, দেখি কার চিঠি ?

রহমান সাহেব যন্ত্রচালিতের মত চিঠিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

লাইলীর কথা শুনতে পেয়ে হামিদা বানুও হাতের কাজ রেখে ছুটে এলেন। লাইলী চিঠি নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগল–

রহমান সাহেব,

আপনাকে অত্যন্ত দুখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা অনেক কারণে এ বিয়ে ভেঙ্গে দিলাম। তার মধ্যে প্রধান কারণ হল, সেলিম একসিডেন্ট করে বাকশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আর এটা হয়েছে আপনার মেয়ে লাইলীর মতো অপয়া, দুশ্চরিত্রা ও কুলক্ষণা মেয়ের জন্য। তার দুশ্চরিত্রের কথা বাইরের লোক এসে জানাবে কেন ? মনে করেছেন, সুন্দরী মেয়েকে দিয়ে আমাদের মতো সরল মানুষকে ঠকিয়ে ঐশ্চর্য্য ভোগ করবেন ? গরিব হয়ে অত লোভ কেন ? মনে রাখবেন, পাপ কোনোদিন ঢাকা থাকে না। বারেক বিয়ের আগে আমরা সব কথা জানতে পারলাম। নচেৎ বিয়ে হয়ে গেলে যে কি হত আল্লাহকে মালুম।

আশা করি, ভবিষ্যতে যা কিছু করবেন, ভেবে চিন্তে করবেন।

ইতি–

সেলিমের মা সোহানা বেগম।

চিঠি পড়তে পড়তে লাইলী নীল হয়ে গেল। পড়া শেষ হতে কয়েক মুর্হুত নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল, তারপর গাছ কাছাড় খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারাল।

মেয়ের অবস্থা দেখে হামিদা বানু কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আল্লাহ গো, এ তুমি কি করলে, আমার মাসুম কলিজার টুকরা এত ব্যথা কি করে সহ্য করবে ?

রহমান সাহেবের চোখ থেকে পানি পড়ছিল। বললেন, তুমি আল্লাহকে দোষ দিচ্ছ ? ছি ছি, গোনাহগার হবে যে। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যখন যা প্রয়োজন ঠিক সময়ে তা করে থাকেন। আমরা বর্তমানকে খারাপ দেখে তাঁকে দোষারুপ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। সুখে দুঃখে সব সময় তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ও ছেলেমানুষ, খবরটা জেনে সহ্য করতে পারেনি। তুমি ওর মাথায় পানি দিয়ে পাখার বাতাস দাও।

বেশ কিছুক্ষণ মাথায় পানি ঢালার পর লাইলী জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসল। তারপর হাত থেকে বালা দু'টো ও গলা থেকে নেকলেস খুলে বাপের হাতে দিয়ে বলল, এগুলো এক্ষুণি ওদের ফিরিয়ে দিয়ে এস। আর সেলিম সাহেব কেমন আছেন দেখে আসবে। তুমি যেন আবার তাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করো না। শুধু বলবে, গরিবদের সঙ্গে আত্মীয়তা না হয় না করলেন, তাই বলে তাদের নামে দুর্ণাম দেবেন কেন ? আপনারা বড় লোক হতে পারেন, কিন্তু আল্লাহপাকের ন্যায় বিচারের কাছে সবাই সমান।

রহমান সাহেব বললেন, তাই হবে মা। এত তাড়া কিসের ? আমরা তো আর তাদের জিনিষ বিক্রি করে খেয়ে ফেলছি না ? জলিল সাহেবকে সবকিছু জানাই, তারপর যা হয় করা যাবে।

লাইলী আর কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে নিজের রুমে চলে গেল।

রাত্রে রহমান সাহেব জলিল সাহেবকে চিঠিটা দিলেন।

জলিল সাহেব চিঠি পড়ে খুব মর্মহত হলেন। বললেন, আল্লাহপাকের কি মহিমা তা তিনিই জানেন। আমরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না। সেই পরম

করুণাময়ের কাছে সবর করে থাকেন। তিনি কালাম পাকে বলেছেন "আল্লাহ সাবেরীনেদের সঙ্গে থাকেন।"[১] তারপর জিজ্ঞেস করলেন, লাইলী খবরটা শুনেছে ?"

হ্যাঁ, চিঠিটা পড়ে মেয়ে তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে গহনাগুলো খুলে দিয়ে বলল, যাদের জিনিষ তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে এস।

জলিল সাহেব বললেন, লাইলী ঠিক কথা বলেছে। কাল সকালে আপনি ওগুলো ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন।

পরের দিন রহমান সাহেব বেলা নটার সময় বালা ও হার নিয়ে সেলিমদের বাড়িতে গেল। একজন সাধারণ অচেনা লোককে ভিতরে ঢুকতে দেখে দারোয়ান বাধা দিল।

রহমান সাহেব বললেন, আমি সেলিমের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। দারোয়ান তবুও যখন যেতে দিল না তখন বললেন, ওঁকে গিয়ে বল, লাইলীর আব্বা এসেছে।

দারোয়ান তাকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে গেল। একটু পরে ফিরে এসে যেতে বলল।

সোহানা বেগম তৈরি ছিলেন। রহমান সাহেব ঘরে ঢুকতে বললেন, আপনি আবার এসেছেন কেন ? আপনার মেয়ের জন্য আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আপনার চরিত্রহীনা মেয়ের জন্য যদি সাফাই গাইতে এসে থাকেন, তা হলে ভুল করেছেন। চলে যান। এভাবে মেয়েকে দিয়ে টোপ ফেলে আর কতদিন রোজগার করবেন ?

রহমান সাহেব সোহানা বেগমের রাগ দেখে প্রথমে থতমত খেয়ে গেলেন। পরে সামলে নিয়ে ধীরভাবে বললেন, আপনারা আমার ও আমার মেয়ের বিরুদ্ধে কার কাছে কি শুনেছেন, তা আমি জানতে চাই না। বরং আপনি জেনে রাখুন, "এক জনের পাপের ফল আর একজনের উপর বার্তায় না।" এটা ক্বোরআন পাকের কথা।[২] ওসব কথা থাক, আমি আপনাদের জিনিষগুলো ফেরৎ দিতে এসেছি। তারপর বালা দুগাছা ও হারটা এবং কাগজে মোড়া সোহানা বেগমের সাড়ি ও ব্লাউজ, যেগুলো পরে সেই ঝড় বৃষ্টির দিন লাইলী ঘরে ফিরেছিল, সেই প্যাকেটটা টেবিলের উপর রেখে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, সেলিম এখন কেমন আছে ? আহা ছেলেটা বড় ভালো। দোয়া করি, আল্লাহপাক তাকে শিঘ্রী ভালো করে তুলুন।

জিনিষগুলো ফেরৎ দিতে দেখে সোহানা বেগমের মনে খচখচ করে বিঁধল। কিন্তু সেলিমের কথা জিজ্ঞেস করতে আবার রেগে গেলেন। বললেন, সে কেমন আছে অত খোঁজের আর দরকার কি ? যান চলে যান। আর কখনও আসবেন না।

যাব বোন যাব, আমি তো থাকতে আসিনি। আর টাকার জন্যও আসিনি। আপনি অত রাগ করছেন কেন ? আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু লোভী না। শুধু ছেলেটাকে দেখতে চেয়েছিলাম। ফিরে গেলে মেয়ে যখন জিজ্ঞেস করবে সেলিম সাহেবকে কেমন দেখলেন ? তখন কি বলব ? না দেখে মিথ্যা করে তো কিছু বলতে পারব না। আর জেনে রাখুন, আপনারা বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন বলে আমার তেমন দুঃখ হয়নি। কারণ আল্লাহপাক প্রত্যেক নারীকে তার স্বামীর বাম পাঁজর থেকে তৈরি করেছেন। আমরা যার সঙ্গে যার বিয়ে ঠিক করি না কেন, তিনি যার সংগে যার জোড়া তৈরি করে রেখেছেন, সেখানে হবেই। তাকে যখন আমরা বিশ্বাস করি, তখন

---

(১) সূরা- বাক্বারা, ১৫৩-আয়াত, পারা-২।

(২) সূরা- বনি ইসরাইল, আয়াত-১৫, পারা-১৫।

আর এ নিয়ে দুঃখ করলে তাকে অমান্য করা হবে। শুধু মেয়েটার জন্য বড় চিন্তা হয়। সে এখনও এতটা জ্ঞান লাভ করেনি। মা আমার চিঠি পড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। যাক বোন, আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদের মঙ্গলের জন্য সবকিছু করেন। তাঁর কাজের উপর আমাদের অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। যাওয়ার সময় একটা কথা বলে যাই, আপনি বোধ হয় কোথাও ভুল করেছেন। যার ফলে আমার নিস্পাপ মেয়ের উপর দুর্ণাম দিয়ে কথা বলেছেন। এখন আসি, অনেক কথা বললাম, অন্যায় কিছু হলে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ বলে রহমান সাহেব ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সোহানা বেগম লাইলীর বাবার কথাগুলো শুনে ভাবলেন, লোকটাকে কত অপমান করলাম, অথচ সেসব গায়ে না মেখে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কত উপদেশ দিয়ে গেলেন। এরকম লোক কোনোদিন ঠকবাজ হতে পারেন না। কিন্তু যখন তার চিঠি ও ছেলের বিপদের কথা মনে পড়ল তখন রাগটা আবার জেগে উঠল।

রহমান সাহেব সেলিমদের বাড়ি থেকে ফিরে সেই যে বিছানা নিলেন, আর উঠলেন না। রাতে হার্টের ব্যাথাটা জোর করল। লাইলী ডাক্তার নিয়ে এল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ভোরে যখন ফজরের আযান হচ্ছিল তখন মারা গেলেন। লাইলী বাপের পা দুটো জড়িয়ে ধরে পাথরের মত বসে রইল। খবর পেয়ে চাচা-চাচি, পাড়া-পড়শী সবাই এল। রহিমা ও জলিল সাহেব রাত জেগে সেখানে ছিল। সবাই লাইলীকে ঐভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। মেয়েরা বলাবলি করতে লাগল, লাইলীর কি শক্ত জানরে বাবা ? বাবা মরে গেল অথচ মেয়ের চোখে এক ফোটা পানি নেই।

রহিমা কিন্তু বুঝতে পারল, লাইলী ভীষণ শক পেয়েছে। দু'দুটো দুঃখজনক ঘটনায় তার অন্তরটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তাই কাঁদতে পারছে না।

সে লাইলীকে ধরে জোর করে নিজের ঘরে নিয়ে এলে লাইলী যন্ত্রচালিতের মত খাটে শুয়ে পড়ল। হামিদা বানু খুব কান্নাকাটি করছেন। রহিমা ফিরে এসে তাকে প্রবোধ দিতে লাগল। জলিল সাহেব খালুজানের দাফন করে যখন ফিরে এলেন তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। লাইলীর চাচাদের বাড়ি থেকে ভাত এসেছিল। সাদেক ও ফিরোজকে খাইয়ে রহিমা স্বামীকে বলল, তুমিও একমুঠো খেয়ে নাও।

জলিল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, খালা আম্মা, লাইলী ওদেরকে খাইয়েছ ?

না, খালা আম্মাতো কেঁদে কেঁদে পাগল। আর লাইলী সেই যে ঘুমিয়েছে এখনও উঠেনি।

জলিল সাহেব বললেন, সত্যি ওর জন্য খুব দুঃখ হয়। কি যে করবে মেয়েটা আল্লাহপাক জানেন। ওদেরকে খাওয়াবার চেষ্টা করে তুমিও কিছু খাও।

রহিমা অনেক চেষ্টা করেও হামিদা বানুকে খাওয়াতে পারল না। লাইলীকে তো ঘুম থেকে জাগাতেই পারল না। শেষে নিজে দু'মুঠো কোনো রকমে খেয়ে এসে স্বামীকে বলল, দেখ, খুব চিন্তার কথা, খালুজান মারা গেলেন, কিন্তু লাইলী একটুও কাঁদেনি। মনে হয় ওর কলিজা ফেটে গেছে, তাই কাঁদতে পারছে না।

জলিল সাহেব বললেন, ও এখন খুব ক্লান্ত। দু'দুটো শোক এক সঙ্গে পেয়েছে। তাই কাঁদতে পারছে না। ঘুম ভাঙলে যদি কান্নাকাটি করে তবে ভালো, নচেৎ ডাক্তার দেখাতে হবে। তা না হলে পাগল হয়ে যেতে পারে।

রাত্রেও লাইলী জাগল না। পরের দিন ভোরে উঠে ফজরের নামায পড়ে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করল। তারপর কেঁদে কেঁদে আব্বার রুহের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করতে লাগল।

রহিমা ফজরের নামায পড়ে উপরে গিয়ে লাইলীকে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে দেখে নিশ্চিন্ত হল। নিচে এসে স্বামীকে সে কথা জানাল।

বাবার মৃত্যুর পর লাইলী আর হেসে কারও সঙ্গে কথা বলে না। সব সময় কি যেন চিন্তা করে।

জলিল সাহেব একমাসের মধ্যে তার বাবার সার্ভিসের টাকা তুলে এনে লাইলীর হাতে দিয়ে বললেন, খালুজানের কুলখানি তো করা দরকার।

লাইলী বলল, আমি পাঁচ খতম ক্বোরআন শরীফ পড়ে তার রূহপাকের উপর বখশে দিয়েছি। লৌকিক প্রথা আমি মানি না। রাসুলুল্লাহ (দঃ) ও তাহার সাহাবীদের জামানায় ঐ প্রথা ছিল না। ওসব লোক দেখান। তবে এই টাকা থেকে আব্বার নামে কিছু মসজিদ ও মাদ্রাসায় দান করব। তাতে বরং আল্লাহপাক খুশি হয়ে আব্বাকে ক্ষমা করতে পারেন।

রহিমা ও হামিদা বানু সেখানে ছিল। অনেক দিন পর লাইলীকে এত কথা বলতে দেখে খুশি হল।

লাইলী আবার বলল, ভাইয়া, আমি ক'দিন থেকে চিন্তা করছি, মাকে নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাব। তোমরা কিন্তু এখানে থাকবে।

জলিল সাহেব বললেন, বেশ তো যাবে।

দেখতে দেখতে ছয় মাস কেটে গেল। দান খয়রাত করার পর হাতে যা টাকা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু ঘরের ভাড়া দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলছে। লাইলী সাদেককে পড়ান বন্ধ করে দিয়েছে। ইলেট্রিক বিল, পানির বিল, গ্যাসের বিল ও পৌর ট্যাক্স অনেক বাকি পড়েছে।

এদিকে মনিরুল চিন্তা করল, সেলিম ভালো হয়ে গেলে জেনে যাবে, চিঠিটা কেউ শত্রুতা করে দিয়েছে। তখন সে লাইলীকে বিয়ে করবেই। তাই নাজমুলকে দিয়ে লাইলীদের সব খবর রাখছে। একদিন নাজমুলের সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে পরিচয় করার পর নাজমুলের বিয়ের কথা পাড়ল।

উনি বললেন, আমি তো বিয়ে দিতে চাই, কিন্তু ওতো ওর চাচাতো বোন লাইলীকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে চায় না। আপনি ওকে বোঝান তো বাবা ?

মনিরুল বলল, লাইলীর সঙ্গে বিয়ে দেননি কেন ?

আমি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলুম, ওরা না করে দিয়েছে।

মনিরুল বলল, সে তখন ওর বাবা বেঁচে ছিলেন। এখন আর একবার দিয়ে দেখুন। আমার মনে হয় রাজি হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন না হয় আর একবার বলেই দেখব।

মনিরুল বলল, দেখব নয়, আজ এক্ষুণি যান। আমি ফলাফল শুনে যেতে চাই।

ছেলের মনিবকে এভাবে কথা বলতে দেখে নাজমুলের বাবা ভাবলেন, ছেলে হয়তো তাকে এই জন্যে ডেকে এনেছে। তিনি তখুনি লাইলীদের বাড়ি গিয়ে বড় ভাবির কাছে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

চাচাকে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখে লাইলী দরজার আড়ালে দাঁড়ল।

হামিদাবানু বললেন, লাইলীর আব্বা যে বিয়েতে অমত ছিলেন, এখন আমি তো সে কাজ করতে পারি না। তা ছাড়া মেয়ে আমার বড় হয়েছে। লেখাপড়া করেছে। তারও তো একটা মতামত আছে। আমি যে কি করব ভাই, ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না।

লাইলী মায়ের বিচলিত অবস্থা দেখে ঘরের ভিতরে ঢুকে বলল, চাচাজান, আমার মন মেজাজ ভালো নেই। আমি এখন বিয়ে করব না। চাকরি করব চিন্তা করছি।

আপনি নাজমুল ভাইয়ের বিয়ে অন্য কোথাও ঠিক করুন।

ভাইঝীকে মুখের উপর না করে দিতে দেখে নাজমুলের আব্বা খুব রেগে উঠে বললেন, বড় ভাই-এর এতিম মেয়েকে যেঁচে বউ করব বলে এসে ছিলাম। নিজেকে কি মনে কর তুমি ? চিরকাল কুমারী থাকবে নাকি ? আমার কথা মেনে নিলে ভালো করতে। আজকাল মেয়েরা লেখাপড়া করে একদম বেহায়া হয়ে যাচ্ছে। বাপ চাচাদের সামনে নিজের বিয়ের কথা বলতে লজ্জা বোধ করে না। যা খুশি কর, কিন্তু বংশের মুখে চুনকালি দিও না। এইতো একটা বড় লোকের ছেলেকে ফাঁসিয়ে ছিলে ? কেন তারা বিয়ে ভেঙ্গে দিল ? তারপর রাগে গর্জন করতে করতে চলে গেল।

ফিরে এসে নাজমুলের আব্বা মনিরুলকে বললেন, মেয়ে তো নয়, যেন দাজ্জাল। সে এখন বিয়ে করবে না, চাকরি করবে। চাকরি যেন হাতের মোয়া। ইচ্ছে করলেই গালে পুরে দেবে। মেয়ের না হয় একটু রূপ আছে। তা বলে অত অহংকার ভালো নয়। আল্লাহ তাঁর রাসূলের (দঃ) অহংকার রাখেননি। আপনি একটা মেয়ে দেখে যদি ওকে বুঝিয়ে বিয়েটা দিয়ে দেন, তা হলে ওদেরকে দেখিয়ে দিতাম, আমার ছেলে অত ফেলনা নয়। উপযাজক হয়ে দু'বার গেছি। দু'বারই অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছে। বেঁচে থাকি তো দেখব, কোন রাজপুত্রের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়।

মনিরুল চেষ্টা করব বলে ফিরে আসার সময় চিন্তা করল, যত সহজে কাজটা হবে ভেবেছিলাম তা হবে না। তবে সেলিমের সঙ্গে ওর বিয়েটা ভেঙ্গে দিয়েছি। নাজমুলের সঙ্গে লাইলীর বিয়ে হোক আর না হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। সেলিম ভালো হয়ে কিছু করার আগে রেহানা যেন তাকে কব্জা করে নেয়, সে কথা ওকে বলে দিতে হবে।

লাইলী প্রতিদিন খবরের কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে। মনের মত পেলে সেখানে দরখাস্ত করে। কয়েক জায়গায় ইন্টারভিউও দিয়েছে। কিন্তু চাকরি হয়নি। তার মনে হয়েছে, বোরখা পরে যাই বলে চাকরি হয়নি। বোরখা না পরে গেলে তার রূপ দেখে নিশ্চয় হত। একদিন কাগজে চিটাগাং-এ একটি নূতন অফিসের জন্য একজন ষ্টেনো দরকার। মহিলারাও দরখাস্ত করতে পারে। এক কপি পাশপোর্ট সাইজ ছবি ও বায়োডাটাসহ স্বহস্তে লেখা দরখাস্ত চেয়েছে। লাইলী অনেক চিন্তা ভাবনা করে বোরখা পরে শুধু মুখটা খোলা রেখে ফটো তুলে বায়োডাটাসহ সেখানে দরখাস্ত পাঠাল। তার হাতের লেখা খুব ঝরঝরে ও অতি সুন্দর। এর মধ্যে সে সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ শিখেছে।

অফিসের ম্যানেজার একটি পদের জন্য দেড়শত ছেলে মেয়ের দরখাস্ত দেখে হাঁপিয়ে উঠলেন। কি করবেন ঠিক করতে না পেরে প্রথমে হাতের লেখা দেখতে লাগলেন। কয়েকটা দেখার পর লাইলীর ফটো ও হাতের লেখা দেখে অবাক হয়ে চিন্তা করলেন, আল্লাহপাক মেয়েটিকে যেমন রূপ দিয়েছেন তেমনি হাতের লেখাও বটে। এরপর তিনি আর কোনো দরখাস্ত দেখলেন না। লাইলীকে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য চিঠি পাঠালেন। এই অফিসটা সেলিমদের। সে এটা উদ্বোধন করার পর

এ্যাকসিডেন্ট করে। তারপর অনেক দিন বন্ধ ছিল। সোহানা বেগম যখন সেলিমকে নিয়ে তার চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ড গেলেন তখন তিনি চিটাগাং এর অফিস চালু করার জন্য ম্যানেজারকে বলে যান। তাঁরই নির্দেশে ম্যানেজার সাহেব কয়েকদিন আগে আবার অফিস খুলেছেন। অনেক লোক আগেই এপয়েন্টমেন্ট হয়ে কাজ করেছে। কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় একজন ষ্টেনোর দরকার হয়ে পড়ে। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। যেদিন সোহানা বেগম লাইলীকে পুত্রবধূ করার কথা ফাংশানে ঘোষণা করেন, সেদিন ম্যানেজার মিটিং-এ থাকলেও শরীর খারাপ থাকায় ফাংশান শুরু হওয়ার আগেই চলে যান। সেদিন তিনি লাইলীকে দেখেননি। তাই আজ তার ফটো দেখে তাকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু তার মরা মেয়ের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিল দেখে অবাক হয়ে গেলেন। ইন্টারভিউ এর দিন চুরুট ধরিয়ে লাইলীর ফটোর সঙ্গে নিজের মেয়ের মিল দেখছিলেন।

লাইলী চীটাগাং এসে মাকে হোটেলে রেখে নির্দিষ্ট সময়ে ইন্টারভিউ দিতে গেল। অফিসে পৌঁছে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে ম্যানেজারের রুমের দিকে এগোল।

দরজার বাইরে টুলে পিয়ন বসেছিল। একজন বোরখা পরা মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন ? ম্যানেজার সাহেব পিয়নকে বলে রেখেছেন, একজন বোরখা পরা মহিলা ইন্টারভিউ দিতে আসবেন। আসলে তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিও।

পিয়নের কথা শুনে লাইলী বলল, জ্বি।

পিয়ন বলল, আপনি ভিতরে যান।

দরজায় ভারী পর্দা ঝুলছে। লাইলী পর্দা ফাঁক করে দেখল, একজন বয়স্ক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে চুরুট টানছে। লাইলী বলল, মে আই কাম ইন স্যার ? বলা বাহুল্য সে তখন মুখের নেকাব সরিয়ে দিয়েছে।

ম্যানেজার সাহেব লাইলীর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একটা মেয়ে যে আসবার অনুমতি চাচ্ছে, সেকথা ভুলে গেলেন।

ভদ্রলোককে তার দিকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে লাইলীর মনে হল লোকটা যেন অবিশ্বাস্য কিছু দেখছে। সে খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কোনো রকমে আবার বলল, "মে আই কাম ইন স্যার" ?

এবার ম্যানেজার সাহেব স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, অফকোর্স। এস মা এস, আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা করছি। লাইলী ভিতরে এলে তাকে সামনের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বস। তারপর প্রশ্ন করলেন, তুমি চাকরি করতে চাও কেন ?

লাইলী বলল, দেখুন, এটা একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তার উপর আমি মেয়েছেলে। এরকম প্রশ্ন শুধু পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি করতে পারেন। চাকরির ইন্টারভিউতে এরকম প্রশ্ন হবে জানলে আসতাম না। আপনার অফিসে ষ্টেনো দরকার। সে কাজের উপযুক্ত কিনা পরীক্ষা করতে পারেন। ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন করলে ফিরে যাব।

এতক্ষণ ম্যানেজার সাহেব চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে চুরুট টানতে টানতে সব কথা শুনছিলেন। লাইলী থেমে যেতে সোজা হয়ে বসে তার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি একদম ছেলেমানুষ। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসে এরকম কড়া কড়া কথা বললে কোথাও তোমার চাকরি হবে না। যাক, যা জানার তা জানা হয়ে গেছে। এখন তোমার কথায় ফিরে আসি। তুমি একটু আগে বলেছ, ব্যক্তিগত ব্যাপারে পিতৃস্থানীয় লোক প্রশ্ন করতে পারে। আমি নিজেই সে স্থান দখল করে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করছি। দরখাস্তে তোমার পিতার নামের আগে লেট লেখা দেখে বুঝেছি তিনি

নেই। তোমার কি আর কেউ গার্জেন নেই ?

লাইলী কয়েক সেকেণ্ড ম্যানেজারকে বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর যখন মনে হল লোকটার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই তখন বলল, শুধু মা আছেন। চাচা একজন আছেন। তাদের সঙ্গে ঐ ব্যক্তিগত কারণে অনেক দিন থেকে মনোমালিন্য। বড় এক ভাই ছিল, আল্লাহপাক তাকেও দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন। আপনি হয়তো ভাবছেন, লাক্সারী করার জন্য আমি চাকরি করতে চাইছি। আমাকে দেখে কি সে রকম ভাবতে পারছেন ? দেখুন, সত্যিই আমার একটা চাকরি খুব দরকার। আব্বার ইন্তেকালের পর মায়ের শরীর খুব ভেঙ্গে পড়েছে। আব্বা চাকরি করতেন। হার্টের অসুখে হঠাৎ করে মারা গেছেন। ঢাকায় শুধু আব্বার পৈত্রিক চার কামরা ঘর আছে। অনেক চিন্তাভাবনা করে চাকরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হঠাৎ লাইলী লক্ষ্য করল, লোকটার চোখ অশ্রুতে ঢল ঢল করছে। নিজের দুঃখের কথা এতক্ষণ বলছিল, কোনো দিকে তার খেয়াল ছিল না। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, আপনার চোখে পানি কেন ? কিছু পড়েছে নাকি ?

ম্যানেজার সাহেব রুমাল বার করে চোখ মুছে বললেন, চোখে কিছু পড়েনি মা, মনে কিছু পড়েছে। আমার একটা মেয়ে ছিল, বেঁচে থাকলে আজ ঠিক তোমার মতো এত বড় হত। পনের বছর বয়সে ম্যানেনজাইটীস হয়ে মারা গেছে। দরখাস্তের সঙ্গে তোমার ফটো দেখে আমার মেয়ের কথা মনে পড়ে। তার গড়ন ছিল ঠিক তোমার মতো। এখন তোমার কথাশুনে মনে হচ্ছে, তার গলার স্বরও তোমার মতো। প্রথমে তোমার গলার আওয়াজ শুনে মনে হয়েছিল, ছয় বছর পর মেয়ের গলা শুনছি। তবে সে তোমার মত এতো সুন্দরী ছিল না। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি আগামীকাল থেকে জয়েন কর। কালকেই তোমাকে এপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দেব।

ম্যানেজারের কথা শুনে লাইলীর চোখও পানিতে ভরে গেল। উঠে গিয়ে তার পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করে বলল, আমাকে চিরদিন মেয়ের মতো মনে করবেন।

এবারও ম্যানেজার সাহেব চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না। তার মাথায় হাত রেখে ভিজে গলায় বললেন, বেঁচে থাক মা, সুখী হও। আল্লাহ তোমার মনের বাসনা পুরণ করুন।

অফিস থেকে বেরিয়ে আনন্দে লাইলীর মনটা ভরে গেল। চাকরিটা হয়ে যাবে সে ধারণাই করতে পারেনি। হোটেলে ফিরে মাকে শুভ সংবাদটা দিল। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে মাকে বিশ্রাম করতে বলে বান্ধবী সুলতানার বাসার ঠিকানাটা নিয়ে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

যেদিন সোহানা বেগম বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে লাইলীদের চিঠি দেন, সেইদিন সুলতানার সঙ্গে তার খালাত ভাই খালেদের বিয়ে হয়। সুলতানা নিজে তাদের বাড়িতে দাওয়াত দিতে এসে সেলিমের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা শুনে যায়। লাইলীর জীবনে এরকম বিপর্যয় ঘটে গেল বলে সে বিয়েতে যেতে পারেনি।

বিলেত থেকে এফ, আর, সি, এস, ডিগ্রী নিয়ে এসে খালেদ চিটাগাং মেডিকেল কলেজে মেডিসিনের প্রফেসার পদে জয়েন করেছে। বিয়ের দুদিন পর ছুটি না থাকায় সুলতানাকে নিয়ে স্টাফকোয়ার্টারে নিজের বাসায় চলে এসেছে। কয়েকদিন পর সুলতানা লাইলীকে অভিযোগ করে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু লাইলী নানান দুর্ভাবনায় সে চিঠির উত্তর দিতে পারেনি।

ঠিকানামতো গিয়ে লাইলী দরজায় নক করল।

সবেমাত্র সুলতানা স্বামীর সঙ্গে খেয়ে উঠে পান চিবুচ্ছে। আর খালেদ বিছানায়

আড় হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। এক্ষুণি তাকে আবার চেম্বারে গিয়ে বসতে হবে। দরজায় নক হতে সুলতানাকে বলল, দেখ তোমার কোনো পড়শীনি হয়তো এসেছে। আমি ততক্ষণ পোশাক পরে নেই।

সুলতানা দরজা খুলে লাইলীকে দেখে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, সই তুই ? এতদিন পরে বুঝি আমাদের কথা মনে পড়ল ? বিয়েতে তুই যখন এলি না, এমন কি চিঠির উত্তরও দিলি না তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে তোর সঙ্গে কখনো কথা বলব না। কিন্তু তোর মধ্যে কি যাদু আছে, তোকে দেখে সে প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখতে পরলাম না। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে হাত ধরে বলল, আয় ভিতরে আয়। তোর সয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ঘরের ভিতরে এসে সুলতানা স্বামীর উদ্দেশ্যে বলল, দেখবে এস কে এসেছে ? যদি বলতে পার, তা হলে মিষ্টি খাওয়াব ?

খালেদ পাশের রুমে পোশাক বদলাচ্ছিল। এ ঘরে এসে এক অচেনা সুন্দরী মেয়েকে দেখে প্রথমে লজ্জায় থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চিন্তা করল, আশ-পাশের মেয়ে হলে এভাবে সুলতানা তাকে ডাকত না। হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় লাইলীকে ভালভাবে দেখল। তারপর লজ্জা মিশ্রিত মৃদু হাসি দিয়ে "আসসালামু আলাইকুম" বলে বলল, আপনি নিশ্চয় লাইলী।

লাইলীও মিষ্টি হেসে সালামের জওয়াব দিয়ে বলল, আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কি করে ?

লাইলী আরজুমন বানু এদেশে একজনই আছেন। তাকে কাউকে চিনিয়ে দিতে হয় না, তিনি নিজেই সকলের কাছে পরিচিত। বিলেতে থাকতে এবং বিয়ের পর থেকে আপনার কথা ওর কাছে এত বেশি শুনেছি যে, আপনাকে দেখেই চিনে ফেললাম।

লাইলী সুলতানাকে বলল, তুই তো সয়ার কাছে হেরে গেলি, এখন মিষ্টি খাওয়া।

তাতো খাওয়াবই, কিন্তু তুই একলা কেন ? সেলিম আসেনি ? তুই অত রোগা হয়ে গেছিস কেন ?

খালেদ বলল, তোমরা দুজনে বসে গল্প কর, আমার সময় নেই, চলি। তারপর লাইলীর দিকে চেয়ে বলল, আমি না আসা পর্যন্ত আপনি যাবেন না কিন্তু।

সুলতানা বলল, বারে আমার সই এল, তার খাতির যত্ন না করে তুমি যে বড় চলে যাচ্ছ ?

এখন আমার একটা ইমারজেন্সী কল আছে। ময়নার মাকে দিয়ে যা দরকার আনিয়ে নিও। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফেরার চেষ্টা করব।

খালেদ বেরিয়ে যেতে সুলতানা লাইলীকে জিজ্ঞেস করল, ভাত খাবি ?

না এক্ষুণি খেয়ে এসেছি। আমি এখন কিছু খাব না, তুই তাড়াহুড়ো করছিস কেন ? আমি কী তোদের কাছে খেতে এসেছি ?

সুলতানা তবু শুনল না। ময়নার মাকে ডেকে দু'গ্লাস লস্সী তৈরী করে আনতে বলল। তারপর লাইলীকে বলল, তোর কি ব্যাপার বলতো ? এমন শুকিয়ে গেছিস কেন ? তোকে দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

লাইলী বলল, তোর সন্দেহ ঠিক। তারপর সেলিমের এ্যাকসিডেন্ট, বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া এবং বাপের মৃত্যু থেকে আজ পর্যন্ত সব ঘটনা খুলে বলল।

শুনতে শুনতে সুলতানার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। চোখ মুছে বলল, কি করবি ভাই ? জানিস তো সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা। তাঁর বাণী স্মরণ করে সবুর কর। তিনি নিশ্চয় একদিন সবুরের ফল দেবেন। তুই বেশি চিন্তা করিসনা। খালা আম্মাকে

নিয়ে একদম আমার এখানে উঠলেই পারতিস। চল যাই, তোদের মালপত্র আর খালাআম্মাকে এখানে নিয়ে আসি।

লাইলী বলল, সে কি করে হয় ? তোদের অসুবিধে হবে। তা ছাড়া সয়া কিছু মনে করতে পারে ?

দেখ, তোকে অত চিন্তা করতে হবে না। দেখছিস না, দু-দু'টো ঘর খালি পড়ে রয়েছে।

তা হয় না রে, তার চেয়ে সয়াকে বলিস, তোদের কাছাকাছি একটা বাসা দেখে দিতে।

ঠিক আছে তাই হবে। এখন নাস্তা খেয়ে চল, সব কিছু এখানে নিয়ে আসি। যতদিন না বাসা ঠিক হচ্ছে ততদিন এখানে থাকবি। তোর সয়া শুনলে খুব খুশি হবে। সুলতানা লাইলীর কোনো বাধা শুনল না। তাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে গিয়ে খালা আম্মাকে সালাম করে তাদেরকে নিয়ে চলে এল।

খালেদ ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে সব কিছু শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ করল। লাইলীরা এখানে এসেছে দেখে খুশি হল।

পরের দিন থেকে লাইলী নিয়মিত অফিস করতে লাগল।

সুলতানা ও খালেদ তাদেরকে এখানেই থাকতে বলল। লাইলী কিছুতেই রাজি হল না। শেষে ওদের বাসার কাছাকাছি একটা বাসা ঠিক করে দিল।

দু'মাস হতে চলল লাইলী চাকরি করছে। সে বোরখা পরেই অফিস করে। সব সময় তার মুখ নেকাবে ঢাকা থাকে। যখন সে ম্যানেজারের কাছে একা থাকে তখন শুধু মুখ খোলা রাখে। তাকে সে চাচার আসনে বসিয়েছে। তার অনুরোধে মাঝে মাঝে লাইলীকে তাদের বাসায় যেতে হয়। ওঁর স্ত্রীও লাইলীকে মেয়ের মত স্নেহ করেন। তাদের বাড়িতে তারা থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু সে রাজি হয়নি।

অফিসে মোট পনের জন লোক কাজ করে। তাদের কেউ আজ পর্যন্ত লাইলীর মুখ দেখেনি। অনেকে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। একজন মেয়ে পিয়ন আছে, তার কাছ থেকে অফিস ষ্টাফরা শুনেছে, ষ্টেনো মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরী। তারা অনেক চেষ্টা করেছে তাকে দেখতে এবং তার সঙ্গে আলাপ করতে ; কিন্তু পারেনি। ছুটির পর লাইলী যখন অফিস থেকে বের হয় তখন অফিস গেটের বাইরে রাস্তায় কলিগরা তাকে দেখে নানা রকম মন্তব্য করে। একদিন একজন তাকে শুনিয়ে সঙ্গীদের বলল, উনি যদি পর্দা মেনে চলেন তবে চাকরি করতে এসেছেন কেন ? একজন পীরসাহেবকে বিয়ে করে অসুর্যম্পশ্যা হয়ে থাকতে পারতেন। রূপসী বলে কলিগদের সঙ্গে কি মেলামেশা করতে নেই ? মেয়েদের এত অহংকার থাকা ভালো না। এরপরও লাইলীর কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে শেষে আংগুর ফল টক ভেবে তারা ইতি টেনেছে।

লাইলী তাদের কথায় একটু মনে ব্যথা পেলেও কাউকে কিছু বলেনি। সে ভাবে, তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। আজকাল কয়টা মেয়ে পর্দা করে চাকরি করে ? সে তাদের বিরুদ্ধে কোনোদিন ম্যানেজার সাহেবকেও কিছু বলেনি। যদিও সে জানে, ম্যানেজারকে বলে দিলে তারা আর কোনোদিন তার পিছু লাগবে না।

এদিকে সুইজারল্যাণ্ডে দীর্ঘ ছয়মাস চিকিৎসার পর সেলিম স্মৃতিশক্তি ও বাকশক্তি ফিরে পেল। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর মায়ের কাছে এ্যাকসিডেন্টের কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, আমাদের বিয়ে তা হলে হয়নি ?

লাইলীর কথা শুনে যদি ছেলের আবার কিছু হয়ে যায় ? সেই কথা চিন্তা করে সোহানা বেগম বললেন, সে সব ঠিক আছে, দেশে ফিরে সব কিছু জানতে পারবে।

ও নিয়ে তুমি এখন কোনো চিন্তা করো না। মনে রেখ, তুমি একসিডেন্ট করে আজ ছয়মাস স্মৃতিশক্তি ও বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলে। কোনো কিছুই এখন তোমার চিন্তা করা নিষেধ।

আরও একমাস পর সোহানা বেগম ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরলেন।

রাত্রে ঘুমোবার সময় আসমা সেলিমের ঘরে তাকে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, দাদা, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ ?

সেলিম জেগেই ছিল। সে তখন লাইলীর কথা চিন্তা করছিল। উঠে বসে বলল, নারে ঘুমোইনি, আয় বস। কিছু বলবি নাকি ?

সোহানা বেগম আসমাকে লাইলীর সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনাটা জানাবার জন্য পাঠিয়েছেন। কিভাবে কথাটা বলবে চিন্তা করতে করতে একটা চেয়ার টেনে বসল।

কিরে কথা বলছিস না কেন ? তোর ছেলে কেমন আছে ? পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছিস তো ?

আসমা বলল, আমার খবর ভালো। তোমাকে একটা কথা বলব, সেটা শুনে তুমি মনে আঘাত পাবে, তাই বলতে সাহস হচ্ছে না।

সেলিম একটু চিন্তা করে বলল, যত বড়ই আঘাত পাই না কেন, তুই বল।

আসমা সেই বেনামী চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ।

সেলিম তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ল। তারপর আসমার দিকে রাগের সঙ্গে চেয়ে রইল।

আসমা ভয়ে ভয়ে বলল, তোমার যেদিন এ্যাকসিডেন্ট হয়, সেদিন একটা লোক এসে খালাম্মাকে এই চিঠিটা দিয়ে যায়। ওঁর ধারনা লাইলী খুব অপয়া মেয়ে। সেই জন্য তোমার এই দুর্ঘটনা হয়। তাই তিনি বিয়ে ভেঙ্গে দেন।

আসমা তুই চুপ কর বলে চিৎকার করে সেলিম মায়ের ঘরে গিয়ে পায়ের কাছে বসে দু'পা জড়িয়ে ভিজে গলায় বলল, একি করলে মা ? একজন অচেনা, অজানা লোকের একটা চিঠি পেয়ে তাকে বিশ্বাস করে ফেললে ? তোমার নিজের ছেলের চেয়ে সেই অজানা লোকটা তোমার কাছে বেশি বিশ্বাসী হয়ে গেল ? তুমি মা হয়ে আমাকে এতখানি অবিশ্বাস করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলল, কেন তুমি আমার ভালো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে না ? আমাকে এত টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে ভালো করে আনলে কেন ? বল মা বল, চুপ করে থেক না ? আমার কথার উত্তর দাও। আমি কী এমন তোমার কাছে অন্যায় করেছি, যার জন্য তুমি আমাকে এত বড় শাস্তি দিলে ? তা হলে কী ভাবব, আমাকে এই চরম আঘাত দেওয়ার জন্য বিদেশ থেকে ভালো করে এনেছ।

সোহানা বেগম বললেন, সেলিম, তুই আমাকে এত বড় কথা বলতে পারলি ? তারপর ভিজে গলায় বললেন, আমি মা হয়ে তোর ভালর জন্য এই কাজ করেছি। তুই শান্ত হ বাবা। তুই শিক্ষিত ছেলে, সামান্য একটা মেয়ের জন্য এতটা উতলা হওয়া উচিত না।

সেলিম মাকে ছেড়ে দিয়ে আর কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল। রাত্রে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল, লাইলী পাগলি হয়ে গেছে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সুদীর্ঘ চুল উস্কো খুসকো হয়ে জট পাকিয়েছে। সে রাস্তায় যাকে পাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞেস করছে, আপনি সেলিম সাহেবকে দেখেছেন ? বলতে পারেন তিনি কোথায় ও কেমন আছেন ? একটা হোটেল থেকে বেরোবার সময় গেটে লাইলী তাকে ঠিক ঐ কথাগুলো বলল।

সেলিমের তখন ইচ্ছা হল, তাকে জড়িয়ে ধরে বলে এই তো আমিই তোমার সেই সেলিম সাহেব। ঠিক এই সময় মোয়াজ্জেনের আজান শুনে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভারাক্রান্ত মনে ফজরের নামায পড়ে লাইলীর মঙ্গলের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া চাইল।

সকাল সাতটায় সেলিম লাইলীদের বাড়িতে গেল।

জলিল সাহেব সেলিমকে দেখে অবাক হলেও ড্রইংরুমে এনে বসালেন।

সেলিম বলল, দয়া করে লাইলীকে বা ওর আব্বাকে একটু ডাকবেন ?

জলিল সাহেব আরো বেশি অবাক হয়ে বললেন, খালুজান আজ প্রায় আট মাস আগে ইন্তেকাল করেছেন। আর লাইলী মাস দুই হল তার অসুস্থ মাকে নিয়ে চিটাগাং গেছে।

সেলিম "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন" পড়ে উঠে এসে জলিল সাহেবের দু'টো হাত ধরে বলল, অনুগ্রহ করে তার ঠিকানাটা দিন।

জলিল সাহেব এতক্ষণ অনেক সহ্য করেছেন, এবার একটু রাগতস্বরে বললেন, আমরা তার ঠিকানা জানি না। এখন তার ঠিকানা নিয়ে কি করবেন ? এতদিন কোথায় ছিলেন ? শুনেছিলাম, একসিডেন্ট করে স্মৃতি ও বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এখন তো দেখছি আপনি সুস্থ। খোঁজ-খবর নেননি কেন ? বই পুস্তকে পড়েছি, বড় লোকের ছেলেরা গরিব মেয়েদের নিয়ে দু'দিনের জন্য পুতুল খেলার মতো খেলে। আপনাকে দেখে প্রত্যক্ষ করলাম। আপনার মায়ের চিঠি পেয়ে লাইলী খালুজানকে গহনাগুলো ফেরৎ দিতে পাঠিয়েছিল। জানি না আপনার মা তাকে কি বলেছিলেন। ফিরে এসে সেই যে বিছানা নিলেন আর উঠলেন না। সে রাতেই মারা গেলেন। আর কি চান আপনারা ? অমন বেহেস্তের হুরের মত সুন্দরী ও নিষ্পাপ মেয়েকে দুর্ণাম দিয়ে এখান থেকে তাড়ালেন। আরও যদি কিছু করতে চান, তা হলে চিটাগাং গিয়ে গোয়েন্দা লাগান, পেয়ে যাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। বড়লোকেরা টাকার দেমাগে গরিবদের উপর অনেক জুলুম করে, কিন্তু সেটা সাময়িক। উপরে একজন শাহানশাহ আছেন, তিনি বড় ন্যায় বিচারক। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সত্য মিথ্যা একদিন প্রমাণ করে দেবেন।

সেলিম এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। তার দু'চোখ পানিতে ভরে উঠল। জলিল সাহেব থেমে যেতে ভিজে গলায় বলল, আমি নিজের সাফাই গাইবার জন্য আসিনি। এতদিন পর কেন এসেছি, সে খবর আল্লাহপাক জানেন। শুধু একটা কথা বলে যাই, আল্লাহপাক যেন আপনার শেষ কথাটা কবুল করেন। তারপর সে রুমাল দিয়ে দু'চোখ মুছতে মুছতে হঠাৎ করে উঠে চলে গেল।

জলিল সাহেব সেলিমের কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না। রহিমা দরজার পর্দার আড়াল থেকে তাদের কথা শুনছিল। এবার ভিতরে এসে বলল, আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। সেলিম সাহেব বোধ হয় এসব ঘটনা কিছুই জানেন না। না জেনে তুমি তাকে শুধু শুধু যাতা করে বললে ?

সেলিমের ব্যবহারে জলিল সাহেবেরও মনে খটকা লেগেছে। বললেন, কি জানি, হয়তো হবে। তবু কিন্তু থেকে যাচ্ছে।

রহিমা বলল, এইজন্য হাদিসে আছে, আসল ঘটনা না জেনে কারও উপর সন্দেহ পোষণ করা মহাপাপ।

লাইলী মাঝে মাঝে রহিমাকে পত্র দেয়। কিন্তু ঠিকানা দেয় না। পোষ্ট অফিসের সীলমোহর দেখে ওরা জেনেছে, সে চিটাগাং-এ আছে।

সেলিম ঘরে ফিরে এসে জামাকাপড় ব্রীফকেসে ভরে নিয়ে মায়ের কাছে এসে বলল, মা, আমি চিটাগাং যাচ্ছি।

সোহানা বেগম বললেন, সে কিরে ? মাত্র গতকাল এত জার্নি করে এলি। কয়েকদিন রেষ্ট নে, তারপর না হয় যাবি। এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে ?

সেলিম হতাশভাবে ব্রীফকেসটা সেখানে রেখে নিজের রুমে ফিরে এল। ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বন্ধ করে লাইলীকে নিয়ে তার অতীত জীবনের কথা চিন্তা করতে লাগল।

সোহানা বেগম আসমাকে বলে দিয়েছেন তোর দাদার দিকে খুব খেয়াল রাখবি। তাকে বেশি চিন্তা করতে দিবি না। সে ব্রীফকেসটা নিয়ে সেলিমের ঘরে এসে সেটা যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর তার কাছে এসে মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগল।

সেলিম চমকে উঠে তাকিয়ে আসমাকে দেখে বসতে বলে বলল, হাঁরে রেহানা বা মনিরুলের সঙ্গে তোর পরিচয় হয়নি ?

আসমা সামনের একটা চেয়ারে বসে বলল, রেহানার সঙ্গে এখানে আসার কয়েকদিন পর পরিচয় হয়েছে। প্রথমদিন রুবীনার সঙ্গে আমাকে দেখে তার কাছে আমার পরিচয় জানতে চাইতে রুবীনা বলল, আমাদের দুর সম্পর্কের আত্মীয়া। আমাকে অবশ্য সে কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস করেনি। আর মনিরুল প্রায়ই এসে রুবীনার সঙ্গে গল্প করে। মাঝে মাঝে দুজনে বেড়াতে যায়। আমি তার সামনে কোনোদিন যাইনি।

মনিরুলকে তুই ঠিক চিনতে পেরেছিস ?

আসমা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

সেলিম বলল, তোকে ভালভাবে আই, এ, পাশ করতে হবে। এখানে বেশি দিন থাকলে ধরা পড়ে যাবি। তোকে অন্তত বি, এ, পাশ করতে হবে। তোর ছেলেকে কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি করে দেব। ছেলের চিন্তা করিসনে, তারও ব্যবস্থা করতে পারব। তোর জন্য ঐ স্কুলে ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার কাজটা ঠিক করে দেব। তোকে আর ছেলে ছেড়ে থাকতে হবে না।

আসমা মেঝেয় বসে পড়ে সেলিমের দু'টো পা জড়িয়ে ধরে কাঁদকাঁদ স্বরে বলল, দাদা, তুমি এই মহাপাপীর জন্য যা করছ, তার এক কণাও আমি প্রতিদান দিতে পারব না। তোমার মতো ছেলের জীবনে কেন যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল, তা একমাত্র আল্লাহপাক জানেন। তারপর সে সেলিমের দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে ফোঁপাতে লাগল।

সেলিম তার মাথায় হাত বলোতে বুলোতে ভাঙ্গা গলায় বলল, কাঁদিসনে বোন কাঁদিসনে, উঠে বস। কি করবি বল ? উপরের দিকে আঙুল তুলে বলল, সবকিছু উনি করছেন। ওখানে মানুষের কিছু করার ক্ষমতা নেই। হ্যাঁরে, লাইলীর আব্বা মারা গেলেন, তোরা বুঝি সে খবর জানিস নি ?

এবারও আসমা মাথা নাড়ল। এমন সময় রেহানা সেলিম তুমি ঘরে আছ বলে ভিতরে ঢুকে আসমাকে ঐ অবস্থায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেলিম ভালো হয়ে ফিরে এসেছে জেনে সে তাকে দেখতে এসেছে।

সেলিম আসমার মাথাটা হাত দিয়ে তুলে ধরে বলল, উঠে বস। তারপর রেহানার দিকে চেয়ে বলল, কি খবর ? কেমন আছ ?

রেহানা নিজেকে সামলে নিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বলল, সেলিম তুমি এত নিচে নেমে গেছ ? আমি যে ভাবতে পারছি না, ছি, ছি, ছি।

সেলিম বলল, তুমি একি বলছ রেহানা ? তোমার কাছ থেকে একথা শুনব আশা করিনি।

ততক্ষণে আসমা উঠে দাঁড়িয়ে দুচোখ মুছে বলল, দেখুন রেহানাদি, যারা বাইরেটা দেখে বিচার করে, তাদের রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভুল হয়। তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রেহানা বলল, শুনেছি মেয়েটা তোমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। সে তো অনেকদিন হয়ে গেল এসেছে, আর কত দিন থাকবে ?

সেলিম বলল, আচ্ছা রেহানা, মেয়েরা এত হিংসুটে ও সন্দেহ প্রবণ হয় কেন বলতে পার ? যাক, তুমি আমাকে যা কিছু ভাবতে পার। এখন দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দাও, প্লীজ।

রেহানা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেলিমের শেষের কথা শুনে অপমান বোধ করে হাই হিল জুতোর আওয়াজ তুলে গট গট করে চলে গেল।

সেলিম চোখ বন্ধ করে আবার লাইলীর চিন্তায় ডুবে গেল।

ঐদিন দুপুরে আরিফের চিঠি এল। সে প্রথমে হাফেজ হয়ে পরে আরবীতে এম, এ, পাশ করেছে। যে কোনোদিন বাড়িতে এসে পৌঁছাবে। সেলিমের ব্যাপারটা নিয়ে এ সংসারে যেমন বিষাদের ছায়া নেমেছিল, আরিফের চিঠি পেয়ে সকলের মনে আনন্দের সাড়া জেগে উঠল। সেলিম মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কি, আমি বলিনি ? আরিফ মানুষের মত মানুষ হয়ে একদিন ঠিক ফিরে আসবে ? এতদিন নিজেকে বড় একা মনে হত, ও এলে আর কোনো চিন্তা নেই। সকলে আরিফের পথ পানে চেয়ে রইল।

দিন দশেক পরের ঘটনা। রুবীনা বিকেলে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেটের দিকে চেয়েছিল। দেখল, একজন দাড়ীওয়ালা মৌলবী ধরনের লোক গেটে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, ভিতরে আসছে।

দারোয়ান তার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে আগে আগে এসে চিৎকার করে বলল, বেগম সাহেবা দেখবেন আসুন, ছোট বাবু এসেছেন।

উপরের বারান্দা থেকে রুবীনা আরিফকে চিনতে পারেনি। দারোয়ানের চিৎকার শুনে সকলে নিচের বারান্দায় বেরিয়ে এল।

আরিফ মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা তুমি কেমন আছ ? আমাকে মাফ করে দিয়েছ তো ?

সোহানা বেগম ছেলেকে বুকে চেপে ধরে আনন্দঅশ্রু ফেলতে ফেলতে বললেন, মাফ তো অনেক আগেই করেছি। আল্লাহ যে তোকে আমার কোলে ফিরিয়ে আনলেন, তার জন্য তাঁকে অসংখ্য শুকরিয়া জানাচ্ছি। তোর খবরাখবর চিঠি দিয়েও তো জানাতে পারতিস। আজ তোর বাবা বেঁচে থাকলে কত যে খুশি হতেন

আরিফ মাকে ছেড়ে দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, কি বললে মা ? আব্বা বেঁচে নেই ? ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন বলে মায়ের পায়ের কাছে বসে তার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আব্বা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন ? আমি যে তার কাছে মাফ চাইতে পারলাম না। ইয়া রাহমানুর রহিম, তুমি আমার আব্বার রুহের মাগফেরাত দান কর। তার সমস্ত অপরাধ মাফ করে দাও।

সোহানা বেগম ছেলের হাত ধরে তুলে বললেন, কতদুর থেকে এসেছিস, চল

বাবা, হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নিবি। তারপর রুবীনার দিকে চেয়ে বললেন, তোর ছোটদার জন্য নাস্তা নিয়ে আয়।

আরিফ বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে নিজের রুমে কাপড় পাল্টাল। একটা অচেনা মেয়েকে রুবীনা ও মায়ের সঙ্গে নাস্তা নিয়ে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, মা, এই মেয়েটিকে তো চিনতে পারছি না ?

সোহানা বেগম বললেন, তুই চিনবি না। আমাদের দুর সম্পর্কে আত্মীয়া। বিপদে পড়েছে। তাই সেলিম ওকে রুবীনার মত মানুষ করছে। এমন সময় বছর তিনেকের একটা ছেলে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে আরিফের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর আসমার দিকে দুহাত বাড়িয়ে আম্মা বলে এগিয়ে গেল। আসমা ছেলেকে কোলে তুলে নিল।

আরিফ বলল, বাহ ! ছেলেটা তো খুব সুন্দর।

সোহানা বেগম বললেন, হ্যাঁ ওরই ছেলে।

আরিফ নাস্তা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, ভাইয়া কখন ফিরবে ? সে নিশ্চয় ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিয়েছে ?

সোহানা বেগম ম্লান স্বরে বললেন, সে দেখবে না তো কে দেখবে ? সে একা আর কত দিক সামলাবে। কখন ফেরে, কখন খায়, তার কিছু ঠিক নেই। এবার দু'ভাই মিলে সবকিছু দেখাশোনা করবি।

আচ্ছা মা, মনে হচ্ছে ভাইয়ার এখনও বিয়ে দাওনি ?

আরিফের কথা শুনে সোহানা বেগমের মুখটা আরও ম্লান হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কি আর বলব বাবা, বিয়ে তো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তা আর হল কৈ ?

কেন, হল না কেন।

বিয়ের বিশ পঁচিশ দিন আগে তোর দাদা এ্যাক্সিডেন্ট করে স্মৃতি ও বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। ওকে নিয়ে আমি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে ছ'মাস চিকিৎসা করিয়ে ভালো করি। এই তো মাত্র দশ বারদিন হল আমরা ফিরেছি।

আরিফ আল্লাহপাকের দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া জানিয়ে বলল, তিনি যা কিছু করেন, তার বান্দাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। তুমি অত মন খারাপ করছ কেন ? এবার একটা ভালো মেয়ে দেখে ভাইয়ার বিয়ের ব্যবস্থা কর।

রাত্রি আটটায় সেলিম ঘরে ফিরল। তাকে দেখতে পেয়ে আরিফ সালাম দিয়ে প্রায় ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, ভাইয়া তুমি কেমন আছ ?

সেলিম সালামের উত্তর দিয়ে ছোট ভাইকে আবেগের সঙ্গে বুকে চেপে ধরল। তারপর কান্নাজড়িত স্বরে বলল, মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে আমাদের অশান্তি দূর করতে পারতিস। তোর ঠিকানা জানা থাকলে আব্বার কথা জানাতে পারতাম। তারপর দু'ভাই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। এশার আজান শুনে সেলিম বলল, চল মসজিদ থেকে নামায পড়ে আসি।

আরিফ সেলিমকে আবার জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি নামায পড় ? ইয়া আল্লাহ তোমার দরবারে জানাই লাখ লাখ শুকরিয়া।

সেলিম আস্তে আস্তে ভিজে গলায় বলল, তোকে এক সময় সব কথা বলব। এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখ, যে আমাকে এই পথে চালিত করল, তাকে ভাগ্যদোষে হারিয়ে ফেলেছি।

নামায পড়ে এসে সকলে মিলে গল্প করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে সোহানা বেগম খাওয়ার জন্য সবাইকে ডেকে পাঠালেন।

ডাইনিংরুমে গিয়ে আরিফ বলল, ভাইয়া, চেয়ার টেবিলে বসে খাওয়া আর চলবে না।

সেলিম বলল কেন ? হাদিসে এরকম কিছু লেখা আছে নাকি ? না এটা তোর গোঁড়ামী ?

আরিফ বলল, আমার গোঁড়ামী কি না জানি না, আর হাদিসেও তা লেখা নেই। তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফ্লোরে বসে দস্তরখানা বিছিয়ে খেতেন। হাদিসে আছে, তিনি বলেছেন, "যে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবে এবং তাতে যা খাবার পড়বে তা কুড়িয়েও খাবে, সে কোনোদিন অভাবগ্রস্ত হবে না। আর যারা খাবার জিনিষ যদি চারিদিকে ফেলে খায়, তা হলে ঐ ফেলে রাখা খাবারগুলো তাদের জন্য অভিসম্পাৎ করে।"[১] তা ছাড়া এটা বিধর্মীদের অনুকরণ করা হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন "যারা যে ধর্মাবলম্বীদের অনুকরণ করবে অর্থাৎ তাদের যে কোনো কাজ পছন্দ করবে, তারা কেয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে উঠবে।"[২] এখন তুমিই বল, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে অনুকরণ করব না বিধর্মীদের অনুকরণ করব ?

সেলিম বলল, ঠিক আছে আজ খেয়ে নে, পরে যে যার ইচ্ছামত করবে। না তুই মেঝেয় বসেই খাবি ?

আরিফ বলল, টেবিল চেয়ারে বসে খাব না কেন ? এতে খেলে তো আর গোনাহ হচ্ছে না। তবে এটা সুন্নতের বরখেলাপ, পরিত্যাগ করা উচিৎ।

খেতে খেতে সেলিম আসমাকে দেখিয়ে আরিফকে জিজ্ঞেস করল, একে চিনিস ? এ বড় বিপন্না মেয়ে। নাম অসমা। ওর একটা ফুটফুটে ছেলে আছে। আমি একে ছোট বোন বলে গ্রহণ করেছি। আশা করি, তুইও ওকে ছোট বোনের মত গ্রহণ করবি।

আরিফ বলল, আল্লাহপাক তা হলে আমাদেরকে আর একটা বোন দিয়েছেন ? খাওয়ার পর্ব শেষ করে সকলে বারান্দায় বসে আরিফের বিদেশে কাটান দিনগুলোর কথা শুনতে লাগল। সোহানা বেগম একবার ঘুমোবার জন্য তাড়া দিয়ে গেলেন। আসমা তার বাচ্চাকে নিয়ে ঘুমোতে গেল। একটু পরে রুবীনা ঘুম পাচ্ছে বলে উঠে গেল। আরিফ বলল, ভাইয়া, তোমার উপর আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

কি রকম সন্দেহ ?

মনে হচ্ছে কোনো মায়বীনি তোমাকে তার মায়ায় ফেলেছে। তুমি সেই মায়ার যাদুতে হাবুডুবু খাচ্ছ। শত চেষ্টা করেও নাগাল পাচ্ছ না।

সেলিম তার মুখের দিকে হ্যাঁ করে চেয়ে রইল, কিছুই বলতে পারল না।

কি হল ভাইয়া, তুমি কথা বলছ না কেন ? তুমি নারীর প্রেমে পড়েছ বলেছি বলে আমাকে খুব অসভ্য, বেহায়া মনে করছ বুঝি ?

সেলিম সামলে নিয়ে বলল, সেটা ভাবা কি আমার অন্যায় হবে ?

না তা হবে না বলে আরিফ চুপ করে গেল।

সেলিম করুণ স্বরে বলল, তোর সন্দেহটা ঠিক। সত্যিই আমি লাইলী নামে একটা মেয়েকে ভালবেসেছি। কিন্তু ললাট লিখন কে খণ্ডাবে বল। কপালের ফেরে দুজনেই বিরহ জালায় জ্বলছি। আল্লাহই জানেন আমাদের কি হবে।

---

(১) বুস্তানুল আরেফিন ৯১ পৃঃ

(২) বর্ণনায় ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)–আহাম্মদ, আবু দাউদ।

তুমি কি বলছ ভাইয়া আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

সেলিম খুব সংক্ষেপে ওদের দুজনের ঘটনা বলল। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুই এবার ঢাকার সব কিছু দেখাশোনা কর। আমি চিটাগাং-এরটা দেখব। শুনেছি, লাইলী সেখানেই আছে ? চেষ্টা করব তাকে খুঁজে বের করার। বাকি আল্লাহপাকের মর্জি।

সেলিম আরিফকে নিয়ে মিল, কারখানা ও অফিসের সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। সব কাজ তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগল। সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও রাত্রে ঘুমোবার সময় লাইলীর চিন্তায় সে অস্থির হয়ে উঠে। সবকিছু তার কাছে অসহ্য মনে হয়। শেষে একদিন সবাইকে জানিয়ে দিল, আগামীকাল সে চিটাগাং যাবে।

সোহানা বেগম বললেন, আর কয়েকদিন থেকে যা।

সেলিম বলল, ম্যানেজার ট্রাঙ্কল করেছিল, আমার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন নচেৎ অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। কালকের ফ্লাইটে যাব বলে ম্যানেজারকে বলে দিয়েছি। পরের দিন সেলিম দশটা চল্লিশের প্লেনে চেপে বসল।

এদিকে ম্যানেজার সাহেব অফিসের সমস্ত ষ্টাফকে জানিয়ে দিয়েছেন, সাহেব আসছেন। অফিসের কেউ এখনও তাদের সাহেবকে দেখেনি। ম্যানেজার সাহেবের কাছেই তারা শুনেছে, সাহেবের মতো সাহেব নাকি আর হয় না। তিনি সততাকে খুব ভালবাসেন। যারা সততার সঙ্গে কাজ করে তারা তার প্রিয়পাত্র। সকলে মিলে সাহেবকে অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা করল। তারা জেনে ছিল, এই অফিস উদ্বোধন করার পরের দিন তিনি এ্যাকসিডেন্ট করেন এবং চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা সমস্ত অফিস কক্ষ রংবেরং এর রঙিন কাগজ দিয়ে সাজাল। সাহেবের অফিস রুমটা সব থেকে আকর্ষণীয় করে তুলল। তারপর রিসিভ করার জন্য সবাই এয়ারপোর্টে গেল।

বিমান যাত্রীদের মধ্যে একজন সুদর্শন যুবকের দিকে ম্যানেজার সাহেব হাত বাড়িয়ে বললেন, ঐ যে সাহেব আসছেন। ওরা প্রথমে তাকে ইউরোপিয়ান সাহেব মনে করে ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের সাহেব কি ইংরেজ ?

ম্যানেজার সাহেব বললেন, উনি খাস ঢাকাইয়া।

তখন সবাই অবাক হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। এত সুন্দর লোক তারা এর আগে দেখেনি।

অনেকগুলো লোকের সঙ্গে ম্যানেজার সাহেবকে এগিয়ে আসতে দেখে সেলিম আগে সালাম দিয়ে বলল, আশা করি, আল্লাহর রহমতে আপনারা ভালো আছেন।

ম্যানেজার ছাড়া আর কেউ সালামের জওয়াব দিতে পারল না। তারা অবাক হয়ে তাদের সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের মধ্যে সুভাস নামে একটা ছেলে এগিয়ে গিয়ে সেলিমের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল এবং হাতে একটা লাল গোলাপ দিয়ে আদাব জানাল।

সেলিম খুশি হয়ে তাকে ধন্যবাদ দিল।

এদের সঙ্গে লাইলী আসেনি। সে সাহেবের আসবার খবরও জানে না। তার

মায়ের শরীর দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে, তাই ডাক্তারের পরামর্শ মতো পনের দিনের ছুটি নিয়ে সাত দিন আগে মাকে নিয়ে কক্সবাজারে বেড়াতে গেছে। হামিদা বানুর দৈহিক কোনো অসুখ নেই। ডাক্তাররা বলছেন, উনি কোনো কারণে মনে ভীষণ আঘাত পেয়েছেন। সেই চিন্তাটা ওঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে। লাইলী হোটেলে উঠেছে। লাইলী প্রতিদিন সূর্যাস্ত দেখতে সমুদ্র তীরে গিয়ে কিছুক্ষণ বেলাভূমিতে হাঁটে। তারপর পাড়ে বসে সূর্যাস্ত দেখে। সূর্যাস্তের পর ঐখানে মাগরিবের নামায পড়ে হোটেলে ফিরে আসে। প্রথম প্রথম মাকে সঙ্গে করে এনেছে। পরে উনি আসতে চান নাই, তাই লাইলী একাই রোজ আসে।

সেলিম অফিসে এসে সবকিছু দেখে বলল, আপনাদের ব্যবহারে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। আশা করি, আপানারা সব সময় সততার সঙ্গে কাজ করে এই ফার্মের উন্নতি করবেন। একটা কথা মনে রাখবেন, ফার্মের উন্নতী মানেই আপনাদের উন্নতি। আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না। এখন জলযোগ শেষ হওয়ার পর আজ ছুটি ঘোষণা করছি। আগামীকাল থেকে আপনারা যথারীতি কাজ করবেন। সকলে হাততালি দিয়ে উঠল।

সেলিম তাদের থামিয়ে দিয়ে বলল, হাততালি দেওয়া মুসলমানদের রীতি নয়। আনন্দ প্রকাশ করার সময় বলবেন, 'সুবাহান আল্লাহ' অথবা মারহাবা মারহাবা।" সাহেবের কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। এ রকম কথা তারা কোনোদিন শুনে নাই। সবাইকে অবাক হতে দেখে সেলিম আবার বলল, আমি কোনো নূতন কথা আপনাদের বলিনি। পুরাতন কথাটা আপনারা জানেন না বলে নূতন বলে মনে হচ্ছে। তারপর ম্যানেজার সাহেবকে বললেন, কই খাবারের কি ব্যবস্থা করেছেন, এখানে আনতে বলুন, সকলে এক সঙ্গে বসে খাব।

অফিস ষ্টাফদের বিস্ময় ক্রমশঃ বেড়েই চলল। এতবড় ধনী মালিক, কর্মচারীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করছেন। ম্যানেজার সাহেব বললেন, আপনারা অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন কেন ? খাবারের ব্যবস্থা করুন। তারপর সকলে একসঙ্গে খাওয়ার পর অফিস ছুটি হয়ে গেল।

সেলিম পরের দিন জাষ্ট টাইমে অফিস কামরায় প্রবেশ করল। তারপর পিয়নকে ডেকে বলল, যারা এখানে কাজ করছে তাদের বায়োডাটা, ফটো ও দরখাস্তগুলো ম্যানেজার সাহেবকে নিয়ে আসতে বলুন।

ম্যানেজার সাহেব সবকিছু নিয়ে এলে তাকে বলল, আপনি এখন যান, প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠাব। ম্যানেজার সাহেব চলে যাওয়ার পর তাদের কাগজ পত্রগুলো দেখতে লাগল। শেষ দরখাস্তের সাথে লাইলীর ফটো দেখে চমকে উঠল। সবকিছু ভুলে তন্ময় হয়ে ফটোর দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় তার চোখ দু'টো পানিতে ভরে উঠল। কিছুক্ষণ পর তার কাগজ পত্রের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বাথরুম থেকে চোখ মুখ ধুয়ে এসে ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে পাঠাল।

ম্যানেজার সাহেব এসে সামনের চেয়ারে বসলেন।

সেলিম লাইলীর দরখাস্তটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এই মেয়েটি দেখছি ষ্টেনোর জন্য দরখাস্ত করেছে। তাকে এপয়েন্টমেন্টও দিয়েছেন। কিন্তু কাল থেকে তাকে দেখছি না কেন ?

ম্যানেজার সাহেব বললেন, এক সপ্তাহ আগে পনের দিনের ছুটি নিয়ে ডাক্তারের কথামতো তার অসুস্থ মাকে নিয়ে কক্সবাজারে বেড়াতে গেছে। লাইলীর মায়ের অসুখের কথা শুনে সেলিম খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

সাহেবকে চিন্তিত দেখে ম্যানেজার সাহেব বললেন, মেয়েছেলেকে চাকরি দিয়েছি

বলে কি তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ ? সেলিম কিছু বলার আগে তিনি আবার বললেন, দেখ বাবা, আমার তো অনেক বয়স হয়েছে, এই মেয়েটির মতো আর দ্বিতীয় কোথাও দেখিনি। যেন সাক্ষাৎ বেহেস্তের হুর। মেয়েটিকে দেখে খুব দুঃখী বলে মনে হয়েছে এবং তার যে একটা চাকরির খুব দরকার সেটা বুঝতে পেরে দিয়েছি। অফিসে প্রতিদিন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তার মুখ দেখেনি। আমাকে চাচা বলে ডাকে এবং আমিও তাকে মেয়ের মতো মনে করি বলে হয়তো সে আমার কাছে মুখ খুলে রাখে।

ম্যানেজার সাহেবের কথা শুনতে শুনতে সেলিম লাইলীর চিন্তায় ডুবে গেল। তার মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কোনো রকমে সে ভাবটা গোপন করে বলল, ঠিক আছে, আপনি এখন আসুন। ম্যানেজার সাহেব চলে যেতে লাইলীর সব কাগজপত্র নিজের ব্রীফকেসে ভরে নিল। অফিস ছুটির পর সেলিম উপরে গিয়ে কিছুতেই নিজেকে বুঝাতে পারল না। তার মন এক্ষুণি কক্সবাজারে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। ছুটি শেষ হওয়ার পর লাইলীর ফিরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হল। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে ম্যানেজারকে চিঠি লিখল।

ম্যানেজার চাচা,

প্রথমে সালাম নেবেন। পরে জানাই যে, আজকের সন্ধ্যার ফ্লাইটে বিশেষ কারণবশতঃ আমি কক্সবাজারে যাচ্ছি। ফিরতে দুচার দিন দেরি হতে পারে ? আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। ইনশাআল্লাহ আমি শীঘ্রি ফিরে আসব।

ইতি-

সেলিম।

সেলিমের বাসার কাজ-কর্ম ও রান্না-বান্না করার জন্য জাভেদ নামে একজন লোককে ম্যানেজার সাহেব ঠিক করে দিয়েছেন। লোকটা খুব বিশ্বাসী। সাহেব আসবে শুনে সে আগে থেকে ঘর-দরজা, বিছানাপত্র সব পুরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার আর একটি বড় গুণ, সে খুব ভালো রান্না করতে পারে। সেলিম প্রথম তার হাতের রান্না খেয়েই বুঝতে পেরেছে, লোকটি আগে বোধ হয় কোনো বড় হোটেলের বাবুর্চি ছিল। সে চিঠিটা শেষ করে জাভেদের হাতে দিয়ে বলল, কাল ঠিক নটার সময় এটা ম্যানেজার সাহেবের হাতে দেবেন। আর আমি আজ কক্সবাজার যাচ্ছি, কয়েকদিন পর ফিরে আসব।

সেইদিন সন্ধ্যার ফ্লাইট সেলিম কক্সবাজারে গিয়ে পৌঁছাল। রাত্রে হোটেলে শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করল, কি করে লাইলীকে খুঁজে বের করবে। এই শহরে কোথায় আছে কি করে সে জানবে ? পরের দিন সে সমস্ত হোটেলে গিয়ে তাদের রেজীষ্ট্রার খাতা চেক করে দেখল, কিন্তু কোথাও লাইলীর নাম খুঁজে পেল না। সেলিম যদি লাইলীর মায়ের নাম জানত, তা হলে পেত। কারণ লাইলী মায়ের নামে রুম নিয়েছে। সারাদিন এলোমেলোভাবে ঘুরে সন্ধ্যার দিকে সে সমুদ্র তীরে গেল। তখন সূর্য্যাস্তের সময়। সেলিম সূর্য্যাস্তের অলৌকিক শোভা দেখতে লাগল। সূর্য্য যখন একটা বড় থালার মত টকটকে লাল হয়ে ডুবতে আরম্ভ করল তখন সেলিমের মনে হল, একটা বিরাট রক্তগোলাপ যেন ধীরে ধীরে সমুদ্রের মাঝখানে ডুবে যাচ্ছে। তার লাল কিরণছটাতে সমুদ্রের পানিও রক্তের মত লাল হয়ে গেছে। সে যে কি এক অপূর্ব দৃশ্য, তা যে দেখেছে, সে ছাড়া আর কেউ অনুভব করতে পারবে না। একটু পরে মাগরীবের আজানের ধ্বনি শুনে সেলিম সমুদ্র পাড়ের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ল। তারপর সে আবার বেলাভূমিতে ফিরে এসে ধীরে ধীরে সমুদ্রের পানির কিনার ধরে

কিছুক্ষণ হাঁটার সময় হঠাৎ ভূত দেখার মতো সে চমকে উঠল। একটা বোরখা পরা মেয়ে মুখ খোলা অবস্থায় তার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে দ্রুত ঘুরে বলল, এই যে শুনুন।

লাইলী প্রতিদিনকার মতো সূর্যাস্ত দেখে নামায পড়ে হোটেলে ফিরছিল। কতলোক সূর্যাস্ত দেখতে আসে। সেলিমকে সে দেখেনি, অন্য লোক ভেবে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। প্রথমে সেলিমের গলার আওয়াজ পেয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরে তার মনে হল কেউ হয়তো অন্য কাউকে ডাকছে। সে সেলিমের চিন্তায় ছিল বলে হয়তো তার গলার মতো শুনতে পেয়েছে। সেইজন্য থমকে দাড়িয়ে আবার পথ চলতে শুরু করল।

সেলিম ততক্ষণ লাইলীর সামনে এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকার হলেও দু'জন দু'জনকে চিনতে পারল। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। দু'জনেরই মনে হল, স্বপ্ন দেখছে। চোখে পানি এসে গেছে বুঝতে পেরে লাইলী মাথা নিচু করে নিল।

সেলিম মৃদুস্বরে ডাকল, লাইলী ?

লাইলী অশ্রুভরা নয়নে তার দিকে শুধু চেয়েই রইল। শত চেষ্টা করেও তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না, শুধু তার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল।

সেলিম বলল, তুমি আমার সঙ্গে কথাও বলবে না ? জান, আমি ভালো হওয়ার পর থেকে তোমাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছি ? আর তুমি তোমার সেলিমকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। তারপর তার হাত দু'টো নিজের বুকে ধরে রেখে বলল, আল্লাহপাকের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জানাই, তিনি এত তাড়াতাড়ি আমার প্রিয়তমাকে পাইয়ে দিলেন।

লাইলী থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে যাচ্ছিল।

সেলিম তাকে ধরে ফেলল। তারপর যখন বুঝতে পারল অজ্ঞান হয়ে গেছে, তখন তাকে পাঁজাকোলা করে পানির কাছে নিয়ে বসিয়ে একহাতে ধরে রেখে অন্য হাত দিয়ে চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যেতেও যখন তার জ্ঞান ফিরল না তখন তাকে আবার পাঁজাকোলা করে তুলে একটা বেবী ট্যাক্সিতে করে হোটেলের রুমে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর হোটেলের বয়কে দিয়ে ডাক্তার আনল।

ডাক্তার দেখে বললেন, ভয় পাবেন না, হঠাৎ মানষিক কারণে জ্ঞান হারিয়েছে। আমি একটা ইনজেকশন দিচ্ছি, এক্ষুণি জ্ঞান ফিরবে।

ডাক্তার ইনজেকশন দেওয়ার পাঁচ মিনিট পর লাইলীর জ্ঞান ফিরল। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসে সেলিমের সঙ্গে ডাক্তারকে দেখে মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে মুখটা ঢেকে দিল। পানিতে বোরখা ভিজে গিয়েছিল বলে সেলিম রুমে এসে সেটা খুলে দিয়েছে।

ডাক্তার বললেন, আর কোনো চিন্তা নেই। সেলিম ডাক্তারকে বিদায় করে এসে দেখল, লাইলী জড়সড় হয়ে বসে আছে।

সেলিমকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে খাট থেকে নেমে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সেলিম তার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ডাকল, 'লাইলী।'

লাইলী আর স্থির থাকতে পারল না। সে ভুলে গেল এখনও তাদের বিয়ে হয়নি। সেলিম বলে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রেখে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল।

সেলিমেরও চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তারা স্থির হয়ে অনেকক্ষণ ঐভাবে রইল। কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। যখন তাদের মনের উত্তাল স্পন্দন ক্লান্ত হল তখন প্রথমে লাইলী বুঝতে পারল তার চোখের পানিতে সেলিমের অনেকখানি জামা ভিজে গেছে। লজ্জা পেয়ে আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে বলল, দেখ কি করলাম, তোমার জামা একদম ভিজিয়ে দিয়েছি।

সেলিম লাইলীর আঁচল দিয়ে প্রথমে তার চোখ মুখ মুছে দিয়ে পরে নিজেরটা মুছতে মুছতে বলল, দু'জন প্রেমিক প্রেমিকা প্রেমের সাগরে ডুব দিয়েছিল। সাগরে তো পানি থাকবেই। তারপর তারা দু'টো চেয়ারে সামনা-সামনি বসে একে অপরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর লাইলী বলল, এভাবে বসে থাকলে চলবে ? ওদিকে মা ভীষণ চিন্তা করছে।

মায়ের কথা শুনে সেলিম জিজ্ঞেস করল, উনি এখন কেমন আছেন ?

লাইলী বলল, একটু ভালোর দিকে।

তোমার হোটেলের ফোন নাম্বার ও রুম নাম্বারটা বল, মায়ের চিন্তা দূর করে দিই।

লাইলী ফোন নাম্বার বলল।

সেলিম ডায়েল করে হোটেলের ম্যানেজারকে বলল, এত নাম্বার রুমে দিন তো। তারপর লাইলীর হাতে রিসিভার দিয়ে বলল, মায়ের সঙ্গে কথা বল। বলবে তোমার ফিরতে আরও দেরি হবে, উনি যেন চিন্তা না করেন।

লাইলী সেলিমের কথামতো মায়ের সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, আরো কত দেরি করাবে ?

সেলিম বলল, আরও কিছুক্ষণ বস না, প্রাণ ভরে দেখি। বহুদিন পর তোমাকে পেলাম। ছাড়তে মোটেই মন চাইছে না। কি করি বল দেখি ? আচ্ছা, আমাকে ছেড়ে যেতে তোমার মনে চাইছে ?

লাইলী বলল, না। তোমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা মনে করলে কলজে মোচড় দিয়ে উঠছে। কিন্তু মায়ের কথা ভেবে নিজেকে সংযত করতে হচ্ছে।

সেলিম বলল, এক্ষুণি তোমাকে ছাড়ছি না। একবার ছেড়ে যা ভোগান ভুগিয়েছে, আর নয়। আগে বাঁধব, তারপর যা হয় হবে। তারপর ব্রিফকেস খুলে কিছু টাকা নিয়ে লাইলীকে সঙ্গে করে একটা বেবী ট্যাক্সীতে উঠে বলল, কাজি অফিসে চল।

ড্রাইভার বলল, এখন তো কাজি অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, স্যার।

হোক বন্ধ, আপনি চলুন।

ড্রাইভার কাজি অফিসের সামনে গাড়ি পার্ক করল।

সেলিম তাকে অপেক্ষা করতে বলে লাইলীকে নিয়ে অফিসের সামনে গিয়ে দেখল বন্ধ। তবে দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। সে দরজায় ধাক্কা দিতে একজন প্রবীণ লোক বেরিয়ে এসে তাদেরকে দেখে বললেন, এখন অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, আগামীকাল সকাল আটটায় আসুন।

সেলিম বলল, দেখুন আমরা ভোরেই এখান থেকে চলে যাব। আপনাকে অফিসের টাইমের বাইরে কাজ করার জন্য ওভার টাইম দেব। আপনি দয়া করে আমাদের কাজটা করে দিন।

কাজি সাহেব বললেন, সরকারী রেটের চেয়ে ডবল দিতে হবে। আর দুজন সাক্ষীর জন্য আলাদা চার্জও দিতে হবে।

সেলিম সবকিছুতে রাজি হয়ে ওদের বিয়ের কাবিন রেজিষ্ট্রি করে নিল। তারপর গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল, একটা ভালো হোটেলের সামনে রাখবেন। আর

লাইলীকে বলল, খেয়ে দেয়ে তোমাকে মায়ের কাছে পৌঁছে দেব। খাওয়া দাওয়া সেরে ওরা যখন হোটেলে পৌঁছাল তখন রাত্রি দশটা।

সেলিমকে সঙ্গে করে লাইলী যখন রুমে ঢুকল তখন হামিদা বানু ওজিফা শেষ করেছেন। সেলিমকে দেখে অবাক হয়ে ঘোমটা টেনে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে লাইলী ও সেলিম একসঙ্গে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। তারপর সেলিম বলল, আজ আমাদের কাবিন হয়ে গেছে। বাকি কাজ আগামীকাল চিটাগাং-এ গিয়ে সেরে নিতে চাই। আপনি আমাদেরকে দোয়া করুন মা।

সেলিমের কথা শুনে হামিদা বানু আরো অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি যেন কিছু বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ওঁকে চুপ করে থাকতে দেখে সেলিম আবার বলল, আমার অসুখের সময় আমার মা আপনাদেরকে ভুল বুঝে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছেন। আমি সেজন্য খুব দুঃখিত। অনুগ্রহ করে আমাদের সবাইকে মাফ করে দিন। আমি এসবের কিছুই জানতাম না। এ্যাকসিডেন্ট করে যখন স্মৃতিশক্তি ও বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম তখন চিকিৎসার জন্য সাত মাস বিদেশ ছিলাম, তাই এইরূপ অঘটন ঘটে গেছে। আপনার ছেলে যদি অন্যায় করে মাফ চাইত, তা হলে কি তাকে মাফ করতেন না ? সেলিমের শেষের দিকের কথাগুলো কান্নার মত শোনাল। লাইলীর চোখ দিয়ে পানি টপটপ করে পড়তে লাগল।

হামিদা বানুর চোখও পানিতে ভরে উঠল। চোখ মুছে বললেন, সবই আল্লাহপাকের ইচ্ছা বাবা, তিনি তোমাদের মাফ করুন। আমরাও তোমাদেরকে ভুল বুঝে অন্যায় করেছি।

সেলিম বলল, না, না আপনারা কোনো অন্যায় করেননি। এই রকম ঘটনা ঘটলে সবাই তাই করতো। আমার মা যে ভুল করেছেন, সেটা আমি শুধরোতে চাই। আপনি আজ বিশ্রাম নিন। তারপর লাইলীর দিকে চেয়ে বলল, তুমি ভোরে উঠে সব গুছিয়ে নিয়ে রেডি হয়ে থাকবে। আমি এসে তোমাদেরকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যাব। আমরা কাল ফার্স্ট ফ্লাইটে চিটাগাং যাব। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে নিজের রুম ফিরে এসে এয়ারপোর্টে ফোন করে তিনটি টিকিট বুক করল। পরেরদিন ভোর ছ'টার প্লেনে সেলিম লাইলীকে ও হামিদা বানুকে নিয়ে প্লেনে উঠল।

বেলা আটটার সময় সাহেবকে দুজন মহিলাসহ গাড়ি থেকে নামতে দেখে জাভেদ দোতলা থেকে ছুটে নেমে এল। তখনও অফিস খুলেনি। বেলা নয়টায় অফিস খুলে। সেলিম জাভেদকে আসসালামু আলাইকুম দিয়ে বলল, গাড়ি থেকে সব মালপত্র নিয়ে উপরে এস।

সাহেবকে আগে সালাম দিতে শুনে জাভেদ লজ্জায় এতটুকু হয়ে সালামের উত্তর দিতে ভুলে গেল।

সেলিম তার অবস্থা দেখে বলল, এতে লজ্জা বা অবাক হওয়ার কিছু নেই। হাদিসে আছে না যে আগে সালাম দিবে সে উত্তর দাতার চেয়ে নয়ই গুণ সওয়াব বেশি পাবে ? তারপর সে ওদেরকে নিয়ে উপরে চলে গেল।

জাভেদ মালপত্র গাড়ি থেকে নামাবার সময় ভাবল, সাহেব গেলেন একা, এলেন তিনজন। উনারা কে হতে পারে যেই হোক না কেন তাতে আমার কি ভেবে মালপত্র নিয়ে উপরে এল।

উপরে পাঁচ কামরা ঘর। একটাতে সেলিম আর একটাতে জাভেদ থাকে। বাকি রুমগুলো খালি পড়ে থাকে। জাভেদ মালপত্র উপরে নিয়ে এলে সেলিম তাকে বলল, তুমি পাশের রুমটা পরিষ্কার কর, আর শেষের রুমটায় তুমি থকবে। তোমার মালপত্র

নিয়ে সেখানে রেখে এস। আমার রুমের পাশেরটা ড্রইংরুম আর তার পাশেরটা আর একটা বেডরুম করবে। আমি সেই মত আসবাবপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার এখন অনেক কাজ। দেখছ না, মেহমান এসেছে। বাজার করে এনে ভালো করে রান্না করবে। তারপর কিছু টাকা তার হাতে দিয়ে বলল, যাও তাড়াতাড়ি কর। আর শোন, এখন আগে আমাদের নাস্তার ব্যবস্থা কর।

নাস্তা খেয়ে সেলিম হামিদা বানুকে বলল, মা, আপনি বিশ্রাম নিন। আমরা একটু বাইরে যাব। তারপর লাইলীকে সাথে করে মার্কেটে গিয়ে ঘরের প্রয়োজনীয় সব আসবাবপত্র কিনে দোকানের ম্যানেজারকে ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিতে বলল। তারপর কাপড়ের দোকানে গিয়ে কয়েকটা দামী শাড়ী ও গহনার দোকানে গিয়ে কয়েক সেট সোনার অলঙ্কার কিনে বাসায় ফিরল।

ততক্ষণে জাভেদ ফার্নিচারগুলো পাশের দুটি রুমে সাজিয়ে দিয়ে রান্নার কাজে লেগে গেছে। হামিদা বানু রান্নাঘরে এসে তার সঙ্গে রান্নার তদারক করছেন।

সেলিম ম্যানেজার সাহেবকে উপরে ডেকে পাঠালে তিনি সেলিমের ঘরে এসে লাইলীকে দেখে অবাক হলেন।

ম্যানেজার সাহেবকে বসতে বলে সেলিম বলল, আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন, আমার পছন্দ করা মেয়েকে আমার মা পুত্রবধূ করবেন বলে আমাদের বাড়ির এক ফাংশানে তাকে বালা পরিয়ে সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেই মেয়েটি ভাগ্যের অন্বেষণে আমদের এই অফিসে না জেনে চাকরি নেয়। তারপর লাইলীকে দেখিয়ে বলল, আপনার চেনোকে নিশ্চয় চিনতে পারছেন . অফিসে ওর ফটো দেখে কক্সবাজার থেকে অনেক কষ্ট করে নিয়ে এসেছি। কারণ এই সেই মেয়ে, যার সঙ্গে আমার বিয়ের পাকা কথা হয়েছিল। গতকাল কক্সবাজারে কাবিন করেছি। আপনি আমার বাবার বয়েসী। আজকেই আমাদের বাকি কাজগুলো আপনাকে সেরে দিতে হবে। আর চাচি মাকে এক্ষুণি আনার ব্যবস্থা করুন।

এতক্ষণ লাইলী লজ্জায় মাথা নিচু করে ছিল। এবার আস্তে আস্তে এসে ম্যানেজার সাহেবের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল।

ম্যানেজার সাহেব বললেন, থাক মা, বেঁচে থাক। আল্লাহপাকের কাছে দোয়া করি, তিনি তোমাদেরকে সুখী করুন। তারপর সেলিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

ম্যানেজার সাহেব চলে যাওয়ার উপক্রম করলে সেলিম বলল, আর একটা কথা, আজ রাত্রে সব অফিস ষ্টাফকে বিয়ের দাওয়াত দিবেন।

ম্যানেজার সাহেব সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন।

ম্যানেজার সাহেব চলে যাওয়ার পর লাইলী সেলিমকে বলল, আমার প্রাণের সই সুলতানা এখানে আছে। তার স্বামী এখানকার মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের প্রফেসর। তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে আনার ব্যবস্থা কর। তা না হলে সই ভীষণ মনে কষ্ট পাবে।

সেলিম বলল, তোমার সই তো আমাকে চেনে না। তুমি বরং একটা চিঠি লিখে দাও।

তা দিচ্ছি, তবে আমার সই তোমাকে চেনে।

তা চিনতে পারে। কত মেয়েই তো আমাকে চেনে। অথচ আমি তাদের অনেককে চিনি না।

লাইলী একটা চিঠি লিখে সেলিমের হাতে দিল।

সেলিম চিঠি নিয়ে ঠিকানা অনুযায়ী গিয়ে দরজা নক করল।

খালেদ মেডিকেলে চলে গেছে। সুলতানা ময়নার মাকে রান্নার আইটেম বাতলে দিয়ে এসে একটা গল্পের বই পড়ছিল। অসময়ে দরজায় আওয়াজ শুনে বিরক্তির সঙ্গে দরজা খুলে সেলিমকে দেখে অবাক হয়ে বলল, সেলিম ভাই তুমি ? এতদিন কোথায় ছিলে ? এস ভিতরে এস

সেলিম ভিতরে এসে ভাবল, লাইলীর কথাই ঠিক। মেয়েটি আমাকে চেনে অথচ আমি তাকে চিনি না। কিন্তু এ কেমন করে হয় ? শেষে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমাকে চিনলেন কেমন করে ? অথচ আমি আপনাকে তো চিনি না।

সুলতানা বলল, তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন ? আমি ছেলেবেলা থেকে তোমাকে চিনি। আব্বার সঙ্গে কয়েকবার তোমাদের বাসায় গেছি। তোমার আব্বার সঙ্গে আমাদের দূরের কি রকম একটা সম্পর্ক ছিল। সে তো ছোটকালের কথা। বড় হয়ে ভার্সিটিতে তোমাকে অনেক দেখেছি। তা ছাড়া আমার সই এর লাভার হিসাবে তোমাকে আরও বেশি চিনি।

সেলিম বলল, এখন বুঝলাম। তারপর লাইলীর চিঠিটা বের করে সুলতানার হাতে দিল। এবার সুলতানার অবাক হওয়ার পালা। চিঠি খুলে পড়তে লাগল—সই, আল্লাহপাকের দরবারে লক্ষ লক্ষ শুকরিয়া জানিয়ে তোকে জানাচ্ছি যে, এক্ষুণি আমাদের শুভ কাজ হতে যাচ্ছে। তুই চিঠি পেয়েই সয়াকে সাথে নিয়ে ওর সঙ্গে চলে আসবি। সাক্ষাতে সব কিছু বলব।

ইতি

তোর সই লাইলী।

চিঠি ভাঁজ করে সেলিমের দিকে চেয়ে বলল, সুবহান আল্লাহ। আল্লাহ তোমার কুদরত বোঝা মানুষের অসাধ্য। যাই হোক, সই এর যখন হুকুম তখন অমান্য করতে পারি না। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি খাও, আমি ততক্ষণে তৈরী হয়ে নিই। কথা শেষ করে কিচেনে গিয়ে ময়নার মাকে মেহমানকে চা দিতে বলল। তারপর স্বামীকে ফোন করে সংক্ষেপে সব কিছু বলে এক্ষুণি বাসায় আসতে বলল। তারপর পোশাক পরিবর্তন করে সেলিমের কাছে এসে তার অতীত জীবনের সমস্ত কথা শুনতে লাগল।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে খালেদ এসে গেল। সেলিমের সঙ্গে সালাম ও পরিচয় বিনিময়ের পর সকলে রওয়ানা হল।

ম্যানেজার সেলিমের কাছ থেকে ফিরে এসে অফিসের সমস্ত ষ্টাফকে নিজের রুমে ডেকে পাঠালেন। সকলে এলে ম্যানেজার সাহেব বললেন, আপনাদেরকে একটা আশ্চর্য্যজনক আনন্দ সংবাদ জানাবার জন্য ডেকেছি। আমাদের এখানে যে মেয়েটা ষ্টেনোর কাজ করছে, সে আমাদের সাহেবের বাগদত্তা। সাহেব এ্যাকসিডেন্ট করে বিদেশে চিকিৎসার জন্য চলে গেলে, মেয়েটি ভাগ্যের ফেরে না জেনে এখানে চাকরি নেয়। সাহেব অফিসে আপনাদের সবার বায়োডাটা দেখার সময় মেয়েটির ফটো দেখে চিনতে পারে। আর আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে, সে কক্সবাজার বেড়াতে গেছে। তাই সেদিন বিকেলে কক্সবাজারে গিয়ে তাকে নিয়ে ফিরে এসেছে। আজ তার সঙ্গে সাহেবের সন্ধ্যার পর বিয়ে হবে। আপনারা সকলেই বিয়েতে আমন্ত্রিত।

ম্যানেজারের কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, আমরা মেয়েটিকে যা-তা বলে খুব অন্যায় করেছি।

তাদেরকে ফিস ফিস করে কথা বলতে শুনে ম্যানেজার সাহেব আবার বললেন,

আপনারা এখন যে যার কাজ করুন গিয়ে, সন্ধ্যার পর সকলেই বাসায় আসবেন।

সেলিম সুলাতানা ও খালেদকে নিয়ে ফিরে এল। ওরা ড্রইংরুমে এসে বসল। লাইলী সুলতানাকে নিয়ে বেডরুমে ঢুকে জড়িয়ে ধরে বলল, সই, আমি যে এখনও নিজেকে বোঝাতে পারছি না, এটা বাস্তব না স্বপ্ন।

সুলতানা বলল, আমিও তোর চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম, এটা বাস্তব না স্বপ্ন। এখন দেখছি সব বাস্তব। আল্লাহ তোদের সুখী করুক ভাই। একটা সোনার নেকলেস ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বের করে লাইলীর গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, এটা আমাদের তরফ থেকে তোকে উপহার দিলাম।

শুধু শুধু এত দামী জিনিষ দিতে গেলি কেন তোর ভালবাসাকে আমি এর চাইতে দামী মনে করি।

সেই ভালবাসার নমুনা স্বরূপই তো এটা তোকে উপহার দিলাম। যাকে ভালবাসি, তাকে কি আর কম দামী জিনিষ দিতে পারি ?

তোর খালেদ সাহেবের চেয়েও কি আমাকে বেশি ভালবাসিস ? বলে হেসে ফেলল।

দূর পাগলী, তোকে আর তাকে ভালবাসার মধ্যে অনেক পার্থক্য।

সে আবার কি রকম ?

অত ন্যাকা সাজিসনি। তবু বলছি শোন, তুই তো খালাম্মা আর সেলিমকে খুব ভালবাসিস। কেউ যদি তোকে জিজ্ঞেস করে, দু'জনের মধ্যে কাকে বেশি ভালবাসিস, তখন কি বলবি ?

বলব দুজনকেই বেশি ভালবাসি। এই কথায় দু'জনেই হেসে উঠল।

বিয়ে পড়াবার আগে সুলতানা সইকে মনের মত করে সাজাল। তারপর ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, দেখতো সই, ঐ মেয়েটিকে চিনতে পারিস কি না ?

লাইলী আয়নার দিকে চেয়ে সত্যি নিজেকে চিনতে পারল না। তার মনে হল, আয়নার মেয়েটি অন্য কেউ, লাইলী নয়।

কিরে চুপ করে আছিস কেন তারপর গাল টিপে দিয়ে বলল, সত্যি আল্লাহ তোকে এত রূপ দিয়ে বানিয়েছেন, সে আর কি বলব। তিনি যদি আমাকে পুরুষ করে বানাতেন তা হলে তোকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতাম। সেলিম খুব ভাগ্যবান। তার ভাগ্যকে আমি মেয়ে হয়েও হিংসা করছি।

লাইলী নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জা পেয়ে বলল, তুই বুঝি দেখতে খারাপ, তোর মত রূপ কটা মেয়ের আছে শুনি

তোর কথা মানি, কিন্তু আমার সই অদ্বিতীয়া।

রাত্রি এগারোটায় বিয়ের কাজ ও খাওয়া-দাওয়া মিটে গেল। আমন্ত্রিত অতিথিরা সব বিদায় নিয়ে চলে গেল। শুধু খালেদ স্ত্রীকে নিয়ে যাবে বলে খালেদ বরবেশি সেলিমের সঙ্গে ড্রইংরুমে বসে বসে গল্প করতে লাগল। সুলতানা বাসর ঘর সাজাতে ব্যস্ত। একটু পরে লাইলীকে বাসর বিছানায় বসিয়ে রেখে ড্রইংরুমে এসে সেলিমের হাত ধরে স্মীত হাস্যে বলল, চল ভাই, তোমার প্রিয়তমা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। যাওয়ার সময় স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি কপোতকে কপোতীর কাছে দিয়ে এক্ষুণি আসছি। তারপর এক রকম জোর করে সেলিমকে নিয়ে এসে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে আমার সইকে তোমার কাছে দিয়ে গেলাম। দেখবেন, সে যেন কোনো বিষয়ে কষ্ট না পায়। কষ্ট দিলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আল্লাহ তোমাদের সুখি করুন। আজ আসি আবার দেখা হবে। তারপর আল্লাহ হাফেজ বলে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে স্বামীর

কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, কি গো, আমার সই-এর বাসর রাত্রির কথা ভেবে তোমারও কী আমাকে নিয়ে বাসর করার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি

খালেদ হেসে বলল, তোমার অনুমান ঠিক। তবে আমার মন বলছে, তোমার মনের ইচ্ছটা আমার উপর দিয়ে বলে ফেললে। তারপর লাইলীর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দু'জনে হাসতে হাসতে বাসায় ফেরার জন্য গাড়িতে উঠল।

সেলিম বাসর ঘরে ঢুকে লাইলীর দিকে চেয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। যখন বুঝতে পারল সুলতানা ও খালেদ চলে গেছে, তখন ধীরে ধীরে খাটের কাছে গেল। লাইলী খাটের উপর বসে তার দিকে চেয়ে ছিল। সেলিম এগিয়ে এসে খাটের কাছে দাঁড়াতে খাট থেকে নেমে তার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল।

সেলিম তাকে দুহাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে তার কপালে চুমু খেয়ে সুবহান আল্লাহ বলে তার দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইল। সে লাইলীর রূপের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবে গেল। আগেও তো সে কতবার দেখেছে, কিন্তু এখনকার লাইলী যেন অন্য মেয়ে। তার মনে হল, বেহেস্তের হুর আসমান থেকে নেমে এসে তার হাতে ধরা দিয়েছে। বিয়ের পোশাকে ও নানারকম অলঙ্কারে সজ্জিত লাইলী যেন আসমান জমিনের সব রূপ কেড়ে নিয়েছে। সেলিম সেই রূপের সাগরে তলিয়ে গিয়ে বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

অনেকক্ষণ ঐভাবে তাকে নিয়ে সেলিমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লাইলী তার পূর্ব অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারল, সেলিম নিশ্চয় বাহ্যিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সে তখন দু হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ ঘসে বলল, এই, তোমার কষ্ট হচ্ছে না ? হাত ব্যাথা করবে তো, আমাকে নামাও না। তবু যখন সেলিমের হুঁস হল না তখন সেলিমের ঠোঁট নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে আস্তে কামড়ে ধরে রইল।

এবার সেলিম সজ্ঞানে ফিরে এল। তারপর সে লাইলীর সারা মুখে চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে শেষে তার লাল গোলাপী ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ফিস ফিস করে বলল, তুমি আমার ঠোঁট কামড়ে দিয়েছ, আমি তার শোধ তুলে নিই ?

লাইলী মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে লজ্জায় চোখ বন্ধ করে নিল। সেলিম তার নরম তুল তুলে ঠোঁটে নিজের ঠোঁট দিয়ে একটু চাপ দিয়ে বলল, সেই আল্লাহপাকের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জানাই, যিনি তোমাকে আমার সহধর্মিণী করেছেন। তারপর খাটে বসে লাইলীকে কোলের উপর রেখে জিজ্ঞেস করল, বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় আমার প্রতি তোমার খুব রাগ হয়েছিল তাই না ?

লাইলী অশ্রুপূর্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, আমার অন্তর্যামী জানেন, আমি তোমার কখনো দোষ খুঁজেছি কি না বা তোমাকে দোষী মনে করেছি কি না। ভেবেছি, আমার মত হতভাগিণী তোমার অযোগ্য, তাই এইরূপ হয়েছে। আজ যদি আব্বা বেঁচে থাকতেন, তা হলে সব থেকে বেশি খুশি হতেন।

সেলিম তার টস্ টসে রক্তিম গোলাপী ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বলল, চুপ। তোমাকে একদিন বারণ করেছিলাম না, নিজেকে কোনোদিন হতভাগিণী বলবে না ? তারপর অধরে অধর ঠেকিয়ে বলল, প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনও একথা বলবে না।

লাইলী আস্তে করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

সেলিম লাইলীকে পাশে বসিয়ে বলল, এস চাচাজানের রূহের মাগফেরাত কামনা করে আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া চাই। মোনাজাত শেষে লাইলী স্বামীর দুটো হাত নিজের মাথায় রেখে বলল, তুমি দোয়া কর, আমি যেন কখনও তোমার প্রেমের অমর্য্যাদা না করি।

সেলিম দোয়া করে বলল, আমি সত্যি তোমাকে নিজের করে পেয়েছি, না এখন

ও স্বপ্ন দেখছি.

লাইলী তার বুকে মাথা রেখে বলল. আল্লাহপাক যেন সারাজনম আমাদের এই স্বপ্ন না ভাঙ্গেন।

সেলিম লাইলীর কাছ থেকে সব ঘটনা জেনে নিয়ে বলল. ঐ রকম একটা চিঠি মাও পেয়েছে। মা যেদিন চিঠি পায়, সেদিন আমি এ্যাকসিডেন্ট করি। তাই সে তোমাকে অপয়া ভেবে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়। আমি মায়ের সে ভুল ভাঙ্গিয়ে দেব। তুমি মায়ের উপর মনে কোনো কষ্ট রাখনি তো

লাইলী বলল. আব্বা যেদিন গহনা ফেরৎ দিয়ে এলেন. সেদিন রাত্রেই হার্টের ব্যাথায় মারা যান। তখন খালা আম্মাকে দায়ী মনে করে তাঁর উপর আমার মনে কষ্ট হয়েছিল. কিন্তু পরে যখন আমার বিবেক বলল. কারুর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী হয় না. হায়াত মউত একমাত্র আল্লাহপাকের হাতে। তুমি না তকদীর বিশ্বাস কর ? তিনি যদি তোমাকে তার জোড়া করে পয়দা করে থাকেন, তা হলে বিয়ে ভেঙ্গে গেলেও জোড়া লাগতে কতক্ষণ তিনি সর্বশক্তিমান। যখন যা কিছু করার ইচ্ছে করেন. তখন শুধু বলেন. হও. আর তা তখুনি হয়ে যায়। এইসব চিন্তা করার পর থেকে তার প্রতি আমার মনের কষ্ট দূর হয়ে গেছে।

সেলিম লাইলীকে জড়িয়ে ধরে আবার সারামুখে চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে বলল. আল্লাহপাক তাঁর এক প্রিয় বান্দীর স্বামী করে আমাকে ধন্য করেছেন। সেই জন্যে আবার তাঁর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

লাইলীও তার স্বামীর সোহাগের প্রতিদান দিয়ে বলল. ইয়া আল্লাহ. তুমি তোমার এই নগণ্য বান্দীকে স্বামীর খেদমত করে তাকে সুখী করার তৌফিক দাও।

সে রাত্রে তারা ঘুমোতে পারল না। সারারাত প্রেমালাপ করে কাটাল। দুজনেরই মনে হয়েছে ঘুমিয়ে পড়লে যদি এই মধুময় স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। ফজরের আজান শুনে সেলিম বলল. আল্লাহপাক আজকের রাতটাকে বড় ছোট করে তৈরি করেছেন।

লাইলী মৃদু হেসে বলল. সুখের রাত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। তারপর দু'জনে একসঙ্গে ফজরের নামায পড়ে সেলিম বলল. এস. এবার একটু ঘুমিয়ে নিই।

লাইলী বলল. উঠতে বেলা হয়ে গেলে মা কি মনে করবেন ? আমার লজ্জা করবে না বুঝি ?

সেলিম বলল. মা সবকিছু জানেন। উনি কিছু মনে করবেন না। তারপর তারা আলিঙ্গানাবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

লাইলীর যখন ঘুম ভাঙল তখন দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং আওয়াজ করে বেলা নটা ঘোষণা করল। দেখল. এখনও সেলিম তাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার ঠোঁটে আস্তে করে একটা হাম দিয়ে খুব ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বাথরুমে গেল। ফিরে এসে ড্রেস চেঞ্জ করে সেলিমের পাশে বসে তার পায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করল।

সেলিমের ঘুম ভেঙে গেল। ধীরে ধীরে চোখ খুলে লাইলীকে বুকে টেনে নিল।

কিছুক্ষণ স্থির থেকে লাইলী বলল. এই. এবার উঠে পড়। সাড়ে নয়টা বাজে. আমি এখন মায়ের কাছে যাব কি করে ? ভীষণ লজ্জা করছে।

সেলিম তাকে আদর করতে করতে বলল. একজন পুরুষের বুকের উপর শুয়ে থাকতে লজ্জা করছে না বুঝি ?

লাইলী বলল. ধ্যেৎ. তুমি পুরুষ হতে যাবে কেন

তা হলে আমি কি মেয়ে মানুষ

মেয়ে মানুষও না পুরুষও না। তুমি যে আমার শাহানশাহ। আর আমাকে

আল্লাহপাক সেই শাহানশাহর চরণের সেবা করার জন্য আইনের মাধ্যমে বেঁধে দিয়েছেন। তারপর তার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলল, এভাবে অনন্তকাল থাকতে চাই, কিন্তু কর্তব্য বলে তো একটা কথা আছে। সোনা যে, এবার উঠে হাতমুখ ধুয়ে নাও। এখানে মা না থাকলে তোমাকে ছেড়ে উঠতাম না।

তোমার সাথে তর্কে কোনোদিন পারব না বলে সেলিম উঠে বাথরুমে গেল। ফিরে এলে লাইলী তোয়ালে এগিয়ে দিল।

সেলিম বলল, মায়ের কাছে যাবে না

লাইলী বলল, যাব তো; কিন্তু একজন ভদ্রলোক আমাকে এমন বিপদে ফেলেছেন যে, আমি এখন লজ্জায় মায়ের কাছে যেতে পারছি না।

তা হলে তো ভদ্রলোকটার শাস্তি হওয়া উচিৎ। দেবে নাকি শাস্তি বলে সেলিম মুখটা তার ঠোটের কাছে নিয়ে গেল।

লাইলী তার ঠোঁটে খুব আস্তে করে কামড়ে দিতে সেলিম ওকে জাপটে ধরল। লাইলী বলল, অপরাধ বেশি হয়ে যাচ্ছে।

সেলিম বলল, আমিও শাস্তি বেশি পেতে চাই।

লাইলী বলল, হার মানছি, প্লীজ ছেড়ে দাও। চল দুজনে আম্মাকে সালাম করব। কালকেই সালাম করা উচিৎ ছিল। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে নিয়ে এমনই মশগুল ছিলাম যে, সে কথা কারুরই মনে আসেনি। তার দোয়া নেওয়া উচিত।

সেলিম তাকে আলিঙ্গন মুক্ত করে বলল, চল। তারপর বলল, সত্যি তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। আল্লাহ তোমাকে রূপের সঙ্গে সবকটা গুণও দিয়েছেন। আর দেরি করে লাভ নেই বলে সে তার হাত ধরে এগোতে গেল। লাইলীকে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসতে দেখে বলল, কি হল যাবে না ?

শুধু গেঞ্জী গায়ে দিয়েই যাবে নাকি ?

সেলিম নিজের শরীরের দিকে চেয়ে বলল, তাই তো লাইলী ততক্ষণে তার জামাটা এনে হাতে দিল। তারপর দুজনে মায়ের ঘরে গেল।

হামিদা বানু জাভেদের সঙ্গে নাস্তা তৈরী করে সবেমাত্র বসে বসে মেয়ের ভাগ্যের কথা চিন্তা করছিলেন। তাদেরকে আসতে দেখে বললেন, এস বাবা এস।

ওরা পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল।

হামিদা বানু দুজনকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমা খেয়ে দোয়া করলেন, "আল্লাহপাক তোমাদের দু'জনকে অক্ষে ওম্বর করুন। তোমাদের সুখী করুন।" লাইলীর আব্বা বেঁচে থাকলে বড় খুশি হতেন।

সেলিম বলল, আল্লাহপাক তাঁর রূহের মাগফেরাত দিন। তাঁকে কাঁদতে দেখে সেলিম আবার বলল, আম্মা, আপনি কাঁদবেন না। সবকিছু আল্লাহপাকের ইচ্ছা। তারপর লাইলীকে বলল, তুমি নাস্তার ব্যবস্থা কর।

হামিদা বানু চোখ মুখ মুছে বললেন, তোমরা এখানে বস, নাস্তা তৈরি আছে। আমি জাভেদকে নিয়ে আসছি।

নাস্তা খেয়ে রুমে ফিরে এসে সেলিম বলল, নিচেই তো অফিস। যাওয়ার পারমিসান চাই। দূর হলে আজ অবশ্য যেতাম না।

লাইলী জামা-কাপড় এগিয়ে দিয়ে বলল, তোমার অফিসের টেনো কি করবে তার চাকরি আছে তো ?

সেলিম বলল, সে ম্যানেজার সাহেবের টেনো ছিল। তাকে মালিক প্রমোশন দিয়ে পার্টনার করে নিয়েছে। এখন সেও কোম্পানীর মালিক। মালিক তো আর নিজের অফিসে টেনোর কাজ করতে পারে না।

লইলী বলল, দুজন মালিকের মধ্যে একজন যখন অফিসের স্টাফের মত কাজ করতে পারে, তখন অন্যজনই বা পারবে কেন

দোষ আছে বলে আমি বলছি না। অন্য জন পুরুষ হলে কোনো কথা ছিল না। তিনি একজন মহিলা। যিনি বর্তমানে একজনের স্ত্রী। বিয়ের পর মেয়েদের আগের জীবনের সবকিছু পরিত্যাগ করে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার কাজ করবে।

লাইলী এরপর আর কিছু বলতে পারল না। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, ঠিক একটায় আসবে কিন্তু। তারপর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে উঠে দাঁড়াল।

সেলিম তাকে জড়িয়ে ধরে তার গোলাপী নরম ঠোঁটে চুমো খেয়ে বলল, তাই হবে, আসি, আল্লাহ হাফেজ।

লাইলীও বলল, আল্লাহ হাফেজ।

প্রতিদিন অফিসের পর সেলিম লাইলীকে নিয়ে বেড়াতে যায়। ছুটির দিনে সুলতানাদের বাসায় হৈ হুল্লোড় করে দিন কাটায়।

বিয়ের পর লাইলী সব কিছু জানিয়ে রহিমা ভাবিকে চিঠি দিয়েছে। তারা লাইলীর পত্র পেয়ে আল্লাহর কাছে শোকর গুজারী করেছে।

একদিন লাইলী স্বামীকে বলল, আম্মাকে পত্র দিয়ে তোমাদের বাড়ির সবাইকে আমাদের বিয়ের কথা জানাবে না ?

সেলিম বলল, না, আর কয়েকদিন পর দু'জনে এক সঙ্গে গিয়ে সবাইকে অবাক করে দেব। সেইজন্য ম্যানেজারকেও জানাতে নিষেধ করে দিয়েছি।

প্রায় মাসখানেক পর সেলিম আরিফের ট্রাঙ্কল পেল, মা খুব অসুস্থ, তুমি আজই আসবার চেষ্টা করবে। সেলিম ম্যানেজারকে ডেকে বলল, মা অসুস্থ, আরিফ ট্রাঙ্কল করেছে। আমি আজই যেতে চাই। আপনি বিমান অফিসে ফোন করে দেখুন, তিনটে সীট পাওয়া যাবে কিনা। যদি না পাওয়া যায়, তা হলে গাড়ি নিয়ে যাব। আপনি তাড়াতাড়ি ব্যাবস্থা করুন।

ম্যানেজার সাহেব বিমান অফিসে ফোন করে জেনে বলেন, একটা সীটও খালি নেই।

সেলিম বলল, ঠিক আছে আমি গাড়ি নিয়ে যাব।

স্বামীকে দুপুরের আগেই মন ভার করে আসতে দেখে লাইলী সালাম দিয়ে এগিয়ে এলে তার একটা হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, তোমার কী শরীর খারাপ ?

সেলিম সালামের জবাব দিয়ে তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখে জড়িয়ে ধরে বলল, আরিফ ট্রাঙ্কল করেছে, মায়ের অসুখ। আমি এক্ষুণি রওয়ানা হতে চাই। প্লেনে সীট নেই, তাই ঠিক করেছি, অফিসের গাড়ি নিয়ে যাব।

সেলিমের কথাগুলো লাইলীর কানে কান্নার মতো শোনাল। তার বুকে মাথা রেখে বলল, আল্লাহপাক আম্মাকে সহিসালামতে রাখুন। তুমি হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে একটু বিশ্রাম নাও। আমি মাকে নিয়ে সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছি।

সেলিম সবাইকে নিয়ে বেলা দু'টোয় রওয়ানা দিল। গাড়িতে লাইলী জিজ্ঞেস করল, আরিফ কে ?

সেলিম বলল, আরিফ আমার ছোট ভাই। ম্যাট্রিক পাশ করে ধর্মের দিকে খুব ঝুঁকে পড়ে। ধর্মের জ্ঞান আহরণের জন্য আজ থেকে প্রায় পাঁচ ছ বছর আগে কাউকে কিছু না জানিয়ে দেওবন্দ চলে গিয়েছিল। সেখানে পড়াশুনা শেষ করে মাস দুয়েক হল ফিরে এসেছে।

রাত্রি আটটায় ওরা ঢাকার বাড়িতে এসে পৌছাল। গাড়ির শব্দ শুনে আরিফ,

রুবীনা ও আসমা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারা এতক্ষণ সোহানা বেগমের কাছে ছিল। তার আজ এক সপ্তাহ খুব জ্বর। গতকাল ডাক্তার বলেছে, টাইফয়েডের লক্ষণ। তাই আরিফ সেলিমকে আসার জন্য ট্রাঙ্কল করেছিল। সেলিমের সঙ্গে লাইলীকে এবং আধা বয়সী একজন মহিলাকে দেখে ওরা সবাই অবাক হয়ে গেল।

সেলিম আরিফের সঙ্গে সালাম বিনিময় করে লাইলীকে দেখিয়ে বলল, তোদের ভাবি, আর উনি আমার শ্বাশুড়ী।

আসমা একরকম ছুটে এসে লাইলীকে জড়িয়ে ধরে বলল, ভাবি আপনি কেমন আছেন ?

সেলিম বলল, আসমা কি হচ্ছে ? আগে মায়ের কাছে চল, মা কেমন আছে ?

আসমা ভাবিকে ছেড়ে দিল। আরিফ ডাক্তারের কথাগুলো বলল। সকলে সোহানা বেগমের ঘরে এসে ঢুকল। উনি শুয়ে ছিলেন। জ্বর এখন একটু কম, রাত্রে বেশি বাড়ে। ওদের দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে উঠে হেলান দিয়ে বসলেন।

সেলিম মায়ের পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলল, তুমি এখন কেমন আছ মা সোহনা বেগম ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, এখন একটু সুস্থ বোধ করছি।

ততক্ষণে লাইলী এসে সোহানা বেগমের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আপনি আমাদের দুজনকে মাফ করে দিন মা।

সোহানা বেগম সবকিছু বুঝতে পারলেন। তিনি লাইলীকে জড়িয়ে ধরে তার মাকে কাছে এসে বসতে বলে বললেন, তোমরা কোনো অন্যায় করনি। যা কিছু করেছি আমি। তোমাদেরকে ভুল বুঝেছিলাম। সেলিম ভালো হয়ে সেদিন যে কথা বলেছে, তাতেই আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে। তারপর হামিদা বানুর হাত ধরে বললেন, বেয়ান সাহেবা, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। লাইলীর আব্বা এলেন না যে, তিনি বুঝি এখনও আমার উপর রাগ করে আছেন ?

সেলিম বলল, মা তিনি অনেকদিন আগে ইন্তেকাল করেছেন।

সোহানা বেগম অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, আল্লাহ তার ভালো করুন। সেদিন তার প্রতি ভালো ব্যবহার করিনি। তার কাছে ক্ষমা চাওয়া হল না। তারপর আঁচলে চোখ মুছে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁরে, এ বাড়ির বড় বৌ প্রথম বাড়িতে এল, তোরা একটু আনন্দ করবি না ? আরিফকে বললেন, তুই দোকান থেকে মিষ্টি আনতে দে। আর তোমরা সব দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বৌমাকে তার ঘরে নিয়ে যাও, অনেক দূর থেকে এসেছে, বিশ্রাম করুক।

লাইলী বলল, আম্মা, আপনি ওসব নিয়ে কিছু ভাববেন না। তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা এখন এ ঘর থেকে যাও। অসুস্থ শরীরে মানসিক টেনশন এলে মায়ের ক্ষতি হতে পারে।

লাইলীর কথায় যেন একটা আদেশের সুর রয়েছে। আর কথাটা এমনভাবে বলল, তা কেউ অমান্য করতে পারল না। সেলিম সবাইকে নিয়ে চলে গেল।

সকলে বেরিয়ে যাওয়ার পর লাইলী শাশুড়ীর বিছানা ঝেড়ে ঠিক করে দিয়ে তাকে শুইয়ে দিল। চার্ট দেখে ঔষধ খাইয়ে টেম্পারেচার দেখে চার্টে লিখে রাখল। তারপর পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আপনি আর একদম কথা বলবেন না, ঘুমোবার চেষ্টা করুন। আমি ঠিক সময় মত পথ্য ও ঔষধ খাওয়াব।

সোহানা বেগম নিজেকে সংযত করতে পারলেন না। তার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। ধরা গলায় বললেন, ঠিক যেন আমার মা। জান মা, ছোট

বেলায় আমার যখন জ্বর জ্বালা হত তখন আমার মাও ঠিক এই রকম করত।

লাইলী মিষ্টি ধমকের স্বরে বলল, আপনাকে কোনো কিছু চিন্তা করতে ও কথা বলতে নিষেধ করলাম না ? নিজের আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছে দিয়ে আবার বলল, ঘুমোবার চেষ্টা করুন মা।

সোহানা বেগম আর কথা বললেন না। চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেন, এত সুন্দর ও গুণবতী মেয়েকে ভুল বুঝে তার নামে কত দুর্নাম দিয়েছি। আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন তিনি মেয়েটির মধ্যে কি জিনিষ দিয়েছেন মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে বাধ্য করে ফেলল।

লাইলী যখন বুঝতে পারল উনি ঘুমিয়ে গেছেন, তখন ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে কম্বলটা বুক পর্যন্ত টেনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এতক্ষণ আরিফ রুবীনা ও আসমা সেলিমের কাছ থেকে লাইলীকে কি করে খুঁজে বের করে বিয়ে করল, সে সব কথা শুনছিল।

লাইলী সেখানে এসে দাঁড়াতে আরিফ প্রথমে তার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। তার দেখাদেখি আসমা ও রুবীনা করল।

লাইলী বলল, আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত দান করুন। তিনি আমাদের সবাইকে সব রকম বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত করুন। তারপর বলল, রাত অনেক হয়েছে, আর গল্প নয়, সকলে এশার নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়ার কাজ সেরে নাও। মায়ের অসুখ, সে কথা সকলের মনে রাখা উচিৎ।

আরিফ মাঝে মাঝে ভাবির দিকে না চেয়ে থাকতে পারছে না। দেখা অবধি ভাবিকে মানবী বলে বিশ্বাস করতে পারছে না। শুধু চিন্তা করছে, কোনো মানবী তো এত রূপবতী ও গুণবতী হতে পারে না। তার কথাগুলো যেন শুনতে মধুর মতো লাগে। তাকে সে মনের মধ্যে খুব উচ্চ আসনে বসিয়ে ফেলল।

খাওয়া দাওয়ার পর লাইলী বিছানা ঠিক করে মশারী খাটিয়ে স্বামীকে বলল, তুমি ঘুমাও। আমি মায়ের কাছে থাকব।

সেলিম বলল, তুমি ঘুমাও, আমি আমার মায়ের কাছে থাকব।

বিয়ের পর স্বামীর সবকিছুর উপর স্ত্রীর অধিকার হয়ে যায়। উনি এখন আমারও মা। তা ছাড়া স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর আরামের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখা।

সেলিম কৃত্রিম রাগের সঙ্গে বলল, আর স্বামী বুঝি স্ত্রীর আরামের দিকে লক্ষ্য রাখবে না ? আমি অতশত বুঝতে চাই না, তোমার সঙ্গে তর্কে কোনোদিন জিতেছি ? আমিও তোমার সঙ্গে মায়ের কাছে থাকব। তোমার হুকুম বাড়ির সকলের উপর চালিও কিন্তু আমার উপর নয়। তা ছাড়া স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর হুকুম মেনে চলা।

লাইলী মৃদু হেসে বলল, হয়েছে হয়েছে, বাবুর রাগ দেখ না ? আমি আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। স্বামীর হুকুম সবসময় মেনে চলব।

লাইলীর হাসিটা বিদ্যুতের মতো সেলিমের মনে আনান্দের ঝিলিক দিল। সে তাকে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করতে করতে বলল, আমি তোমাকে ছেড়ে আর একটা রাতও থাকতে পারব না।

লাইলী আবার মৃদু হেসে বলল, আমিও পারি নাকি ? তুমি অনেক দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে এসে ক্লান্ত হয়েছ। প্রথম অর্ধেক রাত্রি তুমি ঘুমাও, আমার ঘুম পেলে তোমাকে না হয় জাগিয়ে মায়ের কাছে রেখে এসে তারপর আমি ঘুমাব।

সেলিম তার গালটা আস্তে করে টিপে ছেড়ে দিয়ে বলল, সব সময় জিতবেই, একবারও হারাতে পারলাম না। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

লাইলী মশারী খুঁচে দিয়ে শাশুড়ীর ঘরে এসে দেখল, তিনি তখনও ঘুমোচ্ছেন। মাথায় হাত দিয়ে বুঝতে পারল জ্বর বেশি উঠেছে। চার্টে লেখা আছে টেম্পারেচার বেশি উঠলে মাথায় বরফ দিতে হবে। লাইলী আইস ব্যাগে বরফ ভরে মাথায় দিতে লাগল।

রাত তখন সাড়ে বারোটা, লাইলী আইস ব্যাগ শাশুড়ীর মাথায় ধরে বসে আছে। আরিফ ঘরে ঢুকে কয়েক মুহূর্ত লাইলীর শান্ত সৌম্য মুখের দিকে চেয়ে কাছে এসে বলল, ভাবি, আপনি এখনও জেগে আছেন ? গত কয়েক রাত জেগে আজ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এবার আপনি ঘুমোতে যান, আমি মায়ের কাছে বসছি।

লাইলী বলল, ভাবিকে কেউ আপনি করে বলে না। তারপর বলল, তুমি ঘুমাওগে যাও। আমার জন্য ভেব না, মেয়েদেরকে রাত জেগে সেবা করার ক্ষমতা ও ধৈর্য্য দিয়ে আল্লাহপাক তৈরি করেছেন। রাত জাগলে পুরুষদের শরীর ভেঙ্গে যায়। তা ছাড়া তোমরা এতদিন মায়ের সেবা করেছ, এবার আমাকে কিছু করতে দাও। যাও সোনা ভাই, ঘুমাওগে যাও। বড়দের কথার অবাধ্য, সুবোধ ছেলেরা হয় না। আমার অসুবিধা হলে তোমার ভাইয়াকে ডেকে নেব।

ভাবির কথা শুনে আরিফ মনে বড় শান্তি পেল। তখন তার ভাইয়ার সেদিনের কথা মনে পড়ল, "জানিস আরিফ, আমাদের সোসাইটির কলেজ ইউনিভার্সিটির কত মেয়ের সাথে তো পরিচিত হয়েছি, কিন্তু লাইলীর সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না, লাইলী অনন্যা।"

তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লাইলী আবার বলে উঠল, বড়দের কথার অবাধ্য হওয়া যে বেয়াদবী, তা তো তুমি আমার থেকে ভালো জান।

আরিফ নিজেকে সংযত করতে পারল না, অশ্রুসিক্ত নয়নে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলল, যাচ্ছি ভাবি, জীবনে কোনোদিন তোমার কথার অবাধ্য হওয়ার ধৃষ্টতা যেন আমার না হয়। তারপর হনহন করে চলে গেল।

ফজরের আজান শুনে লাইলী নিজের ঘরে এসে স্বামীকে জাগিয়ে বলল, আজান হয়ে গেছে ; তুমি নামায পড়ে মায়ের কাছে এসে বসবে। আমিও নামায পড়ব। এখনও বরফ দিতে হচ্ছে। রাত্রে জ্বর খুব বেশি উঠেছে, এখনও কমেনি। ডাক্তারকেও একবার কল দিতে হবে।

সেলিম তাড়াতাড়ি করে উঠে বলল, তোমার প্রতি খুব অবিচার করলাম। আমি নিজের ছেলে হয়ে স্বার্থপরের মত ঘুমালাম। আর তুমি বৌ হয়ে আমার মাকে সারারাত জেগে সেবা করলে ?

লাইলী বলল, এতে তোমার কোনো অপরাধ হয়নি। তোমাকে বিশ্রাম করতে দেওয়া এবং মায়ের সেবা করা দু'টোই আমার কর্তব্য। আমি তা করতে পেরে খুব আনন্দিত। এতে তোমার লজ্জা বা অনুশোচনা করার কিছু নেই।

দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা লাইলী শাশুড়ির সেবা করে চলছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে স্বামীর প্রতি কর্তব্যও করছে। এইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে লাইলী শাশুড়ির সেবা করে চলল। প্রায় বিশ পঁচিশ দিন যমে মানুষে টানা-টানি করার পর সোহানা বেগম এখন আরোগ্যের পথে।

আরো কয়েক দিন পর একদিন সকালের দিকে হামিদা বানু সোহানা বেগমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়ে জামাইকে সঙ্গে করে র‍্যাংকীন স্ট্রীটে নিজের বাড়িতে এলেন।

সবাইকে দেখে রহিমা ও জলিল সাহেব খুশি হলেন। সেরেলা রহিমা তাদেরকে

রান্না করতে দিল না। দুপুরে খুব ধুমধামের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া হল। এক ফাঁকে রহিমা লাইলীকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলল, কি সখি, সখাকে কেমন লাগছে ? একেই বলে সত্যিকারের প্রেম। তা না হলে যার সঙ্গে একবার বিয়ে ভেঙ্গে যায়, তার সঙ্গেই আবার বিয়ে। হাদিসে আছে, সাতী সাধ্বী নারীর মনের বাসনা আল্লাহ পূরণ করেন। হাদিস তো মিথ্যা হতে পারে না

লাইলী প্রথমে লজ্জায় কথা বলতে পারল না। একটু সময় নিয়ে বলল, দোয়া কর ভাবি, আমি যেন তাকে সুখী করতে পারি।

জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছ। দোয়া করি ভাই, আল্লাহপাক তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের করুন।

সাদেক ও ফিরোজা লাইলীকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমাদেরকে ছেড়ে দাদিকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিলে ? আবার যাবে না তো ?

রহিমা ছেলে মেয়েকে বোঝাল, তোমাদের ফুপু আম্মার বিয়ে হয়ে গেছে। সে তো তার শ্বশুর বাড়িতে যাবেই। তবে তোমাদের দাদি থাকবেন।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর হামিদা বানু কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে জামাইকে বিদায় দিলেন।

সেলিম বলল, মা আপনি কাঁদবেন না। যখনই আপনার মন খারাপ হবে অথবা প্রয়োজনবোধ করবেন তখনই খবর দেবেন। আমি ঘরে না থাকলেও আপনার মেয়ে চলে আসবে। ছেলের অপরাধ যদি না নেন, তা হলে বলি, আমার ইচ্ছা আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে সব সময় থাকুন। আপনিও আমার মা। ছেলেকে মায়ের সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।

সেলিমের কথা শুনে হামিদা বানু চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না। বললেন, আল্লাহ তোমাদের সুখে রাখুন। তোমাকে আমিও ছেলের মত জানি। আমি স্বামীর ভিটে ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে শান্তি পাব না। আর তোমার মত জামাই পেয়েছি .সে আমার নয়নের পুতলী লাইলীর জন্য কোনো চিন্তা নেই। তোমরা সময় করে দুজনে এসে আমাকে দেখা দিয়ে যেও। তা হলেই আমি খুশি হব, শান্তি পাব।

লাইলী মাকে সালাম করে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

সেলিম বলল, লাইলী তুমি কাঁদছ ? কোথায় তুমি মাকে শান্তনা দেবে ? তা না করে নিজেই ভেঙে পড়ছ ?

লাইলী সেলিমের কথা শুনে সামলে নিয়ে মাকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর চোখ
বলল, তুমি কেঁদ না মা ? কোনো চিন্তাও করো না, আমি প্রায়ই আসব।

সেলিমও শাশুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল।

কিছু দিনের মধ্যে সোহানা বেগম সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি লাইলীকে যতই দেখছেন ততই মুগ্ধ হচ্ছেন আর ভাবছেন; কে বলবে, সে একজন সাধারণ ঘরের মেয়ে। আচার-ব্যাবহারে, চাল-চলনে, কথা--বার্তায় এবং আদর আপ্যায়নে সর্ব বিষয়ে পারদর্শী। কেউ তার কোনো কিছুতে এতটুকু দোষ ধরতে পারেনি। লাইলীকে পুত্রবধূ হিসাবে পেয়ে সোহানা বেগম যেমন আনন্দিত তেমনি গর্বিতও।

কোটিপতির ছেলে সেলিম। উচ্চশিক্ষিত ও আল্ট্রামডার্ণ সোসাইটিতে মানুষ হয়ে একটা গরিব ঘরের সেকেলে আনকালচার্ড মেয়েকে বিয়ে করেছে শুনে অনেক উচ্চশিক্ষিত ও আল্ট্রামডার্ণ বন্ধু-বান্ধবী লাইলীকে দেখার জন্য তাদের বাড়িতে আসে। বন্ধুদের মধ্যে অনেকে তাদের সুন্দরী অর্ধনগ্ন বোন অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে সেলিমকে ক্রিটীসাইজ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু যখন সেই আটপৌরে মেয়ে

সাধারণ পোশাকে গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে স্বামীর সঙ্গে তাদের অভ্যর্থনা করে তখন তাকে দেখে, তার মার্জিত ভাষা শুনে ও সুমিষ্ট ব্যাবহারে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়। তাদের সেই ঈর্ষা ও রাগ কোথায় যেন উড়ে যায়। অর্ধনগ্না মেয়েরা তাদের শরীরের খোলা অঙ্গগুলো ঢেকে দেয়। তারা লাইলীকে যত দেখে, তার সঙ্গে যত কথা বলে ততই তারা আকৃষ্ট হতে থাকে। শেষে সবাই তাকে তাদের মনের উচ্চ আসনে বসায়, যেখানে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রিটিসাইজ মনোভাবের স্থান নেই। বাড়ি ফেরার সময় প্রত্যেকে তাকে সাদর নিমন্ত্রণ করে। বন্ধুরা বলে, সত্যি সেলিম, তোর মতো ভাগ্য আর কারো হয় না। আল্লাহ তোদের দু'জনকে ঠিক যেন এক বৃন্তে দু'টো ফুল করে সৃষ্টি করেছেন। তোরা দুজনে একে অন্যের জন্য সৃষ্টি হয়েছিস। তোদের মতো এত সুন্দর মিল, সারা পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। ঐ দলে রেহানা আর মনিরুলও থাকে। তাদের মনেও আর কোনো ঈর্ষা বা রাগ নেই। লাইলীর ব্যাবহারে সব দূর হয়ে গেছে।

একদিন রেহানা লাইলীকে আসমার কথা উত্থাপন করে সেদিনের ঘটনাটা বলল।

লাইলী বলল, আসমার পরিচয় পেলে তুমি চমকে উঠবে। আর তোমার সেলিম ভাই-এর কথা যে বলছ, ওর চেয়ে চরিত্রবান ছেলে এ পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। তোমাকে একটা কথা বলি শোন, কখন পরের ছিদ্র অন্বেষণ করবে না বরং অন্যের ভালো গুণগুলো দেখবে। অন্যের কোনো দোষ দেখলে নিজের দিকে লক্ষ্য করবে। দেখবে তোমার সে দোষ আছে কিনা। যদি থাকে তবে তা সংশোধন করার চেষ্টা করবে। হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,"যে অন্যের দোষ পাঁচ জনের কাছে প্রকাশ না করে তার সম্মান বাঁচায়, কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহ পাকও তার অনেক গুনাহ গোপন রাখবেন, যা মিজানের পাল্লায় দিলে সে জাহান্নামী হত।"[১]

রেহানা লাইলীর কথা শুনে খুব খুশি হল। জিজ্ঞেস করল, আসমার পরিচয় পেলে চমকে উঠব কেন

সে কথা এখন বলতে পারব না, তোমার ভাইয়ের নিষেধ। তবে চিন্তা কর না, খুব শিঘ্রী তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে।

মনিরুল ইদানিং এ বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে। প্রায় প্রতিদিন রুবীনা কলেজ থেকে ফেরার সময় আসে। তার সঙ্গে গল্প করে। মাঝে মাঝে দু'জনে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যায়।

সেলিম এর মধ্যে কয়েকবার চিটাগাং গিয়েছে। দুই একদিনের বেশি সেখানে থাকতে পারে না। এক রাতে চিটাগাং থেকে ফিরে লাইলীকে বলল, মা তো ভালো হয়ে গেছে। তুমি এবার আমার সঙ্গে চিটাগাং চল। এ রকম দু'একদিন ছাড়া যাতায়াত করে অফিসের অনেক ক্ষতি হচ্ছে।

লাইলী বলল, তুমি নিয়ে গেলেই যাব। তবে মায়ের শরীর আর একটু ইমপ্রুভ করলে তারপর গেলে ভালো হত।

সেলিম বলল, বেশ তাই হোক। গৃহকর্তি লাইলী আরজুমান বানুর কথা কি অমান্য করতে পারি

তুমি আমার পুরো নাম জানলে কেমন করে

কেন কাবিননামা লেখার সময় জেনেছি। সত্যি তোমার নামটাও তোমার মতই অপূর্ব সুন্দর। যিনি তোমার এই নাম রেখেছিলেন, তাঁকে জানাই শত শত ধন্যবাদ।

রেহানাও মনিরুলের মতো ঘন ঘন এ বাড়িতে আসতে শুরু করেছে। আগে সে

---

(১) বর্ণনায় আবু হোরাইরা (রাঃ)-তিরমিজী।

সেলিমের সঙ্গে বেড়াতে যেত, ব্যাটমিন্টন খেলত। এখন লাইলীর সঙ্গে গল্প করে। বিকেলে চায়ের আসরে গল্প বেশ জমে উঠে। লাইলী তাদেরকে কোরআন ও হাদিসের অনেক উপদেশ মূলক গল্প বলে এবং ইসলামের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ইসলামের মহান আদর্শের দৃষ্টান্ত দেয়। সোহানা বেগমও সেই সব শোনেন লাইলীর চেষ্টায় এবাড়ির সকলে নামাজ পড়ছে। শুধু রুবীনা ধরব ধরব করছে।

একদিন লাইলী দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় গা এলিয়ে বেহেস্তী জেওর বইটি পড়ছিল। সেলিম চিটাগাং গেছে।

এমন সময় রেহানা ঘরে ঢুকে বলল, ভাবি ঘুমিয়ে গেছ নাকি রেহানা লাইলীর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে মনেপ্রাণে ভালবেসে ফেলেছে। একদিন না দেখলে থাকতে পারে না। সে লাইলীর মহব্বতে ও তার কাছে ধর্মীয় জ্ঞান পেয়ে চাল-চলন ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে ফেলেছে। মন থেকে তার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ দূর করে দিয়েছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। তাই প্রতিদিন বিকালে লাইলীর কাছে ছুটে আসে।

লাইলী বিছানার উপর উঠে বসে বলল, না ভাই ঘুমোইনি। তারপর বইটি দেখিয়ে বলল, এটা পড়ছিলাম। তুমিও পড়ো। এতে মেয়েদের অনেক শেখার জিনিষ আছে। এস, বস। আজ যে বড় তাড়াতাড়ি এসে গেছ

রেহানা বলল, তুমি যে কি যাদু করেছ ভেবে পাইনি। সব সময় শুধু তোমার কথা মনে পড়ে। তারপর বিছানার উপর তার পাশে বসে আবার বলল, ভাবি বল না, তুমি যাদু জান কি না

লাইলী বলল, না ভাই ওসব কিছু জানি না। তবে তোমাকে আমিও খুব ভালবেসে ফেলেছি। ওসব কথা বাদ দাও, আজ তোমাকে দুএকটা কথা বলব, তুমি যদি মনে কিছু না কর।

রেহানা বলল, তোমার কথায় আমি কিছু মনে করব না, তুমি নিশ্চিন্তে বল।

লাইলী বলল, দেখ বোন, আমার প্রায় মনে হয়, ওকে যেন আমি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি। এই চিন্তাটা আমার অন্তরে সব সময় কাঁটার মত বিঁধে। আল্লাহপাকের কসম করে বলছি, তোমার প্রতি আমার এতটুকু দুষমনি মনোভাব ছিল না, আজও নেই। আর আল্লাহপাককে জানাই ভবিষ্যতেও যেন না হয়। হঠাৎ কি করতে কি হয়ে গেল। আমরা দু'জন দু'জনকে ভালবেসে ফেললাম। তুমি নিউমার্কেটে একদিন এব্যাপারে কিছু কথা বলেছিলে। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। তা ছাড়া তার আগে আমি জানতাম না তোমাদের দুজনের সম্পর্ক। যাই হোক, তোমার কথা শুনে আমি দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওর কথা ভেবে পারিনি। আমি শত দুঃখ পেলেও সবকিছু সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু তোমার দাদা তার অনেক আগে আমাকে স্পষ্ট করে বলেছিল, আল্লাহপাক ছাড়া দুনিয়ার কোনো শক্তি আমার কাছ থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে নিতে পারবে না। যদি তুমি নিজে সরে যাও তবে হয় আমি পাগল হয়ে যাব, নচেৎ আত্মহত্যা করে ফেলব। আমি তোমার দাদার পরিণতির কথা চিন্তা করে তোমার কথা রাখতে পারিনি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, নচেৎ চিরকাল এই অশান্তিতে ভুগব।

রেহানা ভেজা কণ্ঠে বলল, তুমি ক্ষমা চেয়ে আমাকে আরো বেশি অপরাধী করো না। তুমি যে কত মহৎ, তা অন্ধ মোহের বশবর্তী হয়ে তখন বুঝিনি। আল্লাহ তোমাকে সেলিম ভাই-এর উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। আমার মতো মেয়ে তার উপযুক্ত নয়। আমি ঈর্ষা ও রাগের বশবর্তী হয়ে নিউমার্কেটে যাতা করে বলেছি এবং ফাংশানের দিনে নানাভাবে অপমান করার চেষ্টা করেছি। সেইসব কথা এখন মনে

হলে মরমে মরে যাই। আমার সেইসব দুর্মতির জন্য এখন তোমার কাছে মাফ চাইছি বলে লাইলীর হাত ধরে কেঁদে ফেলল।

লাইলী রেহানাকে জড়িয়ে ধরে বলল, এ ব্যাপারে তোমার কোনো অন্যায় হয়নি। আর হলেও আমি কিছু মনে রাখিনি। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তারপর নিজের আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছে দেওয়ার বলল, চল বারান্দায় গিয়ে চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে। ঘর থেকে বেরোবার সময় বলল, তুমি যদি বল, তা হলে তোমার জন্য পাত্র দেখতে পারি। আমার হাতে একটা খুব ভালো ছেলে আছে। সব দিক থেকে সে তোমার উপযুক্ত। রেহানা কিছু না বলে শুধু তার দিকে একবার চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চায়ের টেবিলে এসে বসল।

আরিফের জন্য মেয়ে খোঁজ করা চলছে। সেদিন চায়ের টেবিলে সেও ছিল। লাইলী তাকে বলল, আমি তোমার জন্য একটা মেয়ে চয়েস করেছি।

আরিফ বলল, একটা কেন হাজারটা চয়েস কর, তাতে কোনো আসে যায় না। কিন্তু মনে রেখ, আজকাল কলেজ-ইউনিভার্সিটির মেয়েরা ধর্ম মেনে চলা তো দূরের কথা, ধর্মের নাম শুনলেই নাক ছিটকায়।

লাইলী বলল, সব মেয়েরা কি এক রকম হয় ? হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান ? আমিও তো কলেজ-ভার্সিটিতে পড়েছি। তাদের মধ্যে ভালো মেয়েও আছে।

আরিফ বলল, ভাইয়াই তোমার সঙ্গে তর্কে পারেনি, আর আমি তো কোন ছার। অতশত বুঝি না, আপটুডেট ডিসকো-মিসকো মেয়ে হলে আমি তো অসুখী হবই, আর তোমাদের সাথেও বনিবনা হবে না। শেষে সকলেই অশান্তি ভোগ করব।

লাইলী বলল, তা হলে তো তোমাকে তোমার ভাইয়ার মত গরিব ঘরের মেয়ে বিয়ে করতে হয়

তা হোক, তাতেও আমি রাজি। আমি কি তোমাদের বলেছি নাকি, বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করব ?

সোহানা বেগম সেখানে ছিলেন না। একটু আগে এসে দেওর ভাবির কথা শুনছিলেন। হেসে ফেলে আরিফকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যে ধরনের মেয়ে আসুক না কেন, তুই যদি ঠিক থাকিস, তা হলে আমার মা লাইলী তাকে দুদিনেই মানুষ করে ফেলবে।

আরিফ মায়ের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে রেহানার দিকে একপলক চেয়ে পালিয়ে গেল।

রেহানাও তার দিকে চেয়েছিল, দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল।

লাইলী প্রায়ই লক্ষ্য করে ওরা মাঝে মাঝে একে অপরের দিকে গোপনে গোপনে তাকায়। আজকের ঘটনার পর থেকে তার মনে যেন একটু সন্দেহ হল।

আসমা ফাষ্ট ডিভিসনে আই এ, পাশ করল। সেলিম তাকে জয়দেবপুরে কনভেন্ট স্কুলে প্রাইমারী সেকশানে মাষ্টারী পাইয়ে দিল। সে ছেলেকে নিয়ে সেখানে থাকে। আর প্রাইভেটে বি, এ পরীক্ষা দেবার জন্য পড়াশোনা করতে লাগল। প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে ছেলেকে নিয়ে সে সেলিমদের বাড়িতে আসে। এক ছুটির দিন স্কুলে ফাংশান ছিল বলে আসতে পারল না। সেলিম গত রাত্রে বাড়ি ফিরেছে। দুপুর পর্যন্ত আসমা এল না। বেলা তিনটার দিকে মনিরুল

এসেছে। সে আজ রুবীনাকে নিয়ে কোথায় যেন যাবে। সেলিম খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল। লাইলী সবাইকে খাইয়ে নিজেও খেল। তারপর হাতের কাজ সেরে স্বামীর পাশে এসে বসে বলল, একটা কথা বলব তুমি যেন আবার মাইন্ড করো না ?

সেলিম বলল, আমি তোমার কথায় কখনো মাইন্ড করেছি ?

লাইলী বলল, রুবীনা মনিরুলের সঙ্গে প্রতিদিন বেড়াতে যায়। ফিরে আসে রাত করে। ও এখন বড় হয়েছে। অত রাতে বাড়ি ফেরা আমি ভালো মনে করি না।

সেলিম বলল, তুমি ঠিক বলেছ। আমিও মাঝে মাঝে তা লক্ষ্য করেছি। তোমাকে তো সেদিন আসমা আর মনিরুলের ব্যাপারটা বলেছি। এক কাজ কর, আজ আমরা সবাই আসমাকে দেখতে যাই চল। সে আজ কেন এল না ? নিশ্চয়ই কোনো অসুখ বিসুখ হয়েছে। রেহানা এসেছে কি ?

লাইলী বলল, হ্যাঁ সে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। সেলিম বলল, তুমি রেহানা, মনিরুল ও রুবীনাকে কথাটা বলে এসে তৈরি হয়ে নাও। আমরা এক্ষুণি বেরুব।

দু'টো গাড়িতে করে সকলে এসে কনভেন্ট স্কুলের গেটের কাছে নামল। স্কুলের ফাংশান অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। আসমাকে ফাংশানে অনেক খাটাখাটনি করতে হয়েছে। তাই ক্লান্ত হয়ে স্টোভে চা করে ছেলেকে নিয়ে খাচ্ছিল।

সেলিম আসমার রুম চেনে। সবাইকে নিয়ে এগোল।

তাদেরকে দেখতে পেয়ে আসমা সালাম দিয়ে লাইলীকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার কি সৌভাগ্য, তোমরা এই হতভাগীর কাছে এসেছ ? সে মনিরুলকে লক্ষ্য করেনি।

সেলিম বলল, আজ বাড়িতে এলি না, ভাবলুম তোর কোনো অসুখ বিসুখ হল কিনা। তাই দেখতে এলুম।

আসমা বলল, আজ স্কুলে একটা ফাংশান ছিল। তাই যেতে পারিনি। ভাবছিলাম, এক্ষুণি সেকথা ফোনে তোমাদের জানাব। তোমরা এসে খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু এত লোককে কোথায় বসতে দেব ? লাইলীর দিকে চেয়ে বলল, তুমি বল না ভাবি, আমি এখন কি করব ?

লাইলী আসমার ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বলল, তোমাকে কিছু করতে হবে না, ঘরে চাবি দিয়ে তুমিও আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়। কোনো হোটেলে গিয়ে তোমার ভাইয়ার পকেট খালি করে দিই।

সেলিম বলল, তাই চল বাইরে কোথাও যাই। তারপর মনিরুলের দিকে একবার চেয়ে সকলের অলক্ষ্যে লাইলীর কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল, ওদের দুজনকে রেখে রেহানা ও রুবীনাকে সাথে করে বাইরে চলে এস।

লাইলী আসমাকে বলল, আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এস।

ওরা বাইরে চলে যাওয়ার পর মনিরুলের দিকে আসমার লক্ষ্য পড়ল। দেখল, সে তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মনিরুল আসমাকে দেখে ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। তার মনে তখন চিন্তার ঝড় বইছে। রেহানার মুখে সে একদিন শুনেছিল, আসমা নামে একটা মেয়ে সেলিমদের বাড়িতে আছে। সেদিন নামটা শুনে মনে মনে চমকে উঠেছিল। পরে ভেবেছে আসমা নামে তো অনেক মেয়ে আছে। কিন্তু আজকে যেন নিজের চোখকে

বিশ্বাস করতে পারছে না। তার মনে হল, এই দিন-দুপুরে স্বপ্ন দেখছে না তো ? কিছুক্ষণ দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে রইল। আসমা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, মনিরুল ভাই, আমাকে চিনতে পারছ ?

মনিরুল কি বলবে ভেবে ঠিক করতে পারল না। তার মনের পর্দায় তখন অনেক দিন আগের কুমিল্লার একটা বাগান বাড়ির কথা মনে পড়ল। সেই বাগানে কত দিন এই মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করেছে। শহরে ফিরে তার কথা ভুলে গিয়েছিল। তার জীবনে এমন কত মেয়ে আসে যায়, কটাকে মনে রাখবে। আজ আসমাকে দেখে তার বিবেক বলল, মনিরুল, তুমি এমন রত্নকে হারিও না। বুঝতে পারছ না, তোমার জন্য সে বাপ মায়ের দেশ ছেড়ে এসে কি রকম তপস্যা করছে। এখনও তোমার শুধরাবার সময় আছে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আসমা আবার বলল, বড়লোকেরা গরিবদের মানুষ বলে গণ্য করে না। তিন চার বছর আগের আসমাকে কি আর তোমার মনে আছে। এর মধ্যে কত আসমা তোমার জীবনে এসেছে। গরিবদের যতটুকু দয়া দেখাও, তা শুধু নিজেদের স্বার্থের খাতিরে। যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে দয়াও নেই। মনে হচ্ছে, না জেনে তুমি এখানে এসে পড়েছ। আমি তোমার কাছে কোনো আব্দার বা দাবী করব না, শুধু ঐ ছেলেটাকে পিতৃত্বের পরিচয় দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা কর। তারপর মনিরুলের দু'পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

সেলিম ও লাইলী আসমার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অবাক হল। রেহানা সব দেখেশুনে একেবারে থ হয়ে গেল। সে জানত, ভাইয়া মেয়েদেরকে নিয়ে একটু হৈ হুল্লোড় করে। তা বলে বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে একটা গরিবের মেয়ের সর্বনাশ করে আসবে, সেকথা কল্পনাও করেনি। রেগে মেগে ঘরের ভিতরে যেতে উদ্যত হলে সেলিম তার একটা হাত ধরে আস্তে আস্তে বলল, এখনও সময় হয়নি, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।

এদিকে রুবীনাও ভীষণ রেগে গেল। কাল তাদের রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে হওয়ার কথা। সে কোনো রকমে টলতে টলতে গাড়িতে গিয়ে বসল।

আসমা ঐ অবস্থায় বলে চলল, যখন আমি বুঝতে পারলাম মা হতে চলেছি তখন তোমাকে দিনের পর দিন পাগলের মত চিঠি লিখেছি। কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। শেষে লোক জানাজানির ভয়ে একরাত্রে ঘর থেকে পালিয়ে তোমার দেওয়া ঠিকানায় গেলাম। তোমাকে পেলাম না। পেলাম একজন বয়স্ক লোককে। মনে হয় তিনি তোমার বাবা। সব শুনে তিনি লাঞ্ছনা গঞ্চনা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর অনেক ঘটনা ঘটেছে। শেষে সেলিম ভাই আশ্রয় দিয়ে নিজের বোনের মত দেখছে। তবে যত কিছু ঘটুক না কেন, আজ পর্যন্ত তুমি ছাড়া আর কেউ আমার শরীরে হাত দিতে পারেনি। জানি না, এসব তুমি বিশ্বাস করবে কিনা ? যদি তুমি আমাকে আর তোমার ছেলেকে পথের কাঁটা বলে মনে কর, তবে খাবারের সঙ্গে বিষ মাখিয়ে এনে দিও। তাই খেয়ে তোমার আপদ দূর হয়ে যাবে।

মনিরুল আর সহ্য করতে পারল না। একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। সে ভুলে গেল বারান্দায় তার সঙ্গীরা থাকতে পারে। ঝুঁকে পড়ে আসমাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে ভিজে গলায় বলল, আসমা, তুমি আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়েছ। আমি তোমার কাছে চরম অন্যায় করেছি। মাফ করে দিয়ে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দাও। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমার অন্যায়ের জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হৃদয়ে তোমার কাছে মাফ চাইছি। বল আসমা বল, মাফ করে দিয়ে আমাকে সংশোধন

হওয়ার সুযোগ দিবে

আসমাও মনিরুলকে আঁকড়ে ধরে ফোঁপাতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আসমা নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে কাপড়টা ঠিক করে বলল, আল্লাহ কি এত সুখ আমার কপালে রেখেছেন ? আমার স্বপ্ন কি সফল হবে ? তুমি যা বলবে তাই করব। এখন বাথরুম থেকে চোখে-মুখে পানি দিয়ে ধুয়ে এস। ওরা সবাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

মনিরুল বাথরুম থেকে এসে বলল, তুমি এখানে থাক, আমি আসছি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ওরা সবাই তখন গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছিল। সে তাদের কাছে এসে লাইলীর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বলল, ভাবি, ওকে আমার কাছে দিন। আপনারা তো সবকিছু জানেন। আপনারা যান, ওর সঙ্গে আমার আরও কথা আছে।

লাইলী ছেলেটাকে কোল থেকে নামাতে নামাতে বলল, যাও সোনামনি তোমার আব্বুর কাছে যাও।

মনিরুল আর কোনো কথা না বলে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে আসমার কাছে ফিরে এল।

সেলিম সবাইকে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

রুবীনা বলল, ভাইয়া আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, আমাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে তোমরা যেখানে খুশি যাও।

রেহানা বলল, আজ বেড়াবার মুড নষ্ট হয়ে গেছে, তোমরা যাও। আমি বাড়ি চললাম বলে নিজেদের গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

মনিরুল ছেলেকে বুকে করে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, এর নাম কি রেখেছ ?

ছেলেসহ মনিরুলকে আসতে দেখে আসমার চোখে আবার পানিতে ভরে গেল। ধরা গলায় বলল, রফিকুল ইসলাম।

রফিকুল মনিরুলের বুকে থেকেই বলল, আম্মা, মামী বললেন, ইনি আমার আব্বু। তুমি এতদিন আমাকে আব্বুর কাছে নিয়ে যাওনি কেন ? মা কিছু বলছে না দেখে সে মনিরুলের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমার আব্বু ?

ছেলেকে আদর করে বুকে চেপে ধরে মনিরুল বলল, হ্যাঁ সোনা, আমি তোমার আব্বু। রফিক মায়ের কাছে ছাড়া এত আদর আর কারও কাছ থেকে পায়নি। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, এতদিন আসেননি কেন ? আম্মা কত কাঁদে।

এইতো এসেছি বাবা আর তোমার আম্মা কাঁদবে না। তারপর আসমাকে বলল, চল একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

আজ আমি বড় ক্লান্ত। তুমি বস, আমি চা করে নিয়ে আসি। পাশেই রান্না ঘর। সেখান থেকে কয়েকটা বিস্কুট বের করে মনিরুলকে খেতে দিল।

রফিক বলে উঠল, আমিও চা খাব আম্মা।

মনিরুল ছেলের দু'হাতে চারটে বিস্কুট দিয়ে বলল, আগে এগুলো খেয়ে নাও, পরে চা খাবে।

চা খাওয়ার সময় মনিরুল বলল, তুমি আগামীকাল ছুটি নেবে। আমি ঠিক দশটার দিকে আসব। তুমি রেডী থাকবে। কালকেই বিয়ের কাজটা সারতে চাই। আসমা বলল, বেশ, তাই হবে। মনিরুল বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মনিরুলকে বিদায় দিয়ে আসমা চোখের পানি ফেলছিল। রফিক মাকে কাঁদতে দেখে বলল, আব্বু চলে গেছে বলে তুমি কাঁদছো ? আবার কখন আব্বু আসবেন ?

আসমা চোখ মুছে ছেলেকে চুমো খেয়ে বলল, তোমার আব্বু আবার কালকে

আসবেন।

পরের দিন ঠিক দশটায় স্কুলের গেটের কাছে মনিরুলকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে আসমা এগিয়ে এসে সালাম দিল।

মনিরুল সালামের উত্তর দিয়ে বলল, তুমি তৈরি ?

আসমা মাথা নেড়ে সায় দিল।

রফিক কোথায় ?

তাকে রিজিয়া নামে আমার এক সহকর্মির তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছি।

তা হলে এস বলে মনিরুল গাড়িতে উঠে পাশের গেট খুলে দিল।

মনিরুল তাকে নিয়ে কাজি অফিসে গিয়ে কাবিন ও বিয়ের কাজ সারল। তারপর বেলা দুটোর সময় ফিরে এল। রিজিয়াকে রফিক বড় বিরক্ত করছিল। তার মায়ের জন্য খুব কাঁন্নাকাটি করছিল। মার সঙ্গে আব্বাকে দেখতে পেয়ে কাঁন্না থামিয়ে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ? আমি তোমার জন্য কাঁদছিলাম। তারপর মনিরুলের দিকে চেয়ে বলল, আপনি আম্মাকে নিয়ে গেলেন, আমাকেও নিয়ে গেলেন না কেন ?

মনিরুল ছেলেকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে বলল, আমরা একটা কাজে গিয়েছিলাম। এবার আর কখনো তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না। তারপর আসমাকে বলল, তুমি সব গুছিয়ে নাও, আমি তোমাদের হেড মিষ্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করে এখনই আসছি।

হেড মিষ্ট্রেস একজন অচেনা লোককে রফিককে কোলে নিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চান ?

মনিরুল রফিককে দেখিয়ে বলল, ওর মা আসমা আমার স্ত্রী, তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই। তাই আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।

হেড মিষ্ট্রেস বসতে বলে বললেন, স্বামীর বাড়ি তো মেয়েদের নিজের বাড়ি। নিয়ে যাবেন ভালো কথা। আসমা কী চাকরি রিজাইন দিয়ে একেবারে চলে যেতে চায় নাকি ? তা হলে কিন্তু আমার আপত্তি আছে। কারণ ওর মত মেয়ে পাওয়া মুশকিল। বাচ্চারা আসমা আপা বলতে অজ্ঞান। এতদিন আমি শাসন করে যা পারি নি, মাত্র কয়েক মাস হল এসে সে তার থেকে অনেক বেশি করেছে।

মনিরুল বলল, দেখুন চাকরি করবে কি না করবে সে কথা ও আপনাকে পরে জানাবে।

সেলিম সাহেব আপনার কে হন ?

ফুপাতো ভাই।

ঠিক আছে ওকে নিয়ে যান। যাওয়ার আগে একটা ছুটির দরখাস্ত দিয়ে যেতে বলুন।

সব ব্যবস্থা করে ওরা গাড়িতে উঠল। সামনের সীটে সবাই বসেছে।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর রফিক বলল: আব্বু এটা তোমার গাড়ি ? সে মাঝখানে বসেছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে মনিরুল ছেলের গালটা আলতো করে টিপে আদর করে বলল, হ্যাঁ আব্বু, এটা তোমার আব্বুর গাড়ি। ওরা যখন ঘরে পৌঁছল তখন বিকেল পাঁচটা।

মনিরুলের বাবা জাহিদ সাহেব তখন বাড়ির সামনের লনে স্ত্রী ও মেয়েসহ বৈকালিক জলযোগ করছিলেন। মনিরুলের গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে সেদিকে সকলে একবার চেয়ে খাওয়াতে মনোযোগ দিলো। তিনি গত রাত্রে রেহানার কাছে

ছেলের অপকীর্তির সব কথা শুনেছেন।

মনিরুল গাড়ি পার্ক করে নেমে ছেলের একটা হাত ধরে আসমাকে সঙ্গে করে একবারে তাদের কাছে এসে বলল, আব্বা, আমি আসমাকে বিয়ে করেছি। আজ সকালে মনিরুল যাওয়ার সময় কাজি অফিস থেকে আসমাকে বিয়ে করে নিয়ে আসবার কথা রেহানাকে বলেছিল। রেহানা চা খেতে খেতে একটু আগে মা-বাবাকে সেকথা বলেছে।

জাহিদ সাহেব কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে বসে থেকে রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন, তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল। তোমার মত চরিত্রহীন ছেলের আমি বাবা, এ কথা মনে করলে নিজের প্রতি ঘৃণা হয়। একটা মেয়ের সরলতার সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ করে এতদিন ভুলে ছিলে। মেয়েটার যদি কোনো অঘটন ঘটে যেত, তা হলে তোমাকে আমি দূর করে তাড়িয়ে দিতাম। লেখাপড়া করে তুমি একটা জানোয়ার হয়েছ।

রফিক জাহিদ সাহেবের রাগ দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে যায়। তারপর সে সকলের অলক্ষ্যে জাহিদ সাহেবের সামনে গিয়ে বলল, কে আপনি ? আমার আব্বুকে বকছেন কেন ?

জাহিদ সাহেব চমকে উঠে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অবিকল মনিরুলের অবয়ব। তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, আমি তোমার দাদু। তোমার আব্বু তোমাদের এতদিন আনেনি বলে বকলাম। তোমার নাম কি ভাই ?

আমার নাম রফিকুল ইসলাম। আমাকে সবাই রফিক বলে ডাকে।

বাহ্ বেশ সুন্দর নাম তো। রফিক মানে বন্ধু। তা হলে আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে। এবার থেকে আমরা দু'বন্ধুতে মিলে খুব গল্প করব, কি বল ?

আপনি গল্প জানেন ? কি মজা ! আমি কিন্তু আপনার কাছে ঘুমাব। সেই সময় আপনি গল্প বলবেন।

তাই হবে ভাই। তারপর আসমার মুখের দিকে চাইতে অনেক দিন আগের একটা আবছা মুখ মনে পড়ল। সে দিন বোধ হয় এই মেয়েটাই মনিরুলের খোঁজ করে অনেক কথা বলেছিল ? তাকে অপমান করে টাকা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। মেয়েটা টাকা তার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছিল। আজ সেকথা মনে হতে খুব অনুতপ্ত হলেন। বললেন, বৌমা, তোমাকে সেদিন ভুল বুঝে অনেক অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে অন্যায় করেছি। বুড়ো ছেলে মনে করে আমাকে ক্ষমা করে দাও মা।

আসমা বসে পড়ে শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়ে বলল, আপনি ক্ষমা চেয়ে আমাকে গোনাহগার করবেন না। সবকিছু তক্বদিরের লিখন। যার তক্বদিরে যতদিন বিড়ম্বনা থাকে, তাকে ততদিন সেটা ভোগ করতেই হবে। আমাকে আপনি পুত্রবধূ হিসাবে পায়ে ঠাঁই দিয়ে ধন্য করেছেন। সেই জন্য আল্লাহপাকের দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া। তারপর ফুঁপিয়ে উঠল।

জাহিদ সাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের সুখি করুন। তারপর মেয়ে ও স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, বৌমাকে ঘরে নিয়ে যাও। তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?

আসমা উঠে এসে শাশুড়ীকে কদমবুসি করল।

তার দেখাদেখি মনিরুলও মা-বাবাকে কদমবুসি করল।

রেহানা আসমার হাত ধরে বলল, এস ভাবি আমরা ঘরে যাই।

ঐদিন রুবীনা বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিছানায় শুয়ে রইল। চিন্তা করতে লাগল, এখন কি করবে। যদি মায়ের কথামত মহিমের সঙ্গে মেলামেশা না করত, তা হলে এই অঘটন ঘটত না। তখন তার মনে অনেক কথা ভেসে উঠল। মহিম তাদের পাড়ার বড় লোকের ছেলে। দেখতে সুন্দর। লেখাপড়াতেও ভালো। কিন্তু সে চরিত্রহীন। বড় লোকের সুন্দর মেধাবী ছেলের বান্ধবীর অভাব হয় না। সে প্রত্যেককে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের মধু খেয়েছে। অনেকে তার আসল রূপ জানতে পেরে সরে গেছে। রুবীনা পাড়ার মেয়ে বলে এতদিন পরিচয় থাকলেও কোনো অশ্লীল কাজ তার সঙ্গে করেনি। কিন্তু ইদানীং বান্ধবীর অভাবে রুবীনার পিছনে লেগেছিল।

স্কুল জীবন থেকে তাদের পরিচয়। কলেজে ঢুকে সেটা গাঢ় হয়। প্রায় প্রতিদিন গভীর রাতে মহিম এসে সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রুবীনার সঙ্গে গল্প করত। একদিন তার মা সোহানা বেগম জানতে পেরে মেয়েকে রাগারাগি করেন। কিন্তু রুবীনা শোনেনি। গোপনে গোপনে তার সঙ্গে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াত। এক ছুটির দিনে কাউকে কিছু না বলে সে মহিমের গাড়িতে করে ন্যাশনাল পার্কে বেড়াতে যায়। সেদিন মেঘলা ছিল। সেখানে পৌছাবার কিছুক্ষণপর ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল। দিনের বেলাতে সন্ধ্যার মত অন্ধকার হয়ে এল। ওরা বেড়াতে বেড়াতে ছুটে এসে ডাক বাংলোতে উঠল। খুব জোরে ঝড় হচ্ছিল বলে একটি কামরার মধ্যে ঢুকে লাইট জ্বেলে দুজনে দুটো চেয়ারে বসল। তখন আর কেউ সেখানে ছিল না। ঝড়ের দাপটে এক সময় কারেন্ট অফ হয়ে গেল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। রুবীনা ভয় পেয়ে ছুটে এসে মহিমকে জড়িয়ে ধরল। মহিম তাই চাচ্ছিল। রুবীনাকে সে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিজের মনস্কামনা চরিতার্থ করার জন্য এখানে এনেছে। সুযোগ পেয়ে সেও রুবীনাকে জড়িয়ে ধরল। রুবীনার নরম তুলতুলে যৌবন পুষ্ট শরীরের স্পর্শে মহিমের শরীরের অনুকণাগুলো সতেজ হয়ে উঠল। ভাবল, আজ তার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। সে একটা হাত দিয়ে রুবীনার মুখটা নিজের মুখের কাছে এনে ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে বলল, এত ভয় পাচ্ছ কেন ? আমিতো রয়েছি। তারপর তার নিচের ঠোঁট চুষতে লাগল। রুবীনা প্রথমে ভয় পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, কিন্তু মহিম যখন তার ঠোঁট চুষতে লাগল তখন তার যৌবন জোয়ার উত্তাল তরঙ্গের মত প্রবাহিত হতে লাগল। সে সব কিছু ভুলে গেল। সমস্ত শরীর তার থর থর করে কেঁপে উঠল। ঘন ঘন গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তার অবস্থা দেখে মহিম তখন পাগলের মত বুকে চেপে ধরে পীষে ফেলার চেষ্টা করল। রুবীনা বলল, প্লীজ মহিম, অতজোরে চাপ দিয়ো না, আমার লাগছে। মহিম মনে করল, রুবীনার তা হলে এসব ভালো লাগছে। সে তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সুযোগ পেয়ে আদিমতায় মেতে উঠল। একসময় দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। একটু পরে রুবীনা ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। নিজের ভুলের অনুশোচনায় সে তখন জর্জরিত।

তাকে কাঁদতে দেখে মহিম কপটতার আশ্রয় নিয়ে বলল, আমি ঠিক এতটা

চাইনি। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে করে ফেলেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

রুবীনা বেশ কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর চোখ মুছে বলল, মহিম ভাই, একটা কথা বলব রাখবে ?

মহিম বলল, বল কি কথা ?

রুবীনা বলল, এরপর আমি আর অন্য কাউকে এই দেহ দিতে পারব না। যদি তুমি আমাকে বিয়ে না কর, তবে আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করব।

মহিম বলল, সে কথা আমিও এখন ভাবছিলাম। কথা দিলাম, আমি তোমাকে বিয়ে করব। তবে তোমাকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

রুবীনা মহিমের কপটতা বুঝতে পারল না। বলল, যতদিন অপেক্ষা করতে বলবে ততদিন অপেক্ষা করব।

আরও কিছুক্ষণ দুজনে গল্প করে বাড়ি ফিরে এল। এরপর প্রায়ই তাদের দৈহিক মিলন হত। মহিম খুব চালাক, সে প্রেগনেন্টের ভয়ে সব সময় কন্ডম ব্যবহার করে। কিন্তু দুর্ঘটনা যা ঘটবার প্রথম বারে ঘটে গেছে। মাস শেষ হওয়ার পর যখন রুবীনার ঋতুস্রাব হল না তখন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। মনে করল, তার তো মাসিকের একটু দোষ আছেই। আগেও কয়েকবার এরকম হয়েছে। কিন্তু যখন দুমাস কেটে গেল অথচ মাসিক হল না, তখন সে মহিমকে সব কথা জানাল।

রুবীনার কথা শুনে মহিম প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে রেগে উঠে বলল, আমি সব সময় কন্ডম ব্যবহার করি। এ রকম তো হতেই পারে না। তারপর রুবীনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, আমি তোমার গর্ভের সন্তানের জন্মদাতা নই, অন্য কেউ। যাও আর কোনোদিন এস না। মহিমের তখন অন্য চিন্তা মাথায় ঘুরছে। সে ফিজিক্সে উচ্চ ডিগ্রী নেওয়ার জন্য বিদেশ যাবে। বিদেশী যুবতীদের চিন্তায় তার মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে এখন রুবীনাকে থোড়াই কেয়ার করে।

রুবীনার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বলল, মহিম তুমি এতবড় নীচ কথা বলতে পারলে ? এত বড় পাষান্ড তুমি ? আমি যে কিছুই ভাবতে পারছি না।

মহিম বলল, দেখ বেশি বাড়াবাড়ি করো না, যা বলছি শোন, লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘরে ফিরে যাও। তারপর তোমার গর্ভে যার ঔরসে সন্তান এসেছে তাকে ভয়ে দেখিয়ে বিয়ে করে ফেল।

রুবীনা রাগে ও অপমানে আর কোনো কথা বলতে পারল না। কেমন করে সেদিন বাড়ি ফিরেছিল তার মনে নেই। সেই থেকে মহিমের খোঁজ আর করেনি। কয়েকদিন পরে এক বান্ধবীর কাছে শুনেছে, সে বিদেশ চলে গেছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পর মনিরুল তার পিছনে লাগল। রুবীনা দু' একদিন তার সঙ্গে বেড়িয়ে বুঝতে পারল, সেও তাকে চায়। রুবীনা এখন চালাক হয়ে গেছে। বিয়ের আগে দেহ দিলে সে তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চাইবে না। তাই মনিরুল যখন সুযোগ পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল তখন রুবীনা নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে মেকি রাগ দেখিয়ে বলেছিল, বিয়ের আগে এসব হলে বিয়ের পর আর মজা থাকবে না। বিয়ের পর যা কিছু করো আমি আপত্তি করবো না।

রুবীনা এত তাড়াতাড়ি বিয়ের প্রস্তাব দিবে মনিরুল ভাবেনি। সে তখন তাকে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। সেইজন্য ঐ দিন তাকে নিয়ে কাবিন করতে যাবে বলে বলেছিল। জানাজানি করে বিয়ে করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই

গোপনে এই ব্যবস্থা করেছিল। এই সমস্ত চিন্তা করতে করতে রুবীনা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। এরপর আর কি করে সকলের কাছে মুখ দেখাবে ? কদিন ধরে কিছু খেতে পারছে না, শুধু বমি পায়। একদিন তো ভাবির সামনেই ওকি করতে করতে শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। তাকে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। এই বুঝি ভাবির কাছে ধরা পড়ে গেল ? এভাবে আর কত দিন পাপকে লুকোতে পারবে ? মনিরুলকে বিয়ে করে পূর্বের পাপটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাকেও মহিমের মত দেখল। সে তখন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। সেইদিন সন্ধ্যার পর দু'টো চিঠি লিখল। একটি মাকে আর অন্যটা থানার দারোগাকে।

মায়ের চিঠি- মা, আমি তোমার কলঙ্কিনী মেয়ে। আমার আর এ দুনিয়াতে থাকার কোনো অধিকার নেই। তুমি জেনে খুব দুঃখ পাবে, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি মা হতে চলেছি। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি, দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়ে এ পাপ ঢাকতে পারব না। তাই আমি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। আমার এই পরিণতির জন্য আমি কাউকে দায়ী করলাম না। শুধু তুমি দুনিয়ার সব মায়েদের বলে দিও, তারা তাদের মেয়েদের যত লেখাপড়া করাক না কেন, ছেলেদের সঙ্গে যেন ফ্রীভাবে মেলামেশা করতে না দেয়। যুবক যুবতীরা এক সঙ্গে ফ্রী মেলামেশা করলে কোনো এক দূর্বল মুহূর্তে অপকীর্তি করে ফেলবেই। ভাবির কাছে শুনেছিলাম, এই জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দঃ) ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন। মেয়েদের কাজের ও থাকার স্থান আলাদা করে দিয়েছেন। এই সব শিক্ষা তুমি আমাকে দাওনি। তুমি আমাকে ধর্মেরও কোনো জ্ঞান দাওনি। এই সমস্ত জ্ঞান আমি ভাবির কাছে পেয়েছি। বিয়ের আগে প্রথম যখন ভাবি আমাদের বাড়িতে আসে তখন আমি তাকে সেকেলে আনকালচার্ড মেয়ে মনে করে এড়িয়ে চলেছি। যখন তাকে পরশ পাথর বলে চিনলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভাবি ও দাদাদেরকে আমার জন্য দোয়া করতে বলো। তোমাকে আর কি দোষ দেব। এটাই আমার তক্বদীর। পারলে এই কলঙ্কিনী মেয়েকে ক্ষমা করো। ইতি- রুবীনা।

দারোগার চিঠি-দারোগা সাহেব, আমি আমার দুস্কর্মের জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছি। এর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি এক ভাগ্য বিড়ম্বীনা চরিত্রহীন মেয়ে। আমার মত মেয়ে এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো মনে করে এই পথ বেছে নিলাম। আপনারা আমার মা, ভাই, ভাবি এবং অন্য কাউকে সন্দেহ করবেন না। আমি নিজে স্বেচ্ছায় সকলের অগোচরে চলে যাচ্ছি। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ, আমার লাশ ময়না তদন্ত করবেন না। আশা করি, আপনি একজন মৃত্যুপথ যাত্রীর অনুরোধ রক্ষা করে তাড়াতাড়ি দাফনের অনুমতি দিবেন। নিজের মেয়ে বা বোন মনে করে আমার এই অনুরোধ রাখার জন্য আবার অনুরোধ করছি। ইতি-রুবীনা।

রাত দশটার সময় লাইলী রুবীনাকে ভাত খাওয়ার জন্য ডাকতে এসে দরজা বন্ধ দেখে কড়া নাড়া দিয়ে বলল, ভাত খাবে এস।

রুবীনার তখন এ্যাবনরমাল অবস্থা। সে ভাবির গলা শুনে অনেক কষ্টে গলার স্বর সংযত রেখে দরজা না খুলে বলল, তোমরা খেয়ে নাও, আমার শরীর খারাপ। আজ আমি কিছু খাব না।

লাইলী ফিরে এসে সেলিমকে রুবীনার কথা বললে সেলিম বলল, আজ ওর শরীর ও মন খুব খারাপ হওয়ার কথা, তার জন্য কোনো চিন্তা করো না।

ওদিকে রুবীনা যখন বুঝল, ভাবি ফিরে গেছে তখন সে ধীরে ধীরে আলমারীর কাছে গিয়ে ঘুমের ট্যাবলেটের শিশি হাতে নিল। প্রেগন্যান্ট হওয়ার পর থেকে সে রাত্রে একদম ঘুমাতে পারত না। তাই ঘুমের ট্যাবলেট এক শিশি কিনে ছিল। তাতে এখনো অনেক ট্যাবলেট আছে। রুবীনা সব ট্যাবলেট এক সঙ্গে খেয়ে ঘুমিয়ে গেল। সে ঘুম তার আর ভাঙ্গল না।

পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত যখন রুবীনা ঘর থেকে বের হল না তখন লাইলী এসে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে কড়া নাড়া দিয়ে ডাকতে লাগল। কোনো সাড়া না পেয়ে লাইলীর মনে সন্দেহ হল। সে কাচের জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু জানালাও ভিতর থেকে বন্ধ। পর্দা ঝুলছে। শেষে ফিরে গিয়ে শাশুড়ীকে ও স্বামীকে জানাল।

আরিফও সেখানে ছিল। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি করে এসে দরজা জানালা কিছুই খুলতে পারল না। অনেক ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পেল না। শেষে আরিফ জানালার কাচ ভেঙ্গে পর্দা সরিয়ে দেখল, রুবীনা খাটের উপর শুয়ে আছে। সেলিম ও আরিফ খুব জোরে ডাকতে লাগল। কিন্তু রুবীনার কাছ থেকে কোনো সাড়া এল না। তখন লাইলীর সন্দেহ দৃঢ় হল। স্বামীকে বলল, তুমি শীগগীর একটা মিস্ত্রী নিয়ে এসে দরজা খোলার ব্যবস্থা কর, নচেৎ দরজা ভেঙ্গে ফেল।

কথাটা আরিফ শুনতে পেয়ে ছুটে বাজারের মোড় থেকে দুজন কাঠের মিস্ত্রী ডেকে নিয়ে এলে তারা দরজা ভেঙ্গে দিল। ভিতরে ঢুকে রুবীনাকে মৃত দেখে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কিছুক্ষণ পর লাইলী একটা চাদর দিয়ে রুবীনাকে ঢাকা দিয়ে দিল। সেলিম থানায় ফোন করল। লাইলী শাশুড়ীকে বৃথা প্রবোধ দিতে লাগল। সেলিম টেবিলের উপর ভাঁজ করা কাগজ দেখতে পেয়ে হাতে নিয়ে পড়ে সবাইকে শুনাল। আরিফ হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মা ও ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, রুবীনা, এ কি করল ? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারিনি। আমাদের যে আর কোনো বোন রইল না মা। রুবীনা, তুই যে আমাদের বড় আদরের বোন ছিলি, আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারলি ? যত বড় অন্যায় করে থাকিস না কেন, আমরা তোকে ক্ষমা করে দিতাম।

কিছুক্ষণ পরে দুজন সিপাই সঙ্গে করে দারোগা সাহেব এলেন। সেলিমের সঙ্গে তার আগে থেকে জানাশোনা। তার বড় ছেলে সেলিমদের মিলের অফিসে চাকরি করে। তিনি রুবীনার দুটি চিঠিই পড়লেন। তারপর তাদেরকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে ডাইরীতে তাদের মুখজবানী লিখে লাশ দাফন করার হুকুম দিয়ে ফিরে গেলেন।

রুবীনার মৃত্যুর পরে সারা বাড়িতে দুঃখের ছায়া নেমে এল। কারো মুখে হাসি নেই।

রুবীনার মৃত্যুর খবর পেয়ে জাহিদ সাহেবদের বাড়ির সবাই এসেছিল।

আসমা সোহানা বেগমকে জড়িয়ে ধরে অনেক কেঁদেছে। ফিরে যাওয়ার সময় সোহানা বেগমকে বলল, আমাকে তো মেয়ের মত মানুষ করেছেন ; আমি আপনার পেটে না হয়েও যা স্নেহ ভালোবাসা, পেয়েছি তাতে করে নিজের গর্ভধারিণী মায়ের চেয়েও আপনাকে আমি বেশি জানি।

সোহানা বেগম রুবীনার এই পরিণামের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাতে লাগলেন। সেলিম ও আরিফ ব্যবসা বাণিজ্য দেখাশোনা করছে বটে, কিন্তু কারও মনে শান্তি নেই।

লাইলী একদিন বিকেলে চায়ের টেবিলে শাশুড়ীকে জোর করে নিয়ে এল।

এতদিন তিনি নিজের ঘর থেকে বার হননি। সবাইকে চা দিয়ে লাইলী বলল, আজ আমি দু'একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না।

আরিফ বলল, বেশ তো ভাবি ! কি বলবে বল না।

লাইলী কয়েক সেকেণ্ড সবাইকে দেখল, তারপর বলল, আমরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করি কিনা ? এবং তিনিই যে একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তা, এ কথাও বিশ্বাস করি কি না ?

সকলে লাইলীর দিকে চেয়ে রইল; কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিল না।

লাইলী বলল, কি হল ? তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন ?

সেলিম বলল, মুসলমান মাত্রেই ঐ কথা সবাই বিশ্বাস করে।

লাইলী বলল, আমরা এও বিশ্বাস করি, তাঁর হুকুম ছাড়া কোনো কিছু হয় না। সেইজন্য তাঁর কোনো কাজে আমাদের অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত না। দুঃখ-কষ্টে, বিপদ-আপদে তিনি আমাদের সবর করতে বলেছেন। আমরা যদি তাঁর কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হই, তা হলে কি তাঁকে বিশ্বনিয়ন্তা বলে অস্বীকার করা হল না কি ? সুখ দুঃখ মানুষের জীবনে দিন রাত্রির মত জড়িত। যে লোক সুখ-দুঃখ দুটোই ভোগ না করেছে, তার জীবন পূর্ণ হয় না। আর এ রকম লোক দুনিয়াতে আছে কি না সন্দেহ। এই দুর্ঘটনায় আমরা খুব দুঃখ পেয়েছি। আল্লাহর কাছে আমরা তা সইবার ক্ষমতা চাইব। তারপর লাইলী শাশুড়ীকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা, এক রুবীনাকে আল্লাহ নিয়েছেন তো কি হয়েছে ? এ দুনিয়াতে রুবীনার মত কত শত মেয়ে আছে, তারাও যেন রুবীনার মত দুর্ঘটনায় না পড়ে, সেজন্য আমাদের সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে। যদি আমরা তা করি, তা হলে নিশ্চয় আল্লাহ খুশি হবেন। তখন সোহানা বেগমের চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল। লাইলী নিজের আঁচল দিয়ে মুছে দিয়ে বলল, আমাকে রুবীনা মনে করে দীলে তসাল্লি দিন মা। দোয়া করুন, আমি যেন রুবীনার মতো হয়ে আপনার দুঃখ ভুলাতে পারি।

সোহানা বেগম ভিজে গলায় বললেন, তুমি আমার রুবীনার থেকে অনেক বেশি মা। রুবীনাকে কেড়ে নিবে বলে আল্লাহ তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। লাইলী বসে পড়ে শাশুড়ীর পা জড়িয়ে ধরে বলল, তা হলে এবার থেকে ঠিক মত খাওয়া দাওয়া করবেন বলুন ? না খেয়ে খেয়ে আপনি শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছেন।

সেলিম ও আরিফ উঠে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা, তোমার বউ যা বললে, সেইমত আমাদের সবার চলা উচিত। নচেৎ আল্লাহ বেজার হবেন। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির সবার মনে শান্তি ফিরে আসতে লাগল।

কয়েকদিন পর মনিরুল রেহানা ও আসমাকে নিয়ে সেলিমদের বাড়িতে বেড়াতে এল। নাস্তার টেবিলে সবাই বসেছে। লাইলী নাস্তা আনার জন্য রান্নাঘরে গেছে। হঠাৎ মনিরুল উঠে গিয়ে সোহানা বেগমের পায়ে হাত দিয়ে বলল, ফুফুআম্মা, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। আমি আপনাকে আর ভাবির আব্বাকে বেনামে চিঠি দিয়ে সেলিমের বিয়ে ভাঙ্গিয়েছিলাম। আমার এই অন্যায় কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে মাফ চাইছি।

এমন সময় লাইলী চা-নাস্তা নিয়ে এসে মনিরুলের কথা শুনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সোহানা বেগম শুনে গুম হয়ে বসে রইলেন। তার নিজের ভাইপো হয়ে এমন জঘন্য কাজ করবে, তিনি কখনও ভাবতে পারেন নি।

ফুফুআম্মাকে চুপ করে থাকতে দেখে মনিরুল আবার বলল, আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, তবে আমি কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আর নিজের বিবেকের চাবুকে চিরকাল জর্জরিত হতে থাকব। তার কথাগুলো কান্নার মত শোনাল।

লাইলী শাশুড়ীকে বলল, আপনি মনিরুল ভাইকে ক্ষমা করে দিন মা। আল্লাহপাক ক্ষমাকে ভালবাসেন। যখন কেউ নিজের অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চায়, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে দেন। যে ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করে, আল্লাহপাক তার অপরাধও ক্ষমা করে দেন এবং তাকে ভালবাসেন।

সোহানা বেগম পুত্রবধূর কথা শুনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, মনিরুল, তুমি আমার কাছে যতটুকু অপরাধ করেছ, তার চেয়ে শতগুণ বেশি মা লাইলীর কাছে করেছ। আগে তার কাছে মাফ চাও। আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।

মনিরুলকে উঠে তার দিকে এগোতে দেখে লাইলী বলল, আমার কাছে মাফ চাইতে হবে না। আমি কোনোদিন কারুর দোষ দেখি না। কেউ যদি আমার কোনো ক্ষতি করে, তখন আমি ভাবি সবকিছু আল্লাহপাকের ইশারা। তাঁর হুকুম ছাড়া কারুর কিছু করার ক্ষমতা নেই। সেই কথা চিন্তা করে আমি কারও প্রতি দোষারোপও করি না এবং কাউকে অপরাধীও মনে করি না। যদি কিছু করে থাক, দোয়া করছি, আল্লাহপাক যেন তোমাকে মাফ করেন।

লাইলীর জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে সকলে শুধু অবাক নয়, সেই থেকে তারা তাকে আল্লাহপাকের খাসবান্দী বলে মনে করল।

সোহানা বেগম পুত্রবধূকে কাছে বসিয়ে গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, আল্লাহ এমন রত্নকে আমার বৌ করে ধন্য করেছেন। আল্লাগো ! তোমার দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া।

সেলিম বলল, আমি কিন্তু মনিরুলকে কিছুতেই ক্ষমা করতাম না। আসমাকে বিয়ে করেছে বলে ক্ষমা পেয়ে গেল। আল্লাহ ওকে সুবুদ্ধি দিয়েছেন, নচেৎ আমি এতক্ষণ ওকে আস্ত রাখতাম না। আল্লাহপাকের দরবারে দোওয়া করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করেন। তারপর লাইলীকে বলল, তুমি চা নাস্তা খাওয়াবে, না মায়ের সব আদরটুকু স্বার্থপরের মত নিজে একা ভোগ করবে ? তারপর মাকে বলল, তুমি যেভাবে ওকে আদর করছ, মনে হচ্ছে দুদিন পরে আমদেরকে ভুলেই যাবে। আচ্ছা আরিফ ! তুইও কিছু বলবি না ?

আরিফ হাসতে হাসতে বলল, ভাইয়া, আদর-যত্ন, ভক্তি-সম্মান কেউ কাউকে দেয় না। আদায় করার ক্ষমতা থাকা চাই। ঐগুলো পাওয়ার জন্য যা কিছু দরকার, সবগুলোই ভাবির মধ্যে আছে। সেইজন্য সে আমাদের সবাই-এর কাছ থেকে শ্রেনীমত আদর-যত্ন-ভক্তি সম্মান পাচ্ছে।

সেলিম বলল, তুইও তোর ভাবির দলে ? বেশ, তোরা তাকে ভক্তি-সম্মান করতে থাক, আমি হোটেলে গিয়ে চা খাব। সেই কখন থেকে চা খাবার ইচ্ছা হচ্ছে ! তারপর সত্যি সত্যি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

লাইলী তাড়াতাড়ি করে নাস্তা পরিবেশন করতে লাগল।

সোহানা বেগম বললেন, আমি তো ভাগ্যচক্রে ওকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তুইতো খুঁজে এনে দিলি। ওর জন্য সেদিন তুই আমাকে কি বলেছিলি মনে আছে ? বাপ মরা মেয়েকে এখন একটু আদর করলে তোর হিংসা হয় কেন ?

সোহানা বেগমের কথা শুনে সবাই মিটি মিটি হাসতে লাগল।

লাইলী চায়ের কাপটা সেলিমকে দেওয়ার সময় ফিস ফিস করে বলল, নিজের কথায় কেমন বকুনি খাওয়া হচ্ছে ?

সেলিম কৃত্রিম রাগতস্বরে বলল, মা তোমার ফরে, তা না হলে কে তোমার কথা শুনতো ?

এক রাত্রে ঘুমাবার সময় লাইলীর দেরি দেখে সেলিম ছটফট করতে লাগল। তাকে জড়িয়ে ধরে না ঘুমালে তার ঘুম আসে না। সে মনে মনে একটু রেগে গেল।

লাইলী শাশুড়ীর বিছানা ঠিক করে দিয়ে মাথার কাছে টেবিলে এক গ্লাস পানি ঢেকে রেখে তার হুকুম নিয়ে নিজের রুমে ঢুকল। দেখল, সেলিম চেয়ারে বসে বই পড়ছে।

সেলিম লাইলীকে ঢুকতে দেখেও না দেখার ভান করে বই পড়তে লাগল।

লাইলী বুঝতে পারল, তার অভিমান হয়েছে। কারণ খাওয়া দাওয়ার পর মায়ের কাছে সবাই গল্প করছিল। সেলিম উঠে আসার সময় লাইলীকে ইশারা করে চলে আসতে বলেছিল। কিন্তু মায়ের সাথে কথা বলতে বলতে একটু দেরি হয়ে গেছে। লাইলী চেয়ারের পেছন থেকে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চিবুক রেখে বলল, অপরাধীনি ক্ষমা প্রার্থী। সারাদিন অফিসে কাজ করে তুমি ক্লান্ত, এবার ঘুমাবে চল।

সেলিম তাকে সামনে এনে কোলে বসিয়ে বলল, স্বামীর জন্য যদি এত দরদ, তবে তাকে এত রাত জাগিয়ে রেখেছ কেন ?

অন্যায় করেছি, তার জন্য আবার ক্ষমা চাইছি।

সেলিম বলল, মেয়েরা বেশ সুখে আছে। কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, অন্যায় করলে মাফ চেয়ে খালাস। আজ কিন্তু মাফ করছি না। শাস্তি পেতেই হবে বলে তাকে দুহাতে তুলে নিয়ে খাটের দিকে এগোল।

লাইলী বলল, তুমি যত ইচ্ছা শাস্তি দাও। তোমার শাস্তি আমাকে যে কি আনন্দ দেয়, তা যদি জানতে, তা হলে.....বলে তার বুকে মুখ লুকাল।

ওরে দুষ্ট মেয়ে, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি বলে সেলিম তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আনন্দে মেতে উঠল।

এইভাবে খুব সুখের মধ্যে ওদের দিন কাটছিল। কিন্তু আল্লাহপাক সুখ দুঃখকে আলো ও অন্ধকারের মত পাশাপাশি রেখেছেন। কিছুদিন পর হঠাৎ লাইলীর ভীষণ জ্বর হল। জ্বরের ঘোরে সে ভুল বকতে শুরু করল, "আমি রেহানার কাছে অপরাধী।" রেহানা সারাদিন তার কাছে থেকে সেবা শুশ্রূষা করে রাত্রে বাড়ি চলে যায়। সোহানা বেগম বড় ডাক্তার এনে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। সেলিম আজ আট দিন স্ত্রীর কাছ থেকে উঠেনি। রেহানা জোর করে তাকে গোসল করতে ও খেতে পাঠায়। সেলিম সারারাত স্ত্রীর কাছে জেগে বসে থাকে। সোহানা বেগম ছেলেকে অনেক করে বোঝান, মানুষ মাত্রেই অসুখ বিসুখ হয়। তুই অত ভেঙ্গে পড়ছিস কেন ? আল্লাহপাকের কাছে দোওয়া চা। সেলিম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর স্ত্রীর রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করতে লাগল। পনের দিন পর লাইলীর জ্বর একটু কমল।

ডাক্তার বললেন, এবার আর ভয় নেই, রুগী এখন আউট অফ ডেঞ্জার। প্রতিদিন মনিরুল আসমাকে সঙ্গে করে লাইলীকে দেখতে আসে।

প্রায় এক মাস রোগ ভোগের পর লাইলী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। এখন বালিশে হেলান দিয়ে বসতে পারে।

একদিন রেহানা যখন তাকে পথ্য খাওয়াচ্ছিল, তখন লাইলী তাকে বলল, তুমি মায়ের পেটের বোনের মত আমার সেবা করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছ। তোমার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না।

রেহানা বলল, তোমার মতো বোন পেলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। আচ্ছা ভাবি, তুমি জ্বরের ঘোরে কেন বলতে, আমার কাছে তুমি অপরাধী ?

লাইলী তাকে পাশে বসিয়ে বলল, জ্বরের মধ্যে কি বলেছি না বলেছি জানি না। এখন তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, কিছু মনে করবে না তো ?

কি যে বল ভাবি, তোমার কথায় কিছু মনে করব এ কথা ভাবতে পারলে ? তুমি কি বলবে বল, আমি কিছু মনে করব না।

লাইলী রেহানার দু'টো হাত ধরে বলল, তোমাকে আমি ছোট জা করে সারাজীবন কাছে পেতে চাই। তুমি রাজি থাকলে বল, আমি সব ব্যবস্থা করব।

রেহানা মনে মনে খুব খুশি হল। কারণ সে লাইলীর সংস্পর্শে এসে ধর্মের অনেক জ্ঞান পেয়ে তার স্বভাব চরিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। ভেবে দেখেছে নারী স্বাধীনতার নামে দিন দিন নারী সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে আরিফের দিকে তার মন ঝুঁকে পড়েছে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে লাইলী বলল, কি হল ? কথা বলছ না কেন ?

ভাবি, তোমার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কথা মনে পড়ে গেল। "মানুষ যা চায় তা পায় না। আর যা পায় তা ভুল করে চায়।" আমি তো তোমার কাছে জেনেছি, আল্লাহপাক প্রত্যেক নারীকে তার স্বামীর বাঁ দিকের পাঁজরা থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যার সঙ্গে আমার জোড়া করেছেন, তার সঙ্গে বিয়ে হবেই। এখন এর বেশি কিছু বলতে পারছি না।

ঠিক এই সময় সেলিম ঘরে ঢুকে রেহানার শেষ কথা শুনতে পেয়ে বলল, তোমার ভাবি বুঝি প্রশ্ন করছে, যার উত্তর দিতে পারছ না ? ওর সঙ্গে কেউ তর্কে পারে না। কি প্রশ্ন করছে বল, দেখি আমি উত্তর দিতে পারি কি না।

রেহানা ভীষণ লজ্জা পেল। কিছু না বলতে পেরে তাড়াতাড়ি করে ঝুটো বাসন পত্র নিয়ে ত্রস্তপদে পালিয়ে গেল।

সেলিম অবাক হয়ে তার চলে যাওয়া দেখল। তারপর খাটে লাইলীর পাশে বসে বলল, ওকে তুমি কি কথা জিজ্ঞেস করেছ ? আমি জানতে চাইতে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল।

মৃদু হেসে লাইলী বলল, সে কথা তোমার এখন শুনে কাজ নেই, পরে এক সময় বলব।

দেখ স্বামীর অবাধ্য হলে কি হয়, তাতো জান।

লাইলী স্বামীর দু'টো হাত ধরে বলল, তুমি রাগ করবে না তো ?

সেলিম তার হাতটায় চুমো খেয়ে বলল, এই চুমোর কসম কিছু মনে করব না।

লাইলীও স্বামীর হাতে চুমো খেয়ে বলল, রেহানাকে আমার খুব পছন্দ। আর আরিফের সঙ্গেও খুব মানাবে। তার এতে মত আছে নাকি জিজ্ঞেস করছিলাম।

সেলিম কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, রেহানা কি বলল ?

রেহানা যা বলেছে তার হুবহু বলে লাইলী বলল, আমার মনে হয় ও রাজি আছে।

সেলিম বলল, আরিফ যদি রাজি থাকে, তা হলে বেশ ভালই হবে। এবার থেকে ঘটকালির কাজ শুরু করলে তা হলে ?

তাতো আপন জনের জন্য একটু আধটু সবাইকে করতে হয়।

এরপর থেকে রেহানা প্রতিদিন আসে না। মাঝে মাঝে আসে। একদিন লাইলী তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে আসা কমিয়ে দিয়েছ কেন ? সেদিনের কথায় মনে কি ব্যাথা পেয়েছ ? যদি তাই হয়, তা হলে আমার কথা উইথড্র করে নিচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।

রেহানা বলল, ভাবি তোমার কথায় আমি মনে ব্যাথা পাইনি। শুধু শুধু তুমি ক্ষমা চাইছ কেন ? তবে খুব লজ্জা পেয়েছি, তাই ঘনঘন আসতে মন চাইলেও আসতে পারিনি।

লাইলী বলল, অনার্সের ছাত্রী। এতটা লজ্জা পাওয়ার কথা নয় ?

রেহানা বলল, তোমার সংস্পর্শে আসার আগে অবশ্য ঐসব ছিল না। কিন্তু তোমার কাছে এসে তোমার দেওয়া শিক্ষা পেয়ে এখন অনেক কিছু আমার পরিবর্তন হয়েছে।

লাইলী বলল, আলহামদুলিল্লাহ, (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার)। আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত করুন।

ইদানিং রেহানা যে খুব কম আসে সেটা আরিফও লক্ষ্য করেছে। আজ যখন সে অফিস থেকে ফিরে গাড়ি থেকে নামছিল তখন রেহানাকে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ডেকে বলল, একটু সময় হবে ? তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

রেহানা তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, বেশ তো বল না কি কথা বলবে ?

আরিফ বলল, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি বলা যায় ? গাড়িতে উঠ, নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বলব।

রেহানা সামনের সীটে আরিফের পাশে বসল। আরিফ তাকে রমনা পার্কের একটা নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে এল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরিফ বলল, তুমি আমাকে কি মনে করবে জানি না তবু বলছি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। বিদেশ থেকে ফিরে এসে তোমাকে দেখেই আমার খুব পছন্দ হয়েছে। অবশ্য তোমারও পছন্দ আছে। আমি তোমার মতামতের দাম দেব, এ কথা বলে রাখছি।

রেহানা বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করল। তারপর তার দিকে চেয়ে বলল, আমার কিছু কথা তোমার জানা দরকার। সেগুলো শোনার পর তুমি যা ভালো বুঝবে করবে, তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।

বেশ বল, তুমি কি বলতে চাও ?

প্রায় বছর তিনেক আগে ফুফুআম্মা আব্বাকে বলেছিল, আমাকে সেলিম ভাইয়ের জন্য পছন্দ করেছে। আব্বাও রাজি ছিলেন। আমি আড়াল থেকে তাদের কথা শুনে খুব আনন্দ পাই। কারণ সেলিম ভাইয়ের মত চরিত্রবান সুপুরুষকে কার না ভালো লাগবে ? সেই থেকে মনে মনে তাকে ভালবেসে ফেললাম,কিন্তু সেলিম ভাই বোধ হয় সে কথা জানত না। এরপর যখন সেলিম ভাই লাইলী ভাবির দিকে ঝুঁকে পড়ল তখন তার উপর আমার খুব রাগ ও হিংসা হয়। দাদাও ব্যাপারটা জানত। সেও যখন দেখল, লাইলী ভাবির জন্য সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে না তখন সে বেনামী চিঠি দিয়ে বিয়ে ভাঙ্গিয়ে দেয়। তারপরের ঘটনা সেদিন সে তোমাদের বাড়িতে বলে সকলের কাছ থেকে

মাফ চেয়ে নিয়েছে। তবে আমি দাদার ঐসব কার্যকলাপ কিছুই জানতাম না তোমাদের বাড়িতেই প্রথম শুনলাম। যাই হোক, আমি অজ্ঞতা ও ঈর্ষার কারণে লাইলী ভাবিকে ভুল বুঝেছিলাম। অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে আমিও মাফ চেয়ে নিয়েছি। তাকে মানবী বলে আমার মনে হয় না। যতবড় শত্রু এবং যত বড় দুশ্চরিত্র লোক তার সংস্পর্শে আসুক না কেন, সে মিত্র ও চরিত্রবান হতে বাধ্য হবে। লাইলী ভাবি যেন পরশ পাথর, যেই তাকে ছুঁবে, সেই মানিক হয়ে যাবে। আল্লাহপাক তাকে যেমন অদ্বিতীয়া সুন্দরী করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সর্বগুণে গুণান্বিতাও করেছেন।

আরিফ বলল, সত্যি ভাবি অদ্বিতীয়া। তার উপর ধর্মের জ্ঞান পেয়ে এবং সেই মত চলে সে সকলের কাছে উচ্চ মর্যাদার আসন পেয়েছে। ইসলাম বড় উদার ধর্ম। সেখানে কোনো কুসংস্কার ও মানুষের মনগড়া কিছুর স্থান নেই। আমি মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে পেতে চাই।

রেহানা ছলছল নয়নে আরিফের হাত ধরে বলল, তুমি আমাকে তোমার মত করে গড়ে নিও। আর দোষ ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ দিও।

আরিফ সুবহান আল্লাহ বলে বলল, আল্লাহ তুমি সর্বত্র বিরাজমান। তুমি আমাদের মনের বাসনা পূরণ কর। তারপর বলল, চল তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

রেহানা বলল, তোমাদের বাড়িতেই চল। আমার গাড়ি তো ওখানে আছে। বাড়িতে ফিরে আরিফ রেহানাকে তার গাড়িতে তুলে বিদায় দিয়ে একেবারে ভাবির ঘরে ঢুকল।

লাইলী জানালা দিয়ে তাদের দুজনের যাওয়া আসা দেখেছে এবং অনেক কিছু বুঝেও নিয়েছে।

আরিফের ডাক শুনে বলল, কি ব্যাপার ? ছোট সাহেবকে আজ খুব খুশি খুশি লাগছে। মনে হচ্ছে যেন দুনিয়া জয় করে এসেছ।

আরে থাম থাম, তুমি যে দেখছি এ্যাসট্রোলজার হয়ে গেছ। তারপর বলল, সত্যি ভাবি আজ যা পেয়েছি, সারা দুনিয়া জয় করলেও তা পাওয়া যেত না।

সে তো বুঝতেই পারছি। বলি ব্যাপারটা খুলেই বল না ?

আরিফ চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে গলা খাটো করে বলল, তোমাদেরকে আর মেয়ে দেখতে হবে না। এতদিনেও যখন তোমরা পারলে না তখন আমি নিজেই আজ সেই কাজ করে এসেছি।

লাইলী অবাক হওয়ার ভান করে বলল, সে কি ? এদিকে আমি ও তোমার ভাইয়া একটা মেয়ে পছন্দ করেছি। কথাবর্তাও এক রকম পাকাপাকি। তুমি আমাদের মান ইজ্জত ডুবাবে বুঝি ? তা হতে দিচ্ছি না।

আরিফের আনন্দ উজ্জল মুখটা মুহূর্তে মলিন হয়ে গেল। বলল, তা হলে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ল দেখছি ! একদিকে আমার প্রেম, আর একদিকে তোমাদের ইজ্জত, ধৃতেরী বিয়েই করব না।

লাইলী অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখে বলল, তুমি চিন্তা করো না, আমি তোমার সব সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব। মেয়েটার পরিচয় তো শুনি ?

মেয়েটার পরিচয় জেনে কি হবে ? আর তুমি সমস্যার সমাধানই বা করবে কি করে ? আমি যদি আমার পছন্দ করা মেয়েকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে না করি ?

আরে ভাই হতাশ হচ্ছ কেন ? এমনভাবে মীমাংসা করব, সাপও মরবে না,

আর লাঠিও ভাঙ্গবে না।

যা খুশি তোমরা করগে যাও, আমি বিয়েই করব না।

সে দেখা যাবে যখন সময় হবে, এখন হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা খাবে এস।

খাব না, ক্ষিদে নেই বলে আরিফ আবার বাইরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

লাইলী বলল, আরে ভাই, শুনে যাও না। তোমার সঙ্গে একটু রসিকতা করছিলাম। তোমার প্রেমিকা রেহানার সঙ্গেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থা আমরা করেছি, হয়েছে তো ? বাব্বাহ, সাহেবের রাগ দেখ না ? এখনই যদি এত, বিয়ের পর কি করবে কি জানি।

আরিফ কথাগুলো শুনে ভীষণ লজ্জা পেল। সে যেন কিছু শুনতে পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে বলল, ভাইয়ার মতো আমার কোনো প্রেমিকা নেই। তারপর ভাবিকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

লাইলী হাসি মুখে সেদিকে চেয়ে রইল।

সমাপ্ত

শুভম ক্রিয়েশন